সহসা

সহসা

শংকর

সাহিত্যম্ ॥ ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৬৫

প্রকাশক :
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্‌
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর :
প্রদীপকুমার সাহা
লোকনাথ বাইন্ডিং অ্যান্ড
প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৪বি কলেজ রো
কলকাতা ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

ডাক্তার বারীন রায়

নির্মলহৃদয়েষু

সুখময় ও ইরাবতীর অস্বস্তিকর-অপ্রিয় ব্যাপারটা এবারের কলেজ সহপাঠীদের পুনর্মিলন উৎসবে যে এমনভাবে পরিচিত মহলে ছড়িয়ে পড়বে তা কারও হিসেবের মধ্যেই ছিল না।

সহপাঠীদের এই মিনিসম্মেলন মানে মিনিভোজ, যার প্রধান দায়িত্ব নিয়েছিল অরিন্দম ক্যাটারার্স-এর মালিক সহপাঠী অরিন্দম মাটা, যে সম্প্রতি ব্যাংকশাল স্ট্রীট আদালতে এফিডেভিট করে আইনসঙ্গতভাবে অরিন্দম মাইতি হয়েছে বিজনেসের সুবিধের জন্যে।

গত কুড়িদিন ধরে অরিন্দম মাইতি পুরনো বন্ধুদের সবাইকে টেলিফোন করে অথবা পত্রযোগে এই বাৎসরিক মিলনোৎসব এবং ডিনারে আসতে বলেছিল। সেই সঙ্গে তার সনির্বন্ধ অনুরোধ—"দোহাই, তোরা অতীতকে ভুলে যা, 'মাটা' বলে তোদের কোনো বন্ধু কস্মিনকালেও ছিল না, তোদের চিরকালের যোগাযোগ এই অধম অরিন্দম মাইতির সঙ্গে!"

অরিন্দম স্বীকার করেছে, "তা ভাই, তোদের শুভেচ্ছায় এবং ঠাকুরের আশীর্বাদে টুপাইস আসছে এই ভোজের বিজনেস থেকে। ঝাড়া কয়েকবছর বেকার বসে থেকে এবং বিনামূল্যে শত শত বায়োডাটা অপাত্রে বিতরণ করতে করতে একদিন তোদের অরিন্দমের মাথায় বুদ্ধিটা খেলে গেল। এক গুজরাতি বন্ধুর পাল্লায় পড়ে গেলাম। সে বললো, এমন একটা কারবার ফাঁদো যার মার নেই। সায়েবরা সম্প্রতি হিসেব করে দেখেছে, প্রতি বছর মহাত্মাগান্ধির এই ইন্ডিয়ায় অন্তত এক কোটি বিয়েশাদি হয়। গোল্ড কাউন্সিলের হিসেব অনুযায়ী বর-বউ পিছু পঞ্চাশগ্রাম সোনা লাগলেও ভারতে প্রতিবছর অন্তত পাঁচশ টন সোনার গহনার চাহিদা।"

অরিন্দম সোনার ব্যবসায় নাক গলাতে সাহস পায়নি, তবে সে মনে মনে হিসেব করেছে, এক কোটি বিয়ের জন্যে দু' কোটি ভোজের অন্তত পাঁচশটা

প্রতি বছর ধরতে পারলেই তার সমস্ত চিন্তার চির অবসান অবশ্যম্ভাবী।

এই অরিন্দম মাটার উৎসাহেই প্রতিবছর নির্দিষ্ট দিনে একটা বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় কলেজের পুরনো বন্ধুদের জমায়েত হওয়া।

সুখময় মুখার্জি মিলনোৎসবে পৌঁছতে এবার একটু দেরি করছে। তারই মধ্যে ওকে নিয়ে গল্পটা রটতে শুরু করেছে প্রথমে ধীরে ধীরে তারপর বেশ দ্রুতবেগে। একটু ফিসফিস করে বললেও, অনেকের কানে এসেছে বিষয়টা।

"কোন সুখময়? সুখময় মুখার্জি! সে তো একবার ব্রহ্মচারী হবার খোঁজ খবর নেবার জন্যে বিভিন্ন মঠে এমনকী বেলুড়েও যাতায়াত করেছিল!"

সাময়িক বৈরাগ্যের প্রকোপে অনেকেই ব্রহ্মচর্যে আগ্রহ দেখান, তারপর বেশির ভাগ মানুষেরই পাকেচক্রে আর এগনো হয় না। "গেরুয়াবস্ত্রের দায় দায়িত্বটা যে বড্ড বেশি!" বলেছে অরিন্দম মাটা। এসব ব্যাপারে তার বলবার অধিকার আছে, কারণ অরিন্দমের এক মামা এম. এ. পরীক্ষা দিয়েই রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছেন।

"জানো ভাই, সন্ন্যাসী হবার আগ্রহ দেখিয়ে কেউ কেউ হুড়মুড় করে এগিয়ে যায় সাধনপথে, আবার কেউ কেউ কিছুটা এগিয়ে সামনে দুর্গম পথ দেখে সিদ্ধান্ত পালটে ইউ টার্ন নেয়, অনেকে অত হাঙ্গামায় না গিয়ে গৃহীভক্ত হয়েই সন্তুষ্ট থাকে, আবার কেউ কেউ দলত্যাগী এবং নিন্দুক হয়। প্রবল হতাশায় তারা গুরুনিন্দায় মুখর হয়ে ইংরিজিতে বই লেখে, দুর্বোধ্য ভিডিও ছবি তোলে, এমন কী সুযোগ পেলে কুৎসা ছড়ায়? বক্তৃতা দেয়।" প্রবল উৎসাহে কুৎসা ছড়িয়ে এরা আনন্দ পায়। এদেরই একজনকে অরিন্দম একবার বক্তৃতা করতে শুনেছিল। এই দলত্যাগীর প্রবল সন্দেহ স্বামী বিবেকানন্দ স্বভাব সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি অভাব সন্ন্যাসী, অর্থাৎ চাকরি বাকরি জোগাড় করতে না পারলে মানুষ নিশ্চিন্তে দু-মুঠো অন্নের জন্যে সন্ন্যাসী হতে পারে।

সুখময় মুখার্জির সন্ন্যাস ব্যাকুলতা সম্বন্ধে তেমন কথা বাড়বার আগেই

অরিন্দম মাটা জানিয়ে দিল, "সাধনা ব্যানার্জিকে মনে আছে তো? প্রতিদিন অত সাজগোজ এবং স্টাইল করে যে মেয়ে কলেজে আসতো সে হঠাৎ সন্ন্যাসিনী হয়ে স্নিগ্ধপ্রাণা না কি নাম নিয়েছে।"

"তাকানো যায় না ভাই, অমন সুন্দরী মাথার চুল কামিয়ে সর্বত্যাগিনী হলে সমবয়সীদের মনে নিষ্ঠুর একটা ধাক্কা লাগে। বাগবাজারে শ্রী শ্রী সারদা মায়ের মন্দিরে কি একটা অনুষ্ঠানে সাধনা এসেছিল, আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, খুউব কষ্ট লাগলো। মেয়েদের মাথায় কখন যে কি আইডিয়া ঢুকে যায় তা বলা শক্ত।"

আর এক বন্ধু, ফোড়ন কাটলো, "অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন, মেয়েদের মনের রাস্তা তৈরি হয়েছে ওয়ান ওযে ট্রাফিকের জন্য! একবার একদিকে এগোলে তাকে রিটার্নজার্নিতে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে আনা খুব শক্ত।" বলেছে এই বন্ধু, ত্যাগ এবং ভোগ দুই ব্যাপারেই যার সমান আগ্রহ। সুখের বিষয় সন্ন্যাসিনীদের সম্পর্কে একটা চাপা সম্ভ্রম এখনও এদেশের সর্বত্র সারাক্ষণ সজীব রয়েছে। তাই উপস্থিত বন্ধুদের মধ্যে ওবিষয়ে আলোচনা তেমন রসালো হলো না। বরং সবাই স্বীকার করলো, "কার জীবনে কখন যে কী হয়, কেন হয় এবং কেমন করে হয় তার আসল হিসেবনিকেশ করা খুবই কঠিন।" তবে চেনা মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়ে অন্যজনের আগ্রহ কিছুতেই কমতে চায় না।

সুখময় মুখার্জি সম্বন্ধে প্রচারিত স্পট রিপোর্টটা কানে কানে শুনে অন্তত দু'জন সহপাঠী বন্ধুর চোখের মণির আকার এবার দ্বিগুণ হলো। এঁদের সবিস্ময় তাৎক্ষণিক মন্তব্য—"সুখময়! অফ অল পার্সনস্! নো নো, হতে পারে না। হতে পারে না।"

এই সুখময়ই তো কলেজে তার সহপাঠীদের সাবধান করে দিয়েছিল, "কথায় কথায় মহাপুরুষদের নিন্দা কোরো না!" দোষের মধ্যে এক বন্ধু ফচকেমি করে প্রশ্ন তুলেছিল, "নরেন্দ্রনাথ দত্ত অভাব সন্ন্যাসী না স্বভাব সন্ন্যাসী?"

সুখময় সেদিনই মন্তব্য করেছিল, "সময় রয়েছে, সুযোগ রয়েছে, মগজে

কিছু বুদ্ধিও রয়েছে, ওঁর সম্বন্ধে দু'চারটে বইপত্তর পড়ো না? তা হলেই বুঝবে, এ সংসারে গরা স্বভাবে সন্ন্যাসী আর কারা অভাবে সন্ন্যাসী। রোজগার করার জে., চাপলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্যারিস্টার ডবলু সি ব্যানার্জির মতন অনেক টাকা রোজগার করতে পারতেন, এর জন্যে বিবেকানন্দ হবার প্রয়োজন হতো না।" এসব কথা সুখময় মুখার্জি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে কতদিন আগে বন্ধুদের বলতো।

আজকের পুনর্মিলনে সুখময়ের চাঞ্চল্যকর অধঃপতন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহের জন্য এক বন্ধুর ওপর চাপ দিচ্ছেন তাঁরই বিদুষী সহধর্মিণী। এই মহিলা এই প্রথম স্বামীর সহপাঠীদের পুনর্মিলনে এসেছেন। মন্তব্য করার মতন দু'একজন নায়ক-নায়িকা চোখের সামনে না দেখলে স্বভাবকৌতূহলী রমণীদের প্রাকৃতিক ঔৎসুক্যের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি হয় না।

স্বামী-দেবতা সবার সামনে না বলে স্ত্রীর কানে কানে এবার কিছু বললেন, অর্থাৎ সুন্দরী মহিলা এবার স্বামীর সহপাঠী সুখময়ের 'স্টপ প্রেস' খবরটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে শুনলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রি-অ্যাকশন! আর এক মহিলা বলে উঠলেন, "ওমা! ওঁরা জোড়ে এখানে আসবেন নাকি! ছি ছি! আইনের চোখে ব্যাপারটা তো..." এই বলে একটা নোংরা শব্দ উচ্চারণ করলেন সুপ্রতীক ব্যানার্জির সহধর্মিণী।

স্বামী সুপ্রতীক এবার সুদেহিনী স্ত্রীকে কোনোক্রমে সামলালেন, "সুনন্দা, এই যুগে এই পৃথিবীতে কে কার সমালোচনা করে? সবাই হিজ-হিজ-হুজ-হুজ মানসিকতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে, সেইমতো তারা সংসারে বসবাস করবে, তারপর সময় হলে চলে যাবে। এখানে কেউ কারও মরাল গার্জেন বা নৈতিক অভিভাবক নয়।"

"ওমা! তোমরা আজকে কী সব নোংরা কথা বলছো? মানুষের সমাজে মানুষের ওপর মানুষের নির্ভরতা নেই?" সুপ্রতীকের অধ্যাপিকা স্ত্রী সুনন্দা

ব্যানার্জি ফোঁস করে উঠলেন।

অরিন্দম মাইতি বিজনেস ছাড়াও একটু শখের থিয়েটার করে। সে এবার গম্ভীরভাবে বললো, "ম্যাডাম! এই পৃথিবীতে মানুষের পরনির্ভরতা কেবল তিনটে সময়ে—ভূমিষ্ঠ হবার মুহূর্তে, বংশ সৃষ্টির প্রাক্কালে এবং শরীর ছেড়ে চলে যাবার সময়ে, কারণ প্রাণহীন শরীরটা জীর্ণ জামাকাপড়ের মতো মূল্যহীন হলেও, অন্তত ঘণ্টা দেড়েক সময় লেগে যায় ভদ্রভাবে পঞ্চভূতে বিলীন হতে। এ-ছাড়া মানুষ অন্যসময়ে যদি একটু স্বাধীন থাকতে চায়, নিজের খেয়ালখুশি মতন যদি চলতে চায়, তাহলে আমাদের আপত্তি কি?"

আলোচনা ও তর্ক যখন জমে উঠেছে ঠিক সেই সময় বন্ধুবর সুখময় মুখার্জি প্রাক্তন সহপাঠীদের পুনর্মিলনে উপস্থিত হয়েছিল। সাধারণ বাঙালিদেব তুলনায় দীর্ঘদেহী সুখময়ের স্লিম শবীরে গেরুয়া খাদির পাঞ্জাবি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, সুঠাম, সুদর্শন শরীব। সুখময় কালো-ও নয়, ফর্সাও নয়। ওকে সশবীবে এগিয়ে আসতে দেখেই সবাই আচমকা চুপচাপ হযে গেল।

একটা কষ্টকব অস্বস্তি হঠাৎ যেন সিগারেটের ধোঁয়ার মতন ভেসে বেড়াচ্ছে। তার উপস্থিতি যে আলোচনা প্রবাহে বাধা দিয়েছে তা বুদ্ধিমান সুখময় অবশ্যই বুঝতে পাবছে। বোধ হয কোনো মুখরোচক বিষযে ততোধিক মুখরোচক আলোচনা চলছিল, তা সুখময়ের আকস্মিক আবির্ভাবে হঠাৎ বন্ধ হয়েছে।

ভাগ্য ভাল. সুখময়েব মুখের ওপর তখনও কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু সোজা সরল মনে অরিন্দম মাটা কিছু আগেই চুপিচুপি কয়েকটা কথা সুখময় সম্বন্ধে প্রচার করেছে। সে বলেছে, "কিছু মনে করিস না ভাই, গুজবটা কীভাবে এখানে বেশ রটে গিয়েছে—কোনও এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহিলার সঙ্গে আমাদের সুখময মুখার্জি কিছুদিন হলো মনের সুখে লিভ টুগেদার করছে!"

"তোমার আমার অচেনা, নিশ্চয় সুখময়ের অচেনা নয়, ব্রাদার," এক

বন্ধু ফোড়ন দিয়েছে।

"অরিন্দম, ফর ইওর ইনফরমেশন, অচেনা অজানা মেয়েকে ছাঁদনা তলায় উপস্থিত থেকে বিয়ে করে নেওয়া যায়, কিন্তু অচেনা মেয়ের সঙ্গে লিভ টুগেদার তো সম্ভব নয়।"

লিভ টুগেদার! শব্দটা উপস্থিত সকলের কাছেই একটু অস্বস্তিকর ঠেকছে।

অথচ কে না জানে, দেশে বিদেশে গত কয়েক বছরে এই শব্দটা ডালভাত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এর প্রকৃত তাৎপর্যটা হরপার্বতী, উমামহেশ্বর, শিবদুর্গার এই প্রাচীন দেশে এখনও ঠিকভাবে পৌঁছয়নি। এখানকার রমণীরা, শতদুঃখের মধ্যেও সিঁথিতে চীনে সিঁদুর ছড়িয়ে সতীসাবিত্রী, সীতাসরমাকে বুকের সিংহাসনে বসিয়ে এদেশের সংসার আলো করে রেখেছেন। তাঁদের কাছে এখনও লিভ টুগেদার ঠিক পরিষ্কার নয়। আর ধন্য এই ইংরিজি ভাষা—একই কথার শব্দার্থ নিতান্ত নির্মল, অথচ গূঢ়ার্থ একেবারে কর্দমাক্ত!

পুনর্মিলনে উপস্থিত এক সহপাঠীর স্ত্রী সরলমনেই জিজ্ঞেস করলেন, "স্বামী-স্ত্রী লিভ টুগেদার করবে না তো কি লিভ অ্যাপার্ট করবে! একসঙ্গে জীবন কাটাবে বলেই তো এতো কাঠ পুড়িয়ে অগ্নিসাক্ষী রেখে বিবাহ করা।"

সুপ্রতীক ব্যানার্জি এবার তার অধ্যাপিকা স্ত্রীকে বললেন, "লিভ টুগেদারের ঠিকঠিক বাংলা হওয়া উচিত সহবাস! কিন্তু ইংরিজি শব্দ যদি একপা পিছিয়ে থাকে তো বাংলা শব্দ সবসময় কোনো অস্বস্তিকর ইঙ্গিত আরোপ করার জন্যে একপা এগিয়ে যায়। সহবাস কথাটা কত সুন্দর এবং কত সহজ থাকতে পারতো, কিন্তু নরনারীর দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর যে একটা বেয়াড়া মানে হয়ে গেল তা তো কারও জানতে বাকি নেই।"

লিভ টুগেদার কথাটা ইংরিজির খাঁচা থেকে বেরিয়ে হঠাৎ গৃহস্থ বাঙালির শব্দ ভাণ্ডারে ঢুকে পড়ল কেন? এবং কোন সময়? তা অনেকেরই খেয়াল হয়নি। অধ্যাপক ব্যানার্জি রসিয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা চালালেন,

বাংলায় লিভ টুগেদারের ইঙ্গিতবহ অর্থ : "একত্র বসবাস বলুন, সহবাস বলুন আপত্তি নেই, কিন্তু বিবাহের গাঁটছড়া না বেঁধে। সোজা কথায়, বিয়ে না করে একই সঙ্গে জীবন যাপন!"

সুপ্রতীক গৃহিণী শ্রীমতী সুনন্দা বয়সে প্রবীণা না হয়েও কিছুটা রক্ষণশীলা! তিনি এবার গম্ভীর হয়ে উঠলেন। তাঁর শরীর নাকি রি-রি করছে! লজ্জাজনক বিষয়ে আলোচনা আরও বিস্তৃত হোক তা তিনি চাইছেন না।

অধ্যাপিকা সুনন্দা ব্যানার্জির ভয় হচ্ছে, বিশ্বসংসারের যেখানে যত নোংরা অভ্যাস জড়ো হয়েছে তা অবশেষে এদেশের নর্দমা উপচে বাঙালিদের ঘরে ঢুকে পড়ছে।

সুনন্দা ব্যানার্জি যে রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠেছেন তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ভয়ডর না রেখেই তিনি প্রশ্ন তুললেন, "বিয়ে না করে জোড়ে থাকা!—মানেটা কি?" ব্যাপারটা যে কোনও বাঙালি মেয়ে কোনোদিন বরদাস্ত করবে না তাও তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন।

স্ত্রীর অবগতির জন্যে স্বামী সুপ্রতীক এবার মজা করে ব্যাখ্যা করলেন, "লিভ টুগেদার মানে একজন সমর্থ পুরুষ একজন সমর্থা রমণীর সান্নিধ্যে একই ছাদের তলায় একই ঘরের মধ্যে স্বেচ্ছায়..."

"থাক থাক! আর তোমাকে নোট দিতে হবে না।" স্বামীকে আর এগোতে দিতে উৎসাহিনী নন সুনন্দা। পুনর্মিলন উৎসবে জড়ো হওয়া পুরনো বন্ধুদের সামনেই মিসেস ব্যানার্জি এবার তাঁর স্বামীকে নিগৃহীত করলেন, "ঘরের মধ্যে যে বিছানা থাকে এবং সেখানে যে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীর জায়গা হতে পারে তা দুনিয়ার সবাই জানে, ফলাও করে বলার দরকার নেই।"

অধ্যাপক সুপ্রতীক ব্যানার্জি অগত্যা বিবাহের ব্যাখ্যায় ব্রেক কষলেন। একালের নরনারীর সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ইঙ্গিতপূর্ণ অশ্লীল তথ্যকে তাঁর শিক্ষিকা স্ত্রী যে মোটেই বরদাস্ত করেন না তা তাঁর অজানা নয়। তবু পুরনো সহপাঠীদের ও তাদের স্ত্রীদের পাল্লায় পড়ে যথেষ্ট সাবধান হয়ে

শেষবারের মতন সুপ্রতীক দুঃখ করলেন, "বিবাহিতা বঙ্গনারীদের এই দোষ! নিজের মত ছাড়াও বেচারা স্বামীর যে অন্য একটা মত থাকতে পারে তা কিছুতেই মনে রাখতে চায় না!"

স্ত্রী ফোঁস করে উঠলেন : "বিয়ে না করেও স্বামী-স্ত্রী হওয়া! এর জন্যে তো বটতলায় এবং কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় অনেক সস্তা গল্প-উপন্যাস বিক্রি হচ্ছে ; তথাকথিত রঙিন 'মেয়েদের পত্রিকা' আছে যার সব লেখাই বাজার বুঝে ছেলেরা অথবা ছেলেমার্কা মেয়েরা লিখে ফেলে! খুব সুবিধে হবে এইসব পত্রপত্রিকার, দেশটাকে রসাতলে পাঠানোর কাজটা বিনা বাধায় সুসম্পন্ন করা যাবে।"

অধ্যাপক সুপ্রতীক ব্যানার্জি ব্যাখ্যা করলেন, "সুনন্দা শোনো। দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের এক সঙ্গে থাকাথাকির অনেকগুলো দিক আছে ; বিষয়টা ভীষণ সিরিয়াস। লৌকিক বিয়ের ব্যাপারটা অতটা সিরিয়াস নাও হতে পারে সবার কাছে। তুমি বাঙালিদের সংসারের দিকে তাকিয়ে দেখো—পবিত্র বেদ মন্ত্র পাঠ করে বিয়ে হয়েছে এই ঘটনাটি নিয়ে কোনো দম্পতি মাথা ঘামাচ্ছে না চব্বিশঘণ্টার মধ্যে দশ মিনিটও। অথচ সব পুরুষ ও রমণী ব্যস্ত রয়েছে এই যৌথ বসবাস নিয়ে। ঘরসংসার, রুজিরোজগার, আত্মসংরক্ষণ, অসুখবিসুখ এইসব নিয়েই মানুষ হিমসিম খাচ্ছে—এই জীবন সংগ্রামে বিয়েটা কতখানি বাড়তি সুরক্ষাচক্র সৃষ্টি করছে তা ঠিক বুঝতে পারা যায় না।"

"খুব বুঝতে পারা যায়! জেনেশুনে তুমিও বোকা সাজতে চেয়ো না!" বকুনি খেলেন সুপ্রতীক। "বিয়ের সময়ে অগ্নিসাক্ষী করে একটা সুরক্ষাচক্র আঁকা হলো বলেই একজন পুরুষ ও একজন মহিলা এইভাবে সংসারসমুদ্রে একসঙ্গে সাঁতার কাটবার দুঃসাহস দেখাতে পাচ্ছে। বিয়েটা কোনো সস্তাদরের খেলনা নয়, তবু পুরুষমানুষ সুযোগ পেলেই এটা ভাঙতে চায়।"

বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পুরনো দিনের বন্ধুরা বৃত্তাকারে আলাপ

আলোচনা চালাচ্ছে। বন্ধুদের মধ্যে বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা আরও গড়াত, কিন্তু সহাস্য সুখময় এখানে এসে দাঁড়াতে সবাই ঝটপট সুখের ঝাঁপ বন্ধ করে ওর দিকে তাকাতে লাগলো। বন্ধু এবং বান্ধবীদের ডায়ালগ যে মাঝপথে বন্ধ হয়েছে তা বুঝতে সুখময়ের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

পুনর্মিলন উৎসবে কয়েকজন সুতনুকা মহিলা সুখময়ের সহপাঠীদের পত্নীত্বের অধিকারে এখানে উপস্থিত রয়েছেন। তাঁরা যেন বেশ সন্ধিগ্ধ চোখে সুখময়কে বিশেষভাবে যাচাই করছেন।

এই বিতর্কিত মানুষটির মধ্যে একটি নির্বিবাদী বঙ্গসন্তান ছাড়া অন্য কোনো শক হুন অথবা পাঠান মোগল লুকিয়ে আছে বলে তো মহিলাদের মনে হচ্ছে না! ফলে তাঁরা কিছুটা হতাশা বোধ করছেন।

সুখময়ের চেহারায় নিতান্তই গেরস্ত বাঙালির ছাপ, যদিও চোখদুটি বেশ বড় এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল। বাঙালিদের মধ্যে কিছু শরীর দেখা যায় যা চক্ষুযুগলের ওয়াটেজেই দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে। এইসব মানুষের উজ্জ্বলতা ভিড়ের মধ্যেও বেড়ে যায়। এদের দৈহিক আকর্ষণও লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে।

কোনো কথা না বলে, প্রথমে কেবল হাসলো সুখময়। নবাগতারা লক্ষ্য করলেন তার দাঁতগুলি সুন্দর ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। এমন দাঁত থাকলে মাঝে-মাঝে অকারণে হেসে ফেলা নিরর্থক হয় না। বিতর্কিত মানুষটির উচ্চতা বোধ হয় পাঁচফুট সাত, বঙ্গ রমণীরা জানেন, কোনো বাঙালি পুরুষের উচ্চতা অন্তত পাঁচফুট হলে বহুজনের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না। বিয়ের বাজারে দীর্ঘদেহী বাঙালি পাত্ররা এখনও কিছুটা প্রিমিয়ম টানছেন।

এই যে সহপাঠী ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব, এখানে সগর্বে বিশেষ উল্লেখ করার মতন পাত্রপাত্রী এখনও তেমনভাবে তালিকাবদ্ধ হয়নি। একজন বন্ধু বললো, "ভাই অরিন্দম, আমাদের ব্যাচটা মোস্ট অর্ডিনারি ব্যাচ—নামকরা বাঙালি হয়ে দেশজোড়া সুনাম আমাদের মধ্যে এখনও কেউ পায়নি। কলেজে পড়ে, ডিগ্রি নিয়ে, অন্নসংস্থান করে কোনোরকমে বেঁচে থাকা এবং জীবনধারণ করা! আর কি হতে পারে অর্ডিনারি বংদের

জীবনে।”

এই বং কথাটা অরিন্দম আগে শোনেনি। “এটা কি গালাগালি ভাই?” সে সরল মনে জিজ্ঞেস করলো।

“যারা আমাদের অপছন্দ করে তারা নিজেদের মধ্যে ঘোষ বোস হাজরাকে বং বলে! গালাগালি কিনা জানি না, তবে অবশ্যই এটা টিটকিরি, যা জেনুইন বংদের বেশ মানিয়ে যায়!”

অরিন্দম মাইতি বললো, ‘ভাই, বিশ্বের বাজারে নাম করবার মতন বয়স এখনও পার হয়ে যায়নি। এই তো সবে কলির সন্ধে! একদিন আমাদের সহপাঠীদেরও যথেষ্ট নামধাম, সেই সঙ্গে একটু বদনাম এবং টুপাইস হবে! পকেটে টুপাইস এলে ওয়ান পাইস আমরাও দানধ্যান করতে পারবো! তখন সর্বত্র আমাদের প্রশংসা হবে!”

সুপ্রতীক ব্যানার্জি হেসে বললেন, “নাম হলে একমাত্র তোরই হবে অরিন্দম! তুই হয়তো ইন্ডিয়ার ফাস্ট ফুড কিং ম্যাকডোনাল্ড বা কে-এফ-সি কিছু একটা হয়ে যাবি। আমি তো কলেজের মাস্টার, আমার দৌড় আর কতদূর? বড়জোর দিল্লির নামকবা পাবলিশারের জন্যে নোটবই লিখে লক্ষপতি হবো কিংবা কলেজের মর্নিং সেকশনের ভি-পি হবো!”

“ভাইস প্রেসিডেন্ট?”

“ওরে না। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল! ভাবী প্রিন্সিপ্যালের মধ্যে কিছু ভাইস ঢুকলে তাকে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল বলে!”

অরিন্দমের সংযোজন : “বলা যায় না, স্যর পি সি রায়ের মতন কিছু একটা আবিষ্কার করে তুই হয়তো স্যর সুপ্রতীক হয়ে গেলি।”

“ইন্ডিয়ানদের পক্ষে স্যর হওয়া আর সম্ভব নয়, অরিন্দম,” একটু দুঃখের সঙ্গে মনে করিয়ে দিল সুপ্রতীক।

এবার সুখময়ের তাৎক্ষণিক উত্তর, “সবই সম্ভব, সুপ্রতীক। স্যর না হয়ে, বিলেতে এন-আর-আই হয়ে তুই হয়তো স্বরাজ পলের মতন লর্ড পল হয়ে গেলি। কাগজে দেখছিস না, কয়েক ডজন ইন্ডিয়ান লর্ড এখন খোদ লন্ডন শহরে বিপুল বিক্রমে ঘোরাফেরা করছেন। স্বাধীনতার আগে

কিন্তু এমন অবস্থা হয়নি ভাই।"

সুপ্রতীক এবার বললেন, "নামডাকের ব্যাপারে আমার বউ-এর কিছু একটা সদ্‌গতি হতে পারে। ইন্ডিয়ান দর্শন শাস্ত্র নিয়ে কীসব বই লেখার রসদ সংগ্রহ করার কথা সারাক্ষণ ভাবছে। সাড়ে-ছ'ফুট লম্বা দুটি ঢাউস জার্মান সায়েব প্রাচীনকালের বস্‌কে শিষ্যের মতন আমার গিন্নির পদতলে সারাক্ষণ মাথা নিচু করে বসে আছে।"

অরিন্দম মাইতি বললো, "সায়েবদের ভোগবাসনা বড্ড বেশি শুনেছিলাম, সুপ্রতীক। ওরা কি এবার মোক্ষটোক্ষর দিকে বেশি ঝুঁকবে?"

"শোনা কথায় বেশি কান দিও না ভাই। সুখে থেকে থেকে ওদের অনেকের ভোগে অরুচি ধরে গিয়েছে। দেখছ না, ইসকনের রথযাত্রার সময় মনের সুখে খোল করতাল বাজিয়ে কত সায়েব আদর্শ ভক্ত হবার সাধনা করছে। প্রভুপাদ এসি ভক্তিবেদান্ততীর্থর ছবি বুকের কাছে লকেটের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখছে, আর আমরা ইন্ডিয়ানরা বিলিতি সায়েবদের পরিত্যক্ত টুথব্রাশ 'লিভ টুগেদার' অন্ধ অনুকরণ করে হিরো হতে চাইছি।"

কথাগুলো যে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি না-বুঝেই বলা হয়েছে তা আন্দাজ করতে পারছে অরিন্দম মাইতি। সুখময়ের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো পরিষ্কার জানা থাকলে কোনো মহিলা নিশ্চয় প্রকাশ্যে তারই সামনে এই লিভ টুগেদারের প্রসঙ্গ তুলতো না। আসলে এই পুনর্মিলনগুলো তো তর্কসভা নয়, কাউকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যও এখানে থাকে না। স্রেফ পুরনো বন্ধুরা একত্র হয়ে হারিয়ে যাওয়া ছাত্রজীবনের সুমধুর দিনগুলো রোমন্থন করা।

এই রোমন্থন-কথা নিয়ে আগেও রসরসিকতা হয়েছে। স্বয়ং সুখময় সেবার বন্ধুদের বলেছিল, "ওরে হতভাগা মানুষ কখনও রোমন্থন করে না, ওটা গোরুদের প্রিভিলেজ! মানুষ যা করে তাকে বলা যায় স্মৃতিচারণ, ইচ্ছে থাকলেও সেখানে চর্বিতচর্বণের কোনো সুযোগ নেই, অরিন্দম।"

আজকের পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে এই আশঙ্কায় অরিন্দম এবার সবার অলক্ষে বন্ধু সুপ্রতীকের পিঠে একটা মৃদু শারীরিক খোঁচা মারলো।

একটু পরে সুপ্রতীক ও তার উৎসাহী স্ত্রীকে এই বৃত্ত থেকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল আজকের অনুষ্ঠানের মুখ্য স্থপতি অরিন্দম মাটা। ফিসফিস করে সুপ্রতীককে সে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিল।

সুপ্রতীক এবার তার গৃহিণীকে চাপা গলায় একটু বিরক্তভাবেই বললেন, "এই কী করছ! সুখময় কাছেই ঘোরাঘুরি করছে, বেচারা খুব অস্বস্তিতে পড়ে যাবে।"

সুনন্দা ব্যানার্জি বুঝলো তার একটু অন্যায় হয়ে গিয়েছে। তবু সে প্রতিবাদ করতে ইতস্তত করল না। তার বক্তব্য : "বাঃ, বিয়ে থা না-করে হাজার লোকের চোখের সামনে কারুর সঙ্গে দিনের পর দিন সুখশয়নে ঘুমিয়ে থাকায় আপত্তি নেই ; যত অস্বস্তি এই লিভ টুগেদারের আলোচনা হলে।"

অরিন্দম বললো, "মিসেস ব্যানার্জি, বন্ধুবান্ধবদের সব ব্যাপারে আমাদের নাক গলিয়ে লাভ কি? আমরা তো এই গেট টুগেদারের জন্যে সবাইকে ঢালাও পারমিট দিয়েছিলাম, যার যাকে খুশি সঙ্গিনী হিসেবে আনতে পারো। যার প্রাণ যা চায় তা করুক এখানে। এটা তো কাঁকুড়গাছি বামকৃষ্ণ যোগোদ্যান নয়। তবু ভাল বলতে হবে! তবু অনেক ভেবেচিন্তে সুখময় মুখার্জি একা এখানে এসেছে, ইচ্ছে করলেই সে ইরাবতীকে এখানে আনতে পারতো।"

সুনন্দা ব্যানার্জি কিন্তু ব্যাপারটা হজম করলো না। সে প্রশ্ন করলো, "আপনি কী বলছেন, অরিন্দমবাবু? ভদ্রঘরের মেয়ে আমরা, সমাজে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াই, মেয়ে কলেজে পড়াই, বাবা-মায়েরা কত ভরসা করে তাঁদের মেয়েদের ছাত্রী হিসেবে আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। আর আমরা নিজেরাই সব দায়দায়িত্ব ভুলে গিয়ে স্বামীর ভূতপূর্ব সহপাঠীদের রক্ষিতাদের সঙ্গে হৈ হুল্লোড় করব হোয়াই?"

ভাগ্যে সুখময় অন্যত্র আরও কয়েকজন পুরনো বন্ধুপরিবৃত হয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে সুনন্দার কটু মন্তব্য পৌঁছচ্ছে না!

সুনন্দার স্বামীর ভূমিকা এই মুহূর্তে একটু স্পেশাল। অধ্যাপিকা স্ত্রীর

বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত হচ্ছেন না সুপ্রতীক, কিন্তু ওর কাটা কাটা কথায় আজকের পুনর্মিলনে কোনো অঘটন ঘটুক তাও চাইছেন না সুপ্রতীক।

"শোনো সুনন্দা", সুপ্রতীক বললেন। "রক্ষিতা কথাটা খুবই খারাপ শব্দ—আমাদের সবসময় মনে রাখা উচিত পুরুষ ও নারীর দৈহিক সম্পর্কে টাকা পয়সার প্রত্যক্ষ লেনদেন না থাকলে রক্ষিতা কথাটা আমাদের সমাজে এখনও অচল।"

"রাখো তোমাদের সমাজ। কোন গুণধর কোথায় কিসের লেনদেন করে কী অপকর্ম করছে, কখন কাকে পাশে শুইয়ে নিশিযাপন করছে তা গেরস্ত মানুষের পক্ষে সবসময় জেনে রাখা সম্ভব নয়। আর কোন দুঃখেই-বা মানুষকে অতশত জানতে হবে?"

এবার দূর থেকে সুখময় মুখার্জির দিকে তাকালো সুনন্দা ব্যানার্জি। তারপর বললো "সুখময়ের মুখটা দেখো! ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না মনে হবে! রাস্তায় হঠাৎ দেখা হলে ভাবতেই পারতাম না, এই গোবেচারা মানুষটি সমস্ত লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে তার বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরে মনের আনন্দে একত্র বসবাস করছে, বিয়ের হাঙ্গামায় যাবার কোনো প্রয়োজনই বোধ করছে না এই ভদ্রলোক।"

পুনর্মিলন উৎসবের হলঘরে অনেকের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও তেত্রিশ বছর বয়সের সুখময় মুখার্জি বেশ বুঝতে পারছে তাকে নিয়েই কিছু অস্বস্তিকর আলোচনা চলেছে তার আশেপাশে। অবশ্য পরিস্থিতি যাতে আয়ত্তের বাইরে চলে না যায় তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে দুই বন্ধু সুপ্রতীক ব্যানার্জি এবং অরিন্দম মাটা।

সুনন্দা একটু আগেই শুনিয়ে দিয়েছে অরিন্দমকে, "আপনার ক্যাটারিং-এর বিজনেস, আপনার কথা আলাদা। যার পার্টি দেবার সামর্থ্য আছে সুযোগ আছে তাকেই আপনার দরকার ক্যাটারিং বিজনেসের স্বার্থে। কিন্তু আমরা দু'জনে হচ্ছি নির্ভেজাল মাষ্টার এবং মাষ্টারনি! ছেলেমেয়ে পড়িয়ে কোনো রকমে সংসার চালাই। যেখানে বন্ধুদের রক্ষিতাদের উপস্থিত

করবার জন্যে আপনারা উৎসাহী সেখানে দয়া করে আগাম জানিয়ে দেবেন, আমরা অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবো। সামাজিকতা করতে এসে চক্ষুলজ্জার খাতিরে অবৈতনিক রক্ষিতাদের রেকগনাইজ করবার হাওয়া এখনও এদেশে বয়নি।"

"আঃ সুনন্দা, তোমার কী হলো আজ?" কাতর আবেদন করলেন সুপ্রতীক ব্যানার্জি।"

"কি আবার হবে! সব কিছু নোংরামি মেনে নেবার জন্যে দু'একটা বাংলা সচিত্র মহিলা পত্রিকা ইদানীং যা সব লিখে বেড়াচ্ছে তা কোনোক্রমেই বাঙালি সমাজের মনের কথা নয়। ঘরভাঙানো সংসারজ্বালানো সুন্দরী অথচ দজ্জাল গেছো মেয়েরা মহিলা-পত্রিকার সম্পাদিকা সেজে গেরস্থর ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেবে আর আমরা সবাই হাতগুটিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখবো তা হতে পারে না।"

"এখানে তো অনিচ্ছুক বয়সকে শিকলে-বেঁধে রাখা কোনো প্রবাদপ্রতিম বিগত যৌবনা লেখিকা বা সম্পাদিকা উপস্থিত নেই, তুমি কার কাছে প্রতিবাদ জানাচ্ছ, রাগ দেখাচ্ছ?" সুপ্রতীক চেষ্টা করলেন তাঁর রেগে-ওঠা স্ত্রীকে কোনোরকমে সামলাতে। কিন্তু সুপ্রতীক জানে তাঁর সহধর্মিণী নামকরা কলেজের উঠতি অধ্যাপিকা, ইচ্ছে করলেই তার মুখ পুরো সীল করা তাঁর মতন অসহায় স্বামীর পক্ষে সম্ভব নয়।

সুনন্দা কিন্তু কিছুতেই নরম হচ্ছে না। সুপ্রতীক এবার সাহস করে বললেন, "তোমার প্রাণের বান্ধবী মালতী তো সোসিওলজি পড়ায়। ঠাণ্ডামাথায় তাকে জিজ্ঞেস করে দেখো সমাজবিজ্ঞানীদের চোখে রক্ষিতা ও যারা লিভ টুগেদার করে তাদের মধ্যে সত্যিই কোনো পার্থক্য আছে কিনা।"

সুপ্রতীকের কথার সূত্র ধরে অরিন্দম মাটা এবার আরও একটু এগিয়ে গেলো। সে বললো, "মিসেস ব্যানার্জি, আপনি আমার ওপর অহেতুক রাগ করছেন। এটা মনে রাখবেন যে সবাই যদি বিয়ে না করেই একত্র বসবাসের জন্যে দুমদাম ঘরসংসার পাততে শুরু করে তা হলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে

আমার এই অরিন্দম ক্যাটারিং। এই অধমের বিজনেস বলে কিছু থাকবে না, মিসেস ব্যানার্জি।"

"অরিন্দম, তুমি বলতে চাইছ সংসারে বিয়ের সব দুর্ভোগ থাকবে, অথচ কোনো ভোজ থাকবে না!"

"ঠিক ধরেছ ভাই, সুপ্রতীক। সংসারে সারাজীবন ধরে দুই পার্টনারকে কত দুর্ভোগ পোয়াতে হবে তা আগাম আন্দাজ করেই, শুরুটা যাতে একটু আকর্ষণীয়, একটু ড্রামাটিক হয় তা নিশ্চিত করার জন্যেই তো এই বিবাহ উৎসব, মন্ত্রপাঠ এবং ভোজ।" .

সুনন্দা হাসলো। "মিস্টার মাটা, বিবাহ এবং ভোজ জিনিসটা এক নয়। বিয়েতে ভোজ দিতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই।"

অরিন্দম সবিনয়ে বললো, "দয়া করে আমাকে মাইতি বলুন, মিসেস ব্যানার্জি। মাটা এবং মাইতি শব্দ দুটোর উৎপত্তি এক, তাই আদালতে উকিল মারফৎ এফিডেভিট করে মাইতি হয়েছি। আর আপনি যা বলছেন তা সারাক্ষণ হাড়ে-হাড়ে বুঝছি। আমেরিকান সায়েবদের কমপিউটর হিসেবে অনুযায়ী গত বছর আমাদের এই অভাগা ভারতবর্ষে দশ মিলিয়ন অর্থাৎ এক কোটি বিয়ে হয়েছে, অথচ আমরা ক্যাটারাররা প্রায় কিছুই বুঝতে পারলাম না। হাজার হাজার ফুল প্লেট, হাফ প্লেট, ডেকচি, কাঁচের গেলাস কিনে কিংবা ভাড়া নিয়ে পাঁজির শুভবিবাহের দিনগুলোর দিকে আমরা তীর্থ কাকের মতো তাকিয়ে বসে আছি। এর মধ্যে যদি আবার বিবাহহীন বন্ধন অথবা বন্ধনহীন বিবাহ চালু হয়ে যায় তা হলে তো এই ক্যাটারিং বিজনেস তুলে দিতে হবে। আপনি হয়তো বলবেন, কেন অন্নপ্রাশনের বিজনেস তো সবসময় থাকবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মধ্যবিত্ত পরিবারে অন্নপ্রাশনের বিজনেসও ভীষণ কমে যাচ্ছে। খবরের কাগজে যাই লিখুক, কলকাতা শহরে মধ্যবিত্ত ছেলেপুলে তেমন হচ্ছে না, ছেলেপুলে না হলে তো অন্নপ্রাশনের ভোজের কথা কেউ ভাববে না।"

অন্নপ্রাশনের বিষয়ে রসিকতা আরও কিছুক্ষণ চলল। অরিন্দমের আশঙ্কা

বঙ্গীয় সমাজে শ্রাদ্ধ ছাড়া শেষ পর্যন্ত কোনোও ভোজ থাকবে না, অথচ শ্রাদ্ধের ভোজে লোকে এখনও ক্যাটারিং কোম্পানিকে ডাকতে একটু অস্বস্তি বোধ করে।

সুখময় এ সব রসিকতা কিছুটা শুনেছে। কিন্তু বন্ধুদের পূর্ববর্তী আলোচনার বিষয়ে সে কি কোনো আঁচ পেয়েছে?

অরিন্দম লক্ষ্য করেছে, সুখময় এরই মধ্যে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

পুনর্মিলনের জন্য স্পেশালি তৈরি মেনুতেও সুখময় তেমন কোনো উৎসাহ দেখাচ্ছে না। অথচ একসময় ভোজনতালিকার প্রস্তুতিব ব্যাপারে তার যে প্রবল উৎসাহ ছিল তা অরিন্দম মাইতি ছাড়াও আরো অনেকে জানতো।

অস্বস্তিকর অবস্থা আন্দাজ করে পরিস্থিতি যতখানি সম্ভব সহজ করার জন্য সুপ্রতীক এবার বললেন, "ভাই সুখময়, অরিন্দমকে যতটা মাথামোটা বেরসিক মনে করতাম সে ততটা নয়। আমাদের আপ্যায়নের জন্যে খোদ হুগলী জেলার জনাই থেকে মিষ্টি আনাবার গোপন ব্যবস্থা করেছে! চাটনি এবং পাঁপড়ের পরে জনাইয়ের মনোহরা সারপ্রাইজ পরিবেশন করে সে আজ আমাদের উইকেট নিতে চায়। মনে আছে সুখময়, কিছুদিন আগে তুমি একবার জনাইতে সরেজমিনে তদন্ত করে ভারতীয় মিষ্টান্ন সভ্যতায় জনায়ের দান বলে মোক্ষম প্রবন্ধ লিখেছিলে রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়?"

ব্যাপারটা মিথ্যে নয়। জনায়ের পতিরাম ময়রা তেকোনা নিমকির আবিষ্কারক। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এই নিমকির কোনো উল্লেখই নেই।

বোঝা যাচ্ছে বাঙালির নিজস্ব সৃষ্টি এই নিমকি! আবার এই জনাই থেকেই বাংলার মিষ্টান্নকৃষ্টিকে বিশ্বময় প্রচার করেছেন প্রাতঃস্মরণীয় মোদক ভীমচন্দ্র নাগ এবং শ্রেষ্ঠতম সন্দেশের মৃত্যুহীন কৃত্তিবাস নকুড়চন্দ্র নন্দী মহাশয়। জনায়ের মানুষ না হলে এঁরা কিছুতেই এত বড় মিষ্টান্ন শিল্পী হতে পারতেন না, সুখময় লিখেছিল।

সুখময় হাসলো। সুপ্রতীক বললেন, "তুমি ভাই দুঃসাহসিক ভাষায় লিখেছো, স্রেফ মিষ্টান্নের অনিবার্য আকর্ষণে দেবতারা একের পর এক মনুষ্যবেশে হুগলী জেলায় জন্ম নিয়েছেন। খুব অরিজিন্যাল স্টেটমেন্ট।"

"অরিজিন্যাল নয় ভাই, এটা সাহস করে বলেছেন, বহু রসের রসিক প্রভাতরঞ্জন সরকারমশাই। আমি কেবল উদ্ধৃতি দিয়েছি।"

খাদ্যতালিকার ভিতরের খবর আরও কিছুটা যথা সময়ে ফাঁস হলো। জনায়ের মিষ্টি বড়ই মেজাজি। কোল্ডস্টোরেজে দিনের পর দিন তো দূরের কথা, কয়েকঘণ্টা পড়ে থাকবার ধৈর্য পর্যন্ত তার নেই। মিষ্টান্নের ভিতরকার এই গোপন খবর জেনেই উচ্চাভিলাষী ক্যাটারার অরিন্দম মাটা টাটকা জনাই পরিবেশনার ঝুঁকি নিয়েছে—যার অর্থ জনায়ের মিষ্টান্ন খোদ জনাই থেকে সংগৃহীত হয়ে কলকাতা থেকে পাঠানো মোটর গাড়ি চড়ে ঠিক পৌনে-আটটায় এই সাদার্ন অ্যাভিনিউ 'ম্যারেজ মন্দির'-এ সসম্মানে উপস্থিত হবে।

কিন্তু সুখময় এ ব্যাপারে কোনো ঔৎসুক্য দেখাচ্ছে না। মানুষ পরবর্তীকালে যৌবনকালের অভ্যেসগুলো জলাঞ্জলি দেয়, কত সহজে সে পাল্টে যায়। কিন্তু সে তো সাধারণত স্বাস্থ্যের কারণে, বেঁচে থাকার প্রয়োজনে—মিষ্টি খাবার মুখে ঠেকানো মানুষ বন্ধ করে দেয় বৃহত্তর কোনো শারীরিক সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার আগ্রহে।

"সুখময়, তোমার কি মিষ্টিটিষ্টি খাওয়া বারণ হয়েছে নাকি?" প্রশ্ন করছেন সুপ্রতীক। তারপর নিজের বউয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন সুপ্রতীক। বউ এখনই না বলে বসে, বিয়েওলা বউরা স্বামীর শরীরস্বাস্থ্য নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা করে, কিন্তু রক্ষিতার তো এ-বিষয়ে কোনো দায়দায়িত্ব

নেই। লিভ টুগেদার করা মহিলারা তো কখনও বিধবা হন না!

সামনে সুখময় দাঁড়িয়ে না থাকলে সুপ্রতীক তার বউকে শোনাতো কথা। "কেন ? বিয়ে না-করে একসঙ্গে বসবাস করলে সামাজিক এবং পারিবারিক অনেক সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান হয়ে যায়। স্ত্রী-পুরুষ দু'পক্ষেরই পরস্পরনির্ভরতা কমে যায়। সমান সমান দুটো মানুষের একত্র জীবনযাপনের সমঝোতা তো খারাপ ব্যবস্থা নয়।"

অবস্থা বুঝে বিষয় পরিবর্তন করে সুপ্রতীক বললেন, "ভাই সুখময়, একবার ছাদনাতলার কনভোকেশনে যোগ দিলেই বাঙালি পুরুষ কেমন যেন অপদার্থ হয়ে যায়! পুরুষ মানুষ দুম করে নিজের হাল একদম অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। আসলে আরেকজনের সাইকেলের কেরিয়ারে বসে নিখরচায় ডবলরাইডিংটা কুঁড়ে পুরুষ মানুষের কাছেই বেশ লোভনীয় ব্যাপার।"

অনেকদিন আগে ছাত্রজীবনে সপ্রতিভ ও সুরসিক সুখময় এ-বিষয়ে অনেক কথা বলতো। রসরসিকতায় সে তখন সত্যিই অদ্বিতীয় ছিল। নানা বিষয়ে দেশবিদেশের খোঁজখবর নেবার অদম্য কৌতূহল ছিল তার। কিন্তু আজ কী যে হলো!

সুখময় আবার হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, "এখানে থাকার কোনো উপায় নেই আজ ভাই। আমাকে যেতে হবে হাওড়া স্টেশনে। একজনকে রিসিভ করতে।"

এই একজনটি যে কে তা ভিড়ের মধ্যে সুখময় অবশ্যই ঘোষণা করলো

না। কিন্তু তাকে সাদার্ন অ্যাভিনিউ ম্যারেজ মন্দিরের গেট পর্যন্ত বিদায় করতে এসে অরিন্দম মাটা ব্যাপারটা জানলো।

বন্ধুমহলে ফিরে এসে অরিন্দম বললো, "তোমরা আমাকে বেরসিক বলো, "কিন্তু শুনে রেখে দাও, রেল স্টেশনে আমাদের সুখময় মুখার্জি রিসিভ করবে আমাদের ইরাবতীকে।"

"যেমন সব হাজবেন্ড রিসিভ করতে চায় তার ওয়াইফকে, সে যদি বাইরে গিয়ে থাকে।"

"ওসব মিথ্যে কথা বলে লজ্জা দিও না। বাঙালি হাজবেন্ডদের ওয়াইফ-প্রীতি কীরকম তা দুনিয়ার সবাই জানে।" মন্তব্য করল অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুনন্দা ব্যানার্জি।

ইরাবতী! তাহলে নামটা এবার পরিষ্কার জানা যাচ্ছে! নাম শুনে তো মনে হচ্ছে রীতিমত স্মার্ট কোনো বেপরোয়া বাঙালি মহিলা।

"অবশ্যই স্মার্ট। না হলে এই গেরস্ত শহরে কেমন করে বিয়ে না করেই একজন পুরুষের সঙ্গে সে সহবাস করছে।"

"আঃ সুপ্রতীক, কলেজে ছাত্রছাত্রীদের পড়াও, মুখের আলগা ভাবটা তোমার কমাও। কোনদিন ক্লাসে বিপদে পড়ে যাবে।" সাবধান করছে গৃহিণী ও সহকর্মী সুনন্দা।

"ভেরি স্যরি, সুনন্দা। আমি জানি দু'একটা বাংলা শব্দ আজকালকার মেয়েরা ভীষণ অপছন্দ করে। 'সহ' না বলে বসবাস বলতে হবে, কিংবা আরও নরমভাবে বলতে হবে ঘরসংসার—যদিও বিয়ে ছাড়াই খাট-বিছানা বালিশ নায়ক-নায়িকার সামনে সাজানো থাকবে!"

"ওরে হতভাগা সুপ্রতীক, তুই শব্দতত্ত্ব নিয়ে দিনরাত রিসার্চ কর, সুনীতি চাটুজ্যের দত্তকপুত্র হয়ে যাবি।" ফোড়ন দিল পুরনো এক সহপাঠী বন্ধু।

"আমি এ বিষয়ে রিসার্চ করলে সেসব বই কখনও ছাত্রছাত্রীদের হাতে যাবে না!" উত্তর দিল সুনন্দা।

"কেন?"

"শব্দতত্ত্ব এতই ীরস' বিষয় যে আজকালকার ছেলেমেয়েরা পড়তে উৎসাহ পায় না।"

সুপ্রতীকের মৃদু প্রতিবাদ : "একেবারে উল্টো, সুনন্দা। তুমি তো ভালভাবেই জানো। আমার লেখা শব্দতত্ত্বের বইগুলো শেষ পর্যন্ত এতই নানা রসে টইটুম্বুর হবে যে কলেজ হোস্টেলে মলাটমোড়া হয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে হাতে ঘুরবে—এমন কি খড়্গপুর, শিবপুর এবং কানপুর আই আই টি ক্যামপাস, যেসব জায়গায় নম্বরের জাহাজ না-হলে ঢোকাই যায় না, সেখানেও জনপ্রিয় হবে!"

শব্দতত্ত্বের সরস দিকটা সুপ্রতীক এবার কায়দা করে ব্যাখ্যা করলেন। "যেমন ধরো ছাত্রী কথাটা। প্রাচীন ভারতে এর একমাত্র অর্থ ছিল ছাত্রের স্ত্রী! এখন আমরা যাদের ছাত্রী বলি তারা হলো, 'ছাত্রা'! এখনকার ছেলেমেয়েরা ব্যাপারটা মোটেই জানে না।'

খুব খুশি হলো অরিন্দম এবং সুপ্রতীকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য শ্রোতারা। "তার মানে কলেজলাইফে সহপাঠিনীদের মনে মনে যেভাবে আমরা দেখতে চেয়েছি সেইটাই সত্য হয়ে উঠেছে 'ছাত্রী' শব্দটির মাধ্যমে!"

সুপ্রতীক বললেন, "আনন্দমূর্তি প্রভাতরঞ্জন সরকারের বাংলা ব্যাকরণ সংক্রান্ত লেখাগুলো ইদানীং খুঁটিয়ে পড়ে অনেক আইডিয়া পেয়ে গিয়েছি। যেমন ধরো দেশবন্ধু। কত আদর করে আমরা চিত্তরঞ্জন দাশকে ওই টাইটেল দিয়েছিলাম। তার থেকে তখন নামকরা খাবারের দোকান দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার হয়েছে। কিন্তু ভাই খুঁটিয়ে দেখলে, একটু অস্বস্তিতে পড়ে যাবে, কারণ যিনি শ্মশানের কাজকর্মে প্রধান তাঁকেই প্রাচীন ভারতে 'দেশবন্ধু' বলা হতো। সেই জন্যে কলকাতার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে দেশবন্ধু স্মৃতিসৌধ একাধিক অর্থে চমৎকার মানিয়ে যায়।"

কথাবার্তা এবং রসরসিকতা চলছে, কিন্তু সুখময়ের ব্যাপারে কেউ কেউ একটু অস্বস্তি বোধ করছে। অরিন্দম ভাবছে, ওর ব্যক্তিজীবনের সাম্প্রতিক খবরটা এইভাবে এখানে প্রচারিত না হলেই ভাল হতো।

সুখময় মুখার্জি সহপাঠী বন্ধুদের পুনর্মিলন উৎসবে অঢেল সময় নষ্ট করতে মোটেই উৎসাহী ছিল না। ম্যারেজ মন্দির থেকে অসময়ে নিঃশব্দে সরে পড়ার আগে সে একটা লিমকার খোঁজ করেছিল।

সুখময় আজকাল ক্যালরি এবং শরীর সম্পর্কে বেশ হুঁশিয়ার হয়ে উঠেছে। ক'বছর আগেও যে লোক মিষ্টির পূজারী ছিল, আধ ডজন পর্যন্ত বোঁদের লাড্ডু যে এক সিটিং-এ অনায়াসে উড়িয়ে দিয়েছে, সে বললো, "কোক বা আইসক্রিম সোডা দিও না ভাই, ভীষণ সুগার। বিজ্ঞাপনের চোটে তৃষ্ণা নিবারণ করতে গিয়ে শরীরে যে কত গ্রাম চিনি ঢুকে যায় তার কোনও হিসেব নেই। তার থেকে লিমকা অনেক ভাল, যদি সত্যিই স্লিম থাকবার বাসনা থাকে কারও প্রাণে।"

অরিন্দম মনে বেশ কষ্ট পেয়েছিল, কারণ এখনও দিনে তিন-চার বোতল কোক সে উপভোগ করে। "আঃ সুখময়! সারা দুনিয়ার সমত্থ লোকগুলো যদি শর্করাত্যাগী সন্ন্যাসী হতে চায় তা হলে কলকাতায় ময়রাদের এবং দুনিয়ায় সফ্‌ট ড্রিংক কোম্পানিদের কী হবে? ক্যানসারের ভয়ে সিগারেটের বারোটা তো বেজেছে, হুইস্কির বিজ্ঞাপন বন্ধ। বিজনেসগুলোব হবে কী?"

অরিন্দমের সব কথা শুনে থাকলেও সুখময় মুখার্জি নিজের সিদ্ধান্ত পাল্টায়নি। সে বলেছিল, "ওরে অরিন্দম, এই রকমই হয়! মহাপুরুষরা প্রথমে বলেছিলেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে মোক্ষসন্ধানী হও ; আর মানুষ শর্করা ও স্নেহজাত খাদ্য ত্যাগ করে নববৈরাগী হয়ে উঠবার জন্যে ছটফট করতে লাগল। যাতে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদসুখ এবং সান্নিধ্যসুখ তারা পুরোদমে প্রাণভরে দীর্ঘদিন উপভোগ করতে পারে।"

বিদায় নেবার আগে দূর থেকে সুপ্রতীক লক্ষ্য করেছে তার পুরনো সহপাঠী সুখময় মুখার্জিকে। একটা ঠাণ্ডা লিমকার এক-তৃতীয়াংশ আস্বাদন করে সুখময় মিলনমেলা থেকে অসময়ে চলে গেল। অরিন্দমকে সে সোজাসুজি বলেছে, "স্টেশনে ইরাবতী আমাকে না দেখতে পেলে ভীষণ চিন্তা করবে।"

"রাখো ওদের রাসলীলা!" অরিন্দমের কাছ থেকে রিপোর্ট নিতে নিতে

বলে উঠলেন সুপ্রতীক ব্যানার্জি। "কে যেন বলেছিল, ফল যত নিষিদ্ধ টান তত প্রবল!"

'ইরাবতীকে আপনারা বেশ ভালভাবেই চেনেন মনে হচ্ছে!" এবার সুপ্রতীককে আক্রমণ করলেন আর এক বন্ধুর স্ত্রী। মানস মজুমদারের এই সপ্রতিভ মানসীটির নাম সীমারেখা মজুমদার!

"কী সুন্দর এবং কী অসাধারণ নাম আপনার মিসেস মজুমদার।" প্রশ্ন এড়িয়ে প্রশস্তি জানালেন সুপ্রতীক ব্যানার্জি। 'ইন ফ্যাক্ট, আপনার নামটা এত সুন্দর যে ওই হতভাগা মানস, ও যত বড় বিজনেসম্যানই হোক না কেন, এই নামের স্ত্রী ডিজার্ভ করে না!"

স্ত্রীর প্রশস্তিতে খুব খুশি হলো মানস মজুমদার। সে বললো, "বাংলায় কম নম্বর পেতাম বলে তোরা ভেবেছিলি পুঁটুরানি অথবা খ্যান্তমণি দাসী এটসেটরা কোনও মোস্ট অর্ডিনারি নামের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে! শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে অনেকের কষ্টের কারণ হয়েছি। কী করব বলো, স্বয়ম্বর সভায় স্বয়ং সীমারেখা ভেবেচিন্তে আমাকেই সিলেক্ট করলো।"

সীমারেখা এবার জানালো, "খোদ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নাম দিয়েছিলেন। আমার মা নিজে পুনায় ওঁকে ডাকটিকিটওয়ালা খাম পাঠিয়ে প্রথমা কন্যার নাম ভিক্ষা করেছিলেন। শরদিন্দুবাবু চিঠিতে নাম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে টিকিটওয়ালা খামটা ফেরত পাঠিয়েছিলেন, সেটা আমার কাছে এখনও আছে।" সীমারেখা সত্যিই এই নামের ব্যাপারে গর্বিতা!

"ইরাবতী নামটাও কম সুন্দর নয়! খোঁজ নিয়ে দেখুন, হয়তো ওই নামের পিছনেও কোনও বিখ্যাত লেখকের অদৃশ্য কারিগরি রয়েছে,"

বললো সীমারেখা।

অরিন্দম মাটা এবার তার ভারী চেহারাটার সঙ্গে ম্যাচকরা ভারী গলায় বললো, "এই ভাবে আমার নিরীহ বন্ধুদের কঠিন প্রশ্নবানে জর্জরিত করবেন না, মাননীয়া ভদ্রমহোদয়াগণ। আমরা একই কলেজে পড়েছি, একই ক্লাশে নিত্য ঢুকেছি, একই করিডর ধবে যাতায়াত করেছি, অথচ সহপাঠিনীদের তেমন চিনি না বললে আপনারা যে তা কিছুতেই মেনে নেবেন না সেটুকু আন্দাজ করবার মতন সাধারণ বুদ্ধি আমাদের এখনও আছে, যদিও আমাদের বন্ধুদের যথেষ্ট মগজ ধোলাই হয়েছে প্রথমে জীবনসংগ্রামে এবং ারে ছাঁদনাতলায়।"

"ভাই মানস, ইরাবতীর ব্যাপারটা তুমি নিজেই একটু ব্যাখ্যা করো না। সুখময় নিশ্চয় হাওডা স্টেশন থেকে তার ইরাবতীকে নিয়ে এখানে আর ফিরে আসছে না।"

অরিন্দমের বিশেষ অনুরোধ ফেলতে পারলো না বন্ধুবর মানস মজুমদার। সে বললো, "কলেজের বাইরে অন্য বন্ধুদের কাছে আমরা তখন প্রায়ই ব্লাফ মেরেছি যে ইরাবতীকে আমরা নিবিড়ভাবে চিনি। তার সঙ্গে বহুবার আমাদের গল্পগুজব এবং কথাবার্তা হয়েছে।"

"এমনকি ইরাবতী নিয়মিত আমাদের ফোন রিসিভ করেছে" এমন মিথ্যাও রটিয়েছি। "কিন্তু আসলে ব্যাপারটা একচুলও এগোয়নি। ইরাবতী সেনের রং ফর্সা, গড়ন লম্বা, চাহনি চটুল, শরীর একটু স্নেহময়ী, কিন্তু আপনারা ভুল বুঝবেন না, ইরাবতী তন্বী না হলেও মোটেই বিপুলা ছিল না। আসলে, পুত্রবধূর এই ধরনের শরীরস্বাস্থ্যই বাঙালি শাশুড়িরা পছন্দ করেন—বিয়ের পরেই বউমার স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্যে শ্বশুরের একরাশ টাকা খরচের কোনো রিস্ক থাকে না!"

"রোগা হলেই যে মানুষ অসুস্থ হয় না, এ কথা তুমি ভালভাবেই জানো, মানস।" ফোঁস করে উঠেছিল তন্বী সীমারেখা। সে নিজের সুস্বাস্থ্যের পটভূমিটাই স্বামীকে একটু-আধটু মনে করিয়ে দিতে চায়।

"শরীরে একটু-আধটু শাঁস থাকলেই যে মানুষ হাইব্লাডপ্রেশারের

ভিকটিম হয় না, তাও তুমি জানো, সীমারেখা। তোমার হাজবেন্ডের সঙ্গে তো বেশ কয়েক বছর ঘর-সংসার করছো, কখনও হাই প্রেশারের কোনো ওষুধ কিনেছ?"

অরিন্দম এবার আলোচনায় যোগ দিল। "আসলে, রোগাও না, মোটাও না, একটা মা দুর্গা মার্কা মেয়েলী চেহারা সম্পর্কে তীব্র অনুরাগ ও আকর্ষণ পুরুষ বাঙালির অবচেতন মনে চিরকাল থেকে গিয়েছে। প্রাচীন ভারতেও দেখা যাচ্ছে গুরুস্তনী এবং গুরুনিতম্বিনীদের প্রতি শিল্পী, ভাস্কর এবং কবিদের পক্ষপাত একটু বেশি। এই ধরনের চেহারা নিয়েই এক রণচণ্ডী রমণী সমরাঙ্গণে অসুরনিধনে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। তিনিই পুরুষ বাঙালিদের চিরকালের হিরোইন হয়ে আছেন। সুন্দরী এবং পরিশীলিতা হলেও এই চণ্ডী যে কী ধরনের খিস্তিতে অভ্যস্ত ছিলেন তা জানতে হলে শ্রীশ্রীচণ্ডী মন দিয়ে পড়ে দেখো, ভেবো না শুধু ধর্মভাবে গদগদ হবার জন্যে লোকে সেকালে নিত্য চণ্ডীপাঠ করত।"

· সীমারেখা বললো, "আর শ্রীশ্রীচণ্ডী ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই! বুঝেছি ব্যাপারটা—কলেজ লাইফে সহপাঠিনী ইরাবতী তোমাদের কোনোরকম পাত্তা দেয়নি, অথচ সারাক্ষণ 'স্পেলবাউন্ড' অর্থাৎ মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। ইরাবতী সেন সম্ভবত নিজের পড়াশোনা নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত থেকেছে, যদিও তোমাদের অনেকেরই প্রাণের ইচ্ছে ছিল ওসবে অত মাথা না ঘামিয়ে ইরাবতী সেন তোমাদের দিকে একটু কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করুক, ইনিয়েবিনিয়ে এবং অকারণে দুটো কথা বলুক ক্লাসের পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে।"

"সীমারেখা, আমাদের প্রাক্তন সহপাঠিনী সম্পর্কে যদিও তোমার বিবৃতি একটু নিষ্ঠুর। তবু..." ব্যাপারটা যে অনেকটা ওইরকম তা প্রকাশ্যে স্বীকার করলো মানস মজুমদার।

সেই সঙ্গে আরও কিছু খবর সংগৃহীত এবং প্রচারিত হলো ইরাবতী সেনের অতীত সম্বন্ধে। প্রকৃতপক্ষে ইরাবতী সেন কিছু আহামরি সুন্দরী ছিল না, যদিও ক্লাশে সব ছাত্রের নজর টানাটা কম কৃতিত্ব নয়। ইরাবতী কোনোমতেই মিশুকে ছিল না, কোনও ব্যাপারে সে বিন্দুমাত্র বাড়তি

ঔৎসুক্য দেখাতো না। যেন নিজেকে সামলে রাখতেই তার সমস্ত এনার্জি খরচ হয়ে যেতো।

ছাত্রী অবস্থায় ইরাবতীকে কিন্তু কোনও অভিজাত পরিবারের আদরিণী কন্যা বলে মনে হতো না। কালীঘাটের সদানন্দ রোড না কোথায় সে থাকতো। ওই সেকেলে বস্তাপচা পাড়ার রকমসকম দেখেই নাকি লেখক বিমল মিত্রমশাই কড়ি দিয়ে কিনলাম-এর নায়কের বাসস্থান নির্বাচন করেছিলেন ওই রাস্তায়।

কালীঘাট পাড়ায় ভাড়াবাড়ি,'মানে একেবারে উটকো কলকাতায় হাজির হওয়া নয়, কারণ ওই পুরনো পাড়ায় যারা মাথা গোঁজবার জায়গা পেয়ে গিয়েছে তাদের কিছুটা স্থিতি হয়েছে। এই অঞ্চল থেকে ভাড়াটেরা এখন আর কেউ নড়ে না, নিতান্ত কোনও বিপর্যয় না ঘটলে। আসলে কলকাতার অনেক পুরনো পাড়ার বাড়িগুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে একেবারে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তবু পুরনো ভাড়াটেরা ভুল করেও ভাড়া বাড়াবে না, বাড়িও ছাড়বে না।

এবার অরিন্দম মাটা আলোচনায় একটু ইন্ধন জোগাল। সে বললো, "তা হলে উপস্থিত ভদ্রমহিলাবৃন্দ, বুঝতেই পারছেন, আমাদের সহপাঠিনী ইরাবতী সেন সুতনুকা এবং সুশ্রী হলেও আধুনিক অর্থে হৃদয়হননকারিণী ছিলেন না। একমাত্র তাঁর ওই উচ্চতাটুকু ছাড়া। পারিবারিক দম্ভেরও তেমন কিছু ছিল না ইরাবতীর। আর পড়াশোনা! খাতাপত্তর নিয়ে ক্লাসরুমে সে সারাক্ষণ ব্যস্ততা দেখিয়েছে, কিন্তু সেই তুলনায় ভাল রেজাল্ট কখনোই হয়নি। পরীক্ষায় সেকেণ্ড ডিভিশন মশাই! স্রেফ সেকেন্ড ডিভিশন!"

সুপ্রতীক বললেন, "আমাদের সুখময় মুখার্জি উপস্থিত থাকলে অবশ্যই তোমার কথায় আপত্তি জানাতো। সেই কবে সুখময় বলেছিল, সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ বলে কাউকে অবজ্ঞায় উড়িয়ে দিও না ব্রাদার। জানো কি, স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ কোন ডিভিশনে এফ এ (পরের যুগের আই এ) পাশ করেছিলেন? নট হায়ার দ্যান সেকেন্ড ডিভিশন! এমনকি নরেন্দ্রনাথ দত্তর বি এ পাশও দ্বিতীয় শ্রেণীতে! ইদানীং রিসার্চে এই খবর বেরিয়েছে।"

ইরাবতীকে নিয়ে পুরনো বন্ধু মহলে আদিতেই যদি এসব কথা উঠে থাকে তা হলে বুঝতে হবে, সুখময়ের সঙ্গে ইরাবতীর যোগাযোগটা নিতান্ত আজকের নয়! হয়তো ছাত্রাবস্থায় সহপাঠীরা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি। আন্দাজ করতে পারেনি যে একদিন ইরাবতী প্রসঙ্গে স্বয়ং সুখময় এই ভাবে বন্ধুদের তপ্ত আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে। কে আর ভাবতে পেরেছে যে বিয়ে-থার হাঙ্গামায় না গিয়ে সুখময় ও ইরাবতী এমন দুঃসাহসী হয়ে উঠবে এবং দু'জনে এই কলকাতারই কোথাও একই সঙ্গে বসবাস করবে, যার লৌকিক নাম লিভ-টুগেদার অথবা সহবাস।

উৎসাহী উদ্যোক্তা অরিন্দম মাটা এবার হাত ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। জনায়ের অর্ডারি মিঠাই ম্যারেজ মন্দিরে এসে পড়লো বটে। যারা মিষ্টি আনতে গিয়েছিল তারা মাঝপথ থেকে সেলুলার ফোনে অরিন্দমকে প্রয়োজনীয় বার্তা পাঠিয়েছে। আর মাত্র তিনটে রোড ক্রশিং-এর যানজট কাটিয়ে অরিন্দমের পাঠানো অ্যামবাসাডর গাড়ি উৎসবস্থলে হাজির হয়ে যাবে—সাত থেকে দশ মিনিটের মধ্যে।

জনাই থেকে মিষ্টি আনা মানে কেউ যেন না ভাবেন কলকাতার মোদকদের অপমান করানো হলো। কলকাতার মিঠাই সাপোর্টারদের মনে রাখা উচিত যে বিগত একশ বছর ধরে কলকাতার মেঠাই, বিশেষ করে শহরের ফিকে সন্দেশ মফস্বলের বিয়েবাড়িতে একচেটিয়া দাপট দেখিয়ে চলেছে।

"আসলে, বাসনা ও রসনার ব্যাপারে সব মানুষই মাঝে মাঝে নূতনত্বের এবং অভিনবত্বের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, বুঝলেন মিসেস ব্যানার্জি। তাই জনাই থেকে খাবার এনে একটু স্বাদ পাল্টানো," বললো অরিন্দম।

"সে তো হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি অরিন্দমবাবু! তাই তো বিয়ে

ব্যাপারটা যাতে একেবারে সেকেলে হয়ে যায় তার জন্যও আপনার বন্ধুরা উঠে-পড়ে লেগেছেন।"

ব্যাপারটা গায়ে মাখলো না অরিন্দম। এই যে বারবার ঘড়ি দেখা এর একটা কারণ, কয়েকজন বন্ধু এবং বান্ধবী দেরি হলেও একটু পরে আসতে পারে এমন মৌখিক ইঙ্গিত ছিল।

"মিসেস ব্যানার্জি, আপনি শুধু বান্ধবী ইরাবতীর ব্যাপারে আমাদের ওপর খড়্গহস্তা হচ্ছেন। আমাদের আর এক সহপাঠিনী ছাত্রা শ্রীমতী সহসা রায়চৌধুরীর ব্যাপারেও একটু মন দেবেন।"

"অরিন্দমবাবু, যত বিদঘুটে নাম আপনি মনে মনে বানিয়ে নিজেদের বান্ধবী বলে চালু করে দেন। কোন কোন নামের মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে আপনারা লেখাপড়া করেছেন তা তো এখন সহজে যাচাই করা সম্ভব নয়!"

"মোটেই বানানো নয়, মিসেস ব্যানার্জি। আমাদের এই বান্ধবীর নাম দিয়েছিলেন আর এক জাঁদরেল সাহিত্যিক, যাঁর রামকৃষ্ণমার্কা বইগুলো পড়ে অভিভূত হয়ে সুখময় মুখার্জির নেতৃত্বে আমরা একবার সদলবলে দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর পদধূলি নিতে গিয়েছিলাম। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। সাউথ ক্যালকাটায় ওঁর বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিল আমাদের এই বান্ধবী সহসা রায়চৌধুরী। তখনই শুনেছিলাম, দুই পরিবারের মধ্যে অনেকদিন চেনাশোনা। সহসার প্রথমে নাম ছিল সবিতা, তারপর স্কুলে হঠাৎ একদিন কোন এক সংস্কৃতজ্ঞ মাস্টারমশাই ওকে প্রকাশ্যে লজ্জা দিলেন, সবিতা কোনও ভারতীয় রমণীর নাম হতে পারে না, কারণ ওটা পুংলিঙ্গ, যার অর্থ স্বয়ং সূর্যদেব। ওই পুং দেবতার মধ্যে মহিলা হবার কোনো আকাঙ্ক্ষা কখনও প্রকাশ পায়নি।"

"তারপর সে এক কাণ্ড। আমাদের সবিতার নাকি বাড়ি ফিরে বেজায় কান্নাকাটি। সেই সময় লেখক অচিন্ত্যকুমার কী কারণে সবিতার বাবার সঙ্গে গল্প করতে ওদের বাড়িতে এসেছিলেন। সব শুনে বললেন, অচিন্ত্যকুমার মাস্টার বোধহয় ভুল বলেননি। তবে চিন্তার কিছু কারণ নেই, এখনই নামের

প্লাস্টিক সার্জারি করে দিচ্ছি। অচিন্ত্যকুমারের এক কথায় উনিশ বছরের সবিতা হয়ে গেল সহসা রায়চৌধুরী। কী মিষ্টি নাম, এমন নাম যার ডুপ্লিকেট খুঁজে পাওয়া কঠিন।"

জানা গেল, নামটি অসাধারণ, কিন্তু সহসা মেয়েটি নিতান্তই সাধারণ। একেবারে টিপিক্যাল অ্যাভারেজ বেঙ্গলি গার্ল বলতে যা বোঝায় তাই এই সহসা রায়চৌধুরী।

উচ্চতায় পাঁচ ফুট, রং চাপা, শরীরে তেমন জেল্লা নেই, কেবল একটু কমবয়সের লাবণ্য নজরে পড়ে। সহসারা সেই রকম মেয়ে যারা দল বেঁধে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফেরে, অথচ কেউ তেমন তাকিয়ে দেখে না। সহসার মুখে একটু যেন তেল চকচকে ভাব থাকতো। এই ধরনের মেয়েদের ফটো বাবা-মাকে ভাবায়, তাঁরা চুপিচুপি ইষ্টদেবতাকে জিজ্ঞেস করেন, ঠাকুর এর স্বভাব তো খুবই ভাল, কিন্তু ভাগ্য কেমন? কিছুদিন পরেই যারা এ বাড়িতে দল বেঁধে পাত্রী দেখতে আসবে তারা পছন্দ করবে তো?

সেই সহসা আজ এই পুনর্মিলনে উপস্থিত হতে পারে এমন প্রত্যাশা উদ্যোক্তাদের অবশ্যই আছে।

দু'বছর আগে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের প্রথম পুনর্মিলনে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে অরিন্দম সহসাকে বলেছিল, "বেশি দেরি কোরো না।" তখন মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেলেছিল সহসা।

কতদিন পরে কলেজের পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আবার দেখা। সহসা হেসে উত্তর দিয়েছিল, "আমার নাম সহসা, কিন্তু সবাই জানে আসলে আমি লেট লতিফ। কেন জানি না সব কিছু ঘটতে আমার জীবনে ভীষণ দেরি হয়ে যায়, অরিন্দমবাবু।"

অরিন্দম সেবার খুব হেসেছিল, কিন্তু কোনো উত্তর দেয়নি। অরিন্দম জানে, সহসা শব্দের সঙ্গে আগাম বা দেরির কোনোরকম সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে কেবল আকস্মিকতার। কারও কারও জীবনে মাঝে মাঝে হঠাৎ এমন কিছু হয়ে যায়, যা ছিল সকলের হিসেবের বাইরে, প্রত্যাশার বাইরে, সম্ভবত প্রস্তুতিরও বাইরে।

সহসা

ইরাবতীর খবরটা নাকি সহসার পরিচিত মহল থেকেই এবার ছড়িয়েছে।

অরিন্দমকে এক বন্ধু বলেছিল, "তুমি খবর করতে পারো সুখময় মুখার্জির। হয়তো এক ঢিলে দুটো পাখি মারা হয়ে যাবে।"

অরিন্দম ঘোরাঘুরিতে ভয় পায় না। এক একজন বন্ধুকে এক এক জায়গায় পেলেই সে সন্তুষ্ট। অরিন্দম সোজাসুজি বলেছিল, "ভাই, ঢিল ছুঁড়ে পাখি মারার অভ্যাস সবার থাকে না। এক জায়গায় গিয়ে একটা পাখি হাতে পেলেই আমি সন্তুষ্ট!"

বন্ধু বলেছে, "শোনো অরিন্দম, ইরাবতীর খোঁজে বেরিয়ে তুমি সুখময় মুখার্জিকেও পেয়ে যাবে!"

"অরিন্দম, তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, এদের দু'জনকে একসঙ্গে আবিষ্কার করাকে তোমার 'প্রত্যাশা' হিসেবে বর্ণনা করা ঠিক হবে না, সঠিক বাংলা শব্দটা হলো 'আশঙ্কা'," মন্তব্য করেছিল সেই পরিচিত সূত্র।

এই রকম একটা আশঙ্কা একদিন সহসাকে নিয়েও বন্ধুদের মধ্যে ছিল। যেসব সহপাঠীকে আমাদের এই সহসা ইচ্ছে করলে মায়াজালে আবদ্ধ করতে পারত তার মধ্যে অবশ্যই সুখময় মুখার্জি ছিল। কিন্তু এতদিন পরে এসব কথা এদের মুখের ওপর বলে কী লাভ?

সহসা নতুন অফিসে একটা ছোট্ট কিউবিক্‌লে একটা পার্সোনাল কমপিউটার, একটা লেজার প্রিন্টার, একটা টেলিফ্যাক্স এবং গোটা কয়েক টেলিফোন পরিবৃতা হয়ে শান্তভাবে বসে ছিল। ওকে খুঁজে বার করতে এবার কিন্তু রীতিমত পরিশ্রম হয়েছে অরিন্দমের।

এই মুহূর্তে সুখময়ের প্রসঙ্গে সোজাসুজি চলে যাওয়াটাই অরিন্দমের পক্ষে সুবিধাজনক মনে হয়েছিল। "তুমি বলছো, সুখময়কে বিয়ে করেছে

আমাদের ইরাবতী সেন!”

সহসা বেশ তীক্ষ্ণ উত্তর দিতে পারে। আগে এমন ছিল না, ওকে তখন খুব লাজুক মনে হতো। এবার সে মুখ খোলেনি। সে কেবল জানিয়ে দিয়েছে, ইরাবতী ও সুখময়ের ঠিকানা এক। তারপর ওদের দৈহিক ও মানসিক দূরত্ব দূর করে গাঁটছড়া বাঁধবার সময় কোনো দেবতা কোনোভাবে মধ্যস্থতা করেছিলেন কিনা অথবা নব দম্পতী হিসেবে কোনো দলিলে ওরা দু'জনে স্বেচ্ছায় সই করেছে কি না তা জানার কথা নয় সহসার মতন একজন সাধারণ মেয়ের।

নতুন কর্মক্ষেত্রে সহসা এখন নিজের নতুন চাকরি নিয়েই ব্যস্ত। রহস্যটা অবশ্য অরিন্দমের কাছে তেমন আর অস্পষ্ট থাকেনি। তার বুঝতে বাকি থাকছে না, ইরাবতী-সুখময়ের যুগলজীবনের প্রারম্ভে কোনো মঙ্গল শঙ্খ বাজেনি, বরযাত্রীরা উপস্থিত থাকেনি, এমনকি ম্যারেজ রেজিস্ট্রারও তাঁর খাতা খোলেননি। কিন্তু পুরনো বন্ধুদের কাছে তাতে কী এসে যায়?

অরিন্দম বলতে গিয়েছিল, আকাশের চাঁদ, তারা ইত্যাদি সাক্ষ্য রেখেও অনেক বিবাহ এই পৃথিবীতে ঝটপট সম্পন্ন হয়েছে। সেই সব বিয়ের সবগুলোই কিন্তু মন্ত্রশক্তির অভাবে পরে ভেঙে যায়নি। কিন্তু এই বিষয়ে বেশি দূর এগোনো সম্ভব হয়নি অরিন্দমের, কারণ সে রূঢ় ইঙ্গিত পেয়েছে, বিয়ের ব্যাপারটা আদৌ থাকলে তবে তো সাক্ষী এবং প্রমাণ!

“সহসাকে কেমন দেখলি রে?” পুনর্মিলনের আসরেই কৌতূহলী মানস মজুমদার জিজ্ঞেস করে বসলো বন্ধু অরিন্দম মাইতিকে।

সীমারেখা সঙ্গে সঙ্গে তাকে আক্রমণ করে বসলো, “কলেজে খুব মনে দাগা দিয়েছিল বুঝি?”

“দাগা দেবার মতন সুন্দরী মেয়ে নয়, মিসেস মজুমদার। নিতান্তই সেই সাধারণ মেয়ে, যাকে ইচ্ছে অনুযায়ী ম্যানেজ করতে সক্ষম না হয়ে স্বয়ং রবিঠাকুর সেই দায়টা কায়দা করে নভেলিস্ট শরৎ চাটুজ্যের ঘাড়ে চাপিয়ে

দেবার প্রকাশ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।”

কিন্তু পুরনো পুরুষবন্ধুদের সবাইকে স্বীকার করতে হচ্ছে, সৌন্দর্য তেমন না থাকলেও সহসার মধ্যে সাধনা ছিল। সে ভাল বাংলা জানত, তার ইংরিজি আরও সুন্দর, সহসার হাতের লেখা মুক্তোর মতন, নির্ভুল, সহজ এবং সাবলীল। সব মিলিয়ে সহসা ছিল অনেকের ওপরে। তবে সুপার ব্রিলিয়ান্ট নয়, বড় জোর সাধারণের মধ্যে একটু অসাধারণ। ওর শরীরও যেন মেধার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা চালিয়েছিল, এক কথায়—কালো রঙের ভাল মেয়ে।

অরিন্দম বললো, “মিষ্টি শব্দটা প্রয়োগ করতাম, মিসেস মজুমদার, কিন্তু আজকাল স্বাদযুক্ত কোনো তুলনা করলে বাঙালি মহিলারা ভীষণ রেগে ওঠেন, তাই আমাদের মেয়েরা আর মিষ্টি হয় না, নোনতা হয় না, এমনকি ধানি লঙ্কা বলতে সাধারণত কী ধরনের মেয়েদের বোঝাতো তা একালের লেখকরাও বোঝেন না, পাঠক-পাঠিকারা তো কোন ছার! সাহসিনী মহিলারা মেজাজ গরম রেখে সারাক্ষণ মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে মেয়েরা খাবার জিনিস নয় যে তাদের মিষ্টি হতে হবে।”

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে সহসা একদিন জাঁদরেল কোনো অধ্যাপিকা হবেন, লেডি ব্রাবোর্ন অথবা বেথুনে অথবা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তার আধিপত্য ছড়িয়ে থাকবে এ রকম আশা অবশ্য কেউ কেউ করত। কিন্তু শেষপর্যন্ত সহসার জীবনে সেসব কিছু হয়নি।

কলেজ থেকে বি এ অনার্স পরীক্ষা দিয়েই সহসা রায়চৌধুরী বিনা নোটিশে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

সেই সময়ে স্বয়ং মানস মজুমদার একবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলে দুঃখ করেছিল, “বাঙালি মেয়েদের এইটাই সবচেয়ে খারাপ সময়, অরিন্দম! বি এ পরীক্ষা দেবার পর ফুটফুটে মেয়েগুলো টপাটপ গুঁড়ো হয়ে যায় বিবাহনামক ডোমেস্টিক গ্রাইন্ডারের ধাক্কায়। অকালবিবাহ অনেকটা শিলাবৃষ্টির মতন--সবুজ গাছের কচিকচি আমগুলোকে অকারণে চিরদিনের জন্য ধ্বংস করে দেয়!”

"ব্যাপারটা তা হলে কী দাঁড়ালো?" এতদিন পরে কলেজের পুরনো বন্ধুরা যেন জেরার মুখে জেরবার হতে চলেছে। তাদের প্রখর বুদ্ধিমতী পত্নীদের চোখেমুখে এখনও কৌতূহল।

ব্যাপারটা খুবই সহজ। কলেজের ক্লাসে যত মেয়ে ছিল তাদের মধ্যে সহসা অবশ্যই কিছুটা এগিয়ে ছিল, অনেক ছাত্রও পড়াশোনাতেও ওর তুলনায় ক্লাসে বেশ পিছিয়ে ছিল। বিদ্যাস্থানের প্রতিযোগিতায় আজকাল অবশ্য মেয়েদের কাছে হেরে যাওয়াটা বাঙালি ছেলেদের স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

এই প্রসঙ্গটা অনেক বছর আগে ওদের কলেজ ক্যান্টিনে উঠেছিল। চা খেতে খেতে, ছাত্রবন্ধুদের প্রাথমিক বক্তব্য শুনে সহসা একটু হেসেছিল। ইরাবতীর মুখের ভাবে অবশ্য সেদিন কোনো পরবর্তনই লক্ষ্য করা যায়নি। চিরকাল ওই স্বভাব ইরাবতীর—দূরে থাকা, মন দিয়েও ওকে স্পর্শ করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিজের ভাবে নিজেই যেন ইরাবতী বিভোর হয়ে থাকতো। জলের মধ্যেই সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু শরীর বা মন জলে ভিজবার কোনো লক্ষণ থাকতো না ইরাবতীর।

ওদের আরও একজন সহপাঠিনী ছিল—মধুমন্তী মিত্র। এই মধুমন্তী একটু বেশি ফরওয়ার্ড ছিল। সে বলেছিল, "নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি থেকে একনাগাড়ে পড়াশোনা করে করে বাঙালি পুরুষরা এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এখন তাদের আর পাঠে রুচি নেই—মেয়েদের সামনে এখন নতুন সুযোগ, তাই তারা হাতে পাওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বিশেষ ব্যাকুল।"

তারপরে কোনো একসময় অরিন্দম মাইতি একটা চমৎকার কথা শুনেছিল। "মেয়েরা যতই পড়াশোনা করুক, যতই তারা ব্রিলিয়ান্ট হোক, শেষপর্যন্ত মলাটই এদেশের মেয়েদের ললাট!"

মলাট মানে যে মেয়েদের মুখশ্রী এবং শরীর তা বুঝতে ছেলে এবং মেয়ে বন্ধুদের কোনো অসুবিধে হয়নি।

সহসা রায়চৌধুরী নিজেও এই সত্য হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল। সুন্দর মুখ, সুন্দর শরীর এবং সুন্দর পারিবারিক ঐতিহ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ না করলে এক

জীবনের সাধানায় বাঙালি মেয়েরা খুব বেশি দূর এগোতে পারবে না, তা সে যতই প্রতিভাময়ী হোক।

বাংলা উপন্যাসে কোন কথা সাহিত্যিক যেন একবার খোলাখুলি লিখেছিলেন, এদেশে মেয়েদের প্রতিভার প্রতিফলন কেবল গায়ের রঙে এবং শরীরের গঠনে। বিয়ের হাটে ঐ দুটো বিশেষত্বই শেষ পর্যন্ত বিকোয়, আর কোনো গুণই কারও নজরে পড়ে না।

সহসা রায়চৌধুরীর কাকা ও মা এক সময়ে পাত্র সন্ধানে দ্য স্টেটসম্যান ও আনন্দবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে একের পর এক উত্তর ছেড়েছিলেন। পাত্রীর ব্যক্তিগত বিবরণে তাঁরা উজ্জ্বল শ্যাম কথাটি উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছেন, যদিও কেউ কেউ উপদেশ দিয়েছিলেন রঙের কথা গোড়াতেই তুলো না। অন্য সব অনুসন্ধানের হাঙ্গামা চুকে যাক, কোষ্ঠীর গুণে তখন হয়তো ওই শ্যামলিমা কেউ কেউ মেনে নেবে এবং রঙ নিয়ে অযথা হাঙ্গামা করতে চাইবেন না।

সহসার বাবা নেই। কাকা আদর্শবাদী বিজ্ঞানী, এক সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় ডাক্তার কার্তিক বোসের ল্যাবরেটারিতে অল্প মাইনেতে কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন। কট্টর স্বদেশীদের কাছে অতিরঞ্জনও এক ধরনের মিথ্যাচার। যে মেয়ে শ্যামা তাকে শুভ্রা বলে উপস্থাপিত করার গোপন ষড়যন্ত্রে তিনি কেন অংশীদার হবেন?

সহসা জানে, পাত্রসন্ধানে ডজনে ডজনে চিঠি বাড়ি থেকে নিয়মিত ছাড়া হয়েছে, কিন্তু ডাকপিয়নকে কর্মক্ষম রাখা ছাড়া আর কোনো ফল হয়নি।

সহসা

অথচ সুন্দরী ইরাবতী, কুমারিকা এবং শ্রেয়সী এরা কুমারী জীবনে কেমন নিশ্চিন্তে থাকতো ফর্সা শরীরের সুরক্ষা এবং পৃষ্ঠপোষকতায়। ইরাবতী তো বন্ধুদের বলেইছিল, সম্ভাব্য স্বামী সরকারী চাকুরে হলে তাকে হতে হবে মিনিমাম এই এ এস।

"কেন আই-পি-এস কী দোষ করল?" বান্ধবীদের একজন রসিকতা করে জানতে চেয়েছিল।

"অনেক দোষ ভাই, হাওড়া কিংবা হুগলী জেলায় খোঁজ করে দেখবি ডি এম-কে জেলার পুলিশ সুপার স্যর বলছে। আমি যেখানে থাকব সেখানে আমার বর কাউকে স্যর বলতে পারবে না, আমাকে ছাড়া।"

"তুই তো স্যর না, তুই তো হার ম্যাজেস্টি!"

কুমারিকা মন্তব্য করেছিল, "তা হলে, পাবলিক সেকটারে কোনো হাই অফিসারের সঙ্গে তোর বা আমার বিয়ে হচ্ছে না! শুনেছি, ওখানেও ভীষণ স্যর স্যর আছে।"

"হবে না! আমার মামা বলেছেন, বিলিতি কোম্পানিতে কেউ কাউকে স্যর বলে না। এমনকি নামের টাইটেল ধরেও ডাকে না। ওখানে উঁচু লেভেলে একটা ডাক নাম নিজের অজান্তে হঠাৎ গজিয়ে ওঠে। যেমন মিস্টার প্রেমতোষ ইন্দ্র এক অফিসে হয়ে গিয়েছেন পিটিআই! আর আমার মামা কল্যাণ মজুমদার হয়ে গিয়েছেন ক্যালি। অফিসাররা পরস্পরের নাম ধরে ডাকলে আমার ভাই কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু কথায় কথায় লোককে স্যর বলা ভীষণ হিউমিলিয়েটিং! সরকারী অফিসারদের তো ওটা মুদ্রাদোষের মতন হয়ে যায়! এরা কিছুতেই ভুলতে পারে না যে দুশো বছরের পরাধীনতার পরেও বেশ কয়েকটা দশক কেটে গিয়েছে।"

সহসা কিন্তু এই ধরনের আলোচনায় কখনও যোগ দেবার সাহস

দেখায়নি। কোনোরকম মন্তব্যও সে করেনি। সহসা সহজেই বুঝেছিল, ইরাবতী পড়াশোনায় যাই হোক, তার সামনে সচ্ছল সুখী জীবনে প্রবেশ করবার বেশ কিছু চয়েস থাকবে। মানুষের জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে এই চয়েসটাই হলো আসল স্বাধীনতা। যার সামনে পছন্দ করার কিছু নেই, একটা মাত্র পথই একমেবাদ্বিতীয়ম হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে তো নির্লজ্জ ভাবে সময়ের দাসীবৃত্তি করবে। নিজের পছন্দ অনুযায়ী কিছু তুলে নেওয়ার মধ্যে কি অপার আনন্দ আছে তা এদেশের বেশীরভাগ মেয়ে কোনোদিন জানতেই পারলো না। হয়তো সামনের শতাব্দীতে এই সৌভাগ্য কিছু মেয়ের হবে।

নারীস্বাধীনতা নিয়ে সময়ে-অসময়ে বিরক্ত, বিচলিত অথবা উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই। অরিন্দম মাইতি বিশ্বাস করে, চয়েসের স্বাধীনতা খুব শীঘ্র নিঃশব্দে উপস্থিত হয়ে যাবে সমাজের কয়েকটা স্তরে।

অরিন্দম তো বলেই বসে আছে সুপ্রতীক ব্যানার্জিকে, "আর একটু অপেক্ষা করো ব্রাদার! তোমার আমার মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে উঠুক, তখন ব্যাপারটা একেবারে উল্টে যাবে—সমাজের সমস্ত চিন্তা তখন হবে পুরুষস্বাধীনতা নিয়ে। বাংলায় সব সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি মেয়েদের হাতে চলে যেতে আর মাত্র বিশ বছর লাগবে। তুমি লিখে রাখো, সময় হলে মিলিয়ে নিও পুরুষদের অবস্থা তখন শোচনীয় হবে।"

"তা হলে তখন তো সুনন্দা ব্যানার্জিদের জীবনে কোনো সমস্যাই থাকছে না," মন্তব্য করলেন সুপ্রতীক।

অরিন্দম শান্তভাবে বললো, "তবে ব্রাদার সমস্যাই তো জীবন, সমস্যার সমাধান সন্ধানই তো জীবনসংগ্রাম। বঙ্গললনাদের তখন অবশ্য অন্য বিপদ দেখা দেবে! বিবাহের জন্য তখন ভাল পাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। যাকে সত্যিই বিয়ে করা যায় এমন পাত্র হয়তো বেশ বিরল হয়ে উঠবে।"

"তুমি কি যা তা বলছো অরিন্দম!" সুনন্দা ব্যানার্জি মুখ ঝামটা দিল।

"যা-তা নয়, সুনন্দা। ইতিমধ্যেই মেয়েরা এবং মেয়ের মায়েরা মনে মনে এমন স্বামী বা জামাই কামনা করছে যে দৈহিক উচ্চতায়, পুঁথিগত বিদ্যায়

এবং আর্থিক উপার্জনে মেয়ের থেকে বেশ কিছুটা বড় হবে। শুধু বয়সের সিনিয়রিটি নয়, সব বিষয়ে এই স্বামীর সিনিয়রিটি প্রত্যাশা কিন্তু বাঙালি মেয়েদের বেশিদিন ধোপে টিকবে না। এদেশের অগ্রগামিনী মেয়েদের এবার সহজে মেনে নিতে হবে, স্বামী সব বিষয়েই তার থেকে খাটো হবেন, কিন্তু তার জন্যে বিবাহিত জীবনে কোনো অতৃপ্তি বা অপূর্ণতা আসবে না। মেয়েরা যে শেষ পর্যন্ত পুরুষদের থেকে অনেক এগিয়ে গেল এটাই হবে তার স্বীকৃতি এবং প্রমাণ।"

সুনন্দা এবার তার স্বামীদেবতার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, "রক্ষে করো বাবা, আমার মেয়ের ওই রকম একটা নিরেট বর জুটবে তা আমি ভাবতে পারি না। আমি চাইবো আমার বরের মতন জামাই—এম এ কিংবা এম এসসিতে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট, সব ব্যাপারে আমার মেয়ের থেকে একপা এগিয়ে।"

অরিন্দম ততক্ষণে হলঘরের এক কোণে সরে গিয়ে অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করছে। সহসা যে আজকের পুনর্মিলনে আসছে না তা আন্দাজ করা যাচ্ছে। আর কোনো বন্ধু বা বান্ধবীর জন্য বোধহয় অপেক্ষা করার মানে হয় না। গরম খাবার এবার ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করবে। সামনের বছর অবশ্য কাউকে ছাড়বে না অরিন্দম। জোর করে সহসা, ইরাবতী, সুখময় সবাইকে এই পুনর্মিলনে টেনে আনবে। বছরে একটা দিন সবাই যদি মিলিত হয়ে হৈ চৈ না করলো তাহলে পুনর্মিলনের কোনো অর্থ হয় না।

সহসা

নদীর পশ্চিম পারে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের ভিড় ঠেলে একটু দ্রুতবেগে এই মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে আমাদের গল্পের প্রধান চরিত্র সুখময় মুখার্জি।

একটু আগে ম্যারেজমন্দিরে সে বিবাহবহির্ভূত লিভ টুগেদারের জন্যে বন্ধুমহলে কিছুটা অপদস্থ হয়েছে। সবাই তাকে নিয়ে ফিস ফিস করেছে। আড়ালে যথেষ্ট সমালোচনাও যে হয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। সুখময়কে নিশ্চয় চরিত্রহীন অথবা লম্পট ভেবেছে, কিন্তু বন্ধু বা বান্ধবী মুখ ফুটে জিগ্যেস করেনি, "ব্যাপার কী তোমার সুখময়? ইরাবতী কি সত্যিই তোমাব সঙ্গে একই ফ্ল্যাটে থাকে?"

পিতৃকুলের কোনজন যে এই সুখসর্বস্ব নামটা দিয়েছিলেন তা সুখময়ের ঠিক জানা নেই। হয়তো গর্ভধারিণী জননী নিজেই এমন নাম চেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যাকে পৃথিবীতে এনেছেন সে আসলে সুখময় নয়, সে দ্বিধাময়। এদেশে নবজাতকের নামকরণে কোনো সময়ে সত্যেব বর্ণনা বা স্বীকৃতি থাকে না। আসলে, জনকজননীর যা প্রত্যাশা তাই ফুটে ওঠে সন্তানের নামের মধ্যে। যা হয়েছে তার থেকে যা হলে আনন্দ হতো তাই চিরদিনের জন্যে লেখা হয়ে যায় পিতৃদত্ত নামের মধ্যে।

পড়াশোনা ছাড়াও ছাত্রজীবন থেকে সুখময় নিয়মিত কিছু লেখালেখি করে এসেছে। সে অবশ্যই জানে সুখসর্বস্ব জীবনের অধিকারী সে কখনই হবে না। তার জীবনের পদে পদে কেবল দ্বিধা। দ্বিধা থাকলে মানুষ কখনও দুঃসাহসের সঙ্গে সামনের পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারে না। সারাক্ষণ কেবল পিছুটান, হোঁচট খাওয়া, কারণে অকারণে যা করা উচিত ছিল অথচ করা হয়নি তার জন্য দুঃখ করা, এই হলো সুখময়ের মতন মানুষের জন্মগত স্বভাব।

ঘড়ি অনুযায়ী একেবারে নির্ধারিত সময়ের শেষ লগ্নে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে যাওয়া। ইরাবতীকে এই জনস্রোতের মধ্যে সুখময়ের জন্যে হাঁ করে অপেক্ষা করতে হলে বিশ্রী ব্যাপার।

স্টেশনের দক্ষিণ সীমায় হুইলারের প্রধান বুক স্টলের কাছে এসে সুখময় সুখবরটা পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলো—জামশেদপুরের ট্রেন এখনও পৌঁছয়নি।

হুইলারের দেকানে সাজানো যে বই দুটো সুখময়ের নজর কাড়বার প্রবল প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা হলো 'কুমারীর মাতৃত্ব' এবং 'রাজস্থানের হারেম'। অনেকগুলো সুদৃশ্য মনোহর কপি পরপর যেভাবে সাজানো রয়েছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় কুমারী মেয়েদের মাতৃত্ব সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠকের বিন্দুমাত্র অভাব এদেশে নেই। রেলের যাত্রীরা যে সুযোগ পেলে লাগাম ছাড়া হতে আগ্রহী তা বাংলা, হিন্দি এবং ইংরিজি প্রকাশকরা ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন। ক্রেতার অভাব নেই।

বিষয়ের অস্বস্তি কাটাবার জন্যে সুখময় হাঁটতে-হাঁটতে আর একটা বুক স্টলে হাজির হলো। সেখানে ধর্মীয় পুস্তকের ছড়াছড়ি। যে বইটা নজরে পড়লো তার নাম : 'পরমার্থ প্রসঙ্গ'। 'সন্ন্যাসীর গীতি' বলে খুব কম দামের একখানা বইও স্টলে সাজানো রয়েছে। কিন্তু মলাটের অবস্থা দেখলেই বলে দেওয়া যায়, অনেকদিন এই গীতি হাওড়া স্টেশনে অবস্থান করছে উৎসাহী পাঠকের প্রত্যাশায়। কিন্তু রাজস্থানের রমণী এবং কুমারী মাতাদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠছে না সন্ন্যাসীর গীতি।

ধর্মীয় এই স্টল থেকে 'প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা' বলে একটা বই কিনে ফেললো সুখময়। প্রতিদিন বেঁচে থাকতে হলে, যুদ্ধ করতে হবে, নিজেকে নিজের আয়ত্তে রাখতে হলে নানারকম চিন্তার রসদ দরকার। মাত্র দু'খানা দশ টাকার নোটের বদলে মহাজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা মুঠোর মধ্যে এলে মন্দ কী? রাজস্থানের রঙ্গিণীরা পূর্ব রেলওয়ের যাত্রীদের মনে কী অনুপ্রেরণা জোগায় তা অবশ্য বোঝা সুখময়ের পক্ষে এই মুহূর্তে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় বুক স্টলে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

কথামৃত'ও শোভা পাচ্ছে। এক সময়ে ধৈর্য ধরে এই ধরনের কিছু বই নিজের পাঠাগারে সংগ্রহ করেছে সুখময়। যারা এইসব বই পড়ে না তারা ঠকে, ভাবলো সুখময়।

হুইলার স্টলের সামনেই ইরাবতীর জন্যে অপেক্ষা করার কথা সুখময়ের। একটু পরেই দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের ট্রেন এসে গেল।

ময়ূরকণ্ঠী রঙের হেভি মাইশোর সিল্ক শাড়িপরা ইরাবতীর সুশাসিত শবীরটা দূর থেকে সহজেই দেখতে পেল সুখময়। ইরাবতীর সঙ্গে লাগেজ বলতে প্রায় কিছুই নেই। এক হাতে ছোট্ট একটা নরম লাগেজের স্কাই ব্যাগ, অন্য কাঁধে বাদামি রঙের চামড়ার ব্যাগ যা ওর জন্মদিনে চর্মজ থেকে কিনে এনেছিল সুখময় নিজে। ইরাবতীর আগের ভ্যানিটি ব্যাগটার এখন জরাজীর্ণ অবস্থা, যদিও তার জন্ম খোদ ইতালিতে। .

ওর হাত থেকে লাগেজ ব্যাগটা টেনে নিয়ে সুখময় সস্নেহে জিজ্ঞেস করল, "খুব কষ্ট হয়েছে?"

হাসলো ইরাবতী। বললো, "যে জিনিস চলবার জন্যে তৈরি তা অচল হলে ভীষণ অস্বস্তি হয়, সুখময়। ট্রেন, প্লেন, মোটব গাড়ি এ সব কেন যে থমকে দাঁড়ায়?"

মিষ্টি হাসলো সুখময়। জীবন সম্বন্ধেও কথাটা খাটে। চলমান জীবন একবার অচল হলে আর রক্ষে নেই। হঠাৎ সুখময়ের মনে হলো, যে জিনিস স্থাবর থাকবার জন্যে তৈরি তা হঠাৎ জঙ্গম হলেও মানুষের প্রবল অসুবিধে। "ইরাবতী, তোমার কি মনে আছে, সেই সেবার মাঝ রাতে, হঠাৎ ধড়ফড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়ে বেশ ভয় পেয়ে গেলে। ঘুমের ঘোরে তোমার মনে হয়েছিল, ঘরের খাটটা সচল হয়ে উঠেছে, যেন অদৃশ্য কারও ছায়া সেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজছে!"

ইরাবতী একটু অদ্ভুতভাবেই সুখময়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। "ভগবান যা করেন ভালর জন্যেই করেন। তুমি সে রাত্রে আমাকে-বলেছিলে, মিঠু।"

এই মিঠু নামটা সুখময়ের সরল জীবনে কোথাও লুকিয়ে ছিল না। ওটা

ওর ডাকনামও নয়। বাড়িতে একসময় মা খোকা বলে ডাকতেন। তারপর সেই রাত্রে সুখময়ের আদরের নামটা তৈরি হয়ে গেল ইরাবতীর মুখে। ইরাবতী অবশ্য বুঝিয়ে দিয়েছে, ওটা ওর নিজস্ব সম্পত্তি। মিঠু নামে সুখময়কে আর কেউ ডাকতে পারবে না, একসেপ্ট ইরাবতী। এক একজনের এক একটা সম্পত্তিতে একচেটিয়া অধিকার তৈরি হয়ে যায়!

এসব একান্ত কথাবার্তায় বিশ্বসংসারের কানপাতার ঔৎসুক্য থাকলেও প্রতিবাদের বা মন্তব্যের কোনো সুযোগ নেই। সুখময় মুখার্জি যদি কোনো প্রেয়সী রমণীর অতি আদরের মিঠু হয়ে ওঠে তা হলে বিশ্বসংসারে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার মতন কিছু তো থাকে না। বরং ভাল লাগে। এই পৃথিবীতে মানুষে মানুষে এতো ভুল বোঝাবুঝি, এতো দূরত্বের ঘূর্ণিপাক। সেখানে কাউকে কোনো মিষ্টি নামে একান্ত নিজস্ব করে তোলাটাই তো মঙ্গলময়ের আশীর্বাদ। সুখময় অবশ্যই মিঠু—অন্তত পৃথিবীর একটি মিষ্টি মেয়ের কাছে, যার নাম ইরাবতী।

"কিন্তু..." কিন্তু কথাটা হঠাৎ বেসুরো হয়ে সুখময়ের শ্রবণেন্দ্রিয়কে আক্রমণ করছে। যেন কোনো ই-এন-টি সার্জেন একটা তীব্র ইলেকট্রনিক বেল বাজিয়ে সুখময়ের শ্রবণশক্তি এবং সহ্যশক্তির পরিমাপ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

সুখময়ের পরিবর্তে মিঠু কথাটা প্রেয়সী ইরাবতী যে সবসময় ব্যবহার করে না তা গোড়াতেই পরিষ্কারভাবে জানিয়ে রাখা ভাল। এই ডাকের মধ্যে প্রবাহিনী ইরাবতীর পরিবর্তনশীল মুডের একটা বিশেষ ইঙ্গিত আছে। সুখময় বুঝতে পারে, সে যখন মিঠুন হয়েছে তখন ইরাবতীর মনটা, মেজাজটা, শরীরটা ঠিক কোন অবস্থায় রয়েছে। ইরাবতী মুখে না বলেও মনে মনে কী চাইছে সুখময়ের কাছ থেকে?

সুখময়ের মনের মধ্যেও ইরাবতীর জন্যে একটা নতুন এবং স্পেশাল নাম তৈরি হয়েছে। সেটাও বেশীরভাগ সময়েই অস্ফুট রাখতে ভালবাসে। কতকগুলো নাম থাকে যা ভীষণ স্পর্শকাতর, ভীষণ ক্ষীণতনু, অত্যধিক নরম, কোনোরকম ধকল কিংবা অতিব্যবহার সহ্য করতে পারে না।

সহসা

ইরাবতীকে সবসময় পাশে পাশে রেখে সমান পদক্ষেপে সুখময় লাগেজ হাতে ইতিমধ্যেই হাওড়া স্টেশন চত্বরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে হাজির হয়েছে। জনপ্রবাহ দেখেশুনে প্রিপেড ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের লাইনেই দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুখময়।

এক একসময় তাজ্জব কাণ্ড হয় এই হাওড়া স্টেশন ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। কখনো শত-শত উদগ্রীব যাত্রী অপেক্ষা করছে এবং গাড়ির জন্যে হাহাকার। আবার কখনও ট্যাক্সি রয়েছে কিন্তু যাত্রীর অভাব—নিজের গাঁট থেকে লাখ লাখ টাকা খরচ করে ট্যাক্সি কিনে, মোটর ভেহিকলস্ থেকে মিটার বসিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার বেকার অপেক্ষা করছে দূরের যাত্রীদের ঘরে পৌঁছে দেবার জন্যে।

প্রিপেড ট্যাক্সিই সবদিক থেকে ভাল। ইরাবতী স্টেশনের কংকোর্স ধরে হাঁটতে হাঁটতেই সুখময়কে বলেছে, গোটা পাঁচেক টাকা বাড়তি লাগে, কিন্তু হাঙ্গামা কমে যায়, মিটারে ঠকে যাবার আশঙ্কা নেই, তর্কাতর্কির অবসর নেই, ট্রাফিক জ্যামের দায়দায়িত্ব নেই। কাউন্টারে নির্ধারিত টাকা আগাম জমা দিয়ে ভুলে যাও যে ভাড়ার গাড়িতে চড়ে তুমি নিজের ঠিকানায় পৌঁছতে চাইছ। নিজের শহরে নিজের গাড়িতে চড়ে তুমি যেন নিজের বাড়িতে চলেছো।

সুখময় ভাবছে, জীবনের সবকিছুই প্রিপেড হলে ভাল হয়, ঠকে যাবার বা পাওনা মেটাবার হাঙ্গামা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতো।

প্রিপেড ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের সামনে লাইন নেই, লোক নেই। তবু সুখময় কেন দেরি করছে তা বুঝতে পারছে না ইরাবতী।

আসলে, ট্যাক্সির লাইনে অপেক্ষমান প্রথম ড্রাইভার বাঙালি। পছন্দ নয় সুখময়ের। সারথী বঙ্গসন্তান হলে একটু প্রাইভেসির অভাব হয়। দ্বিতীয়

ট্যাক্সির চালক সাদা দাড়ির সর্দারজী। এ সর্দারজী-সমাজই একদিন কলকাতার ট্যাক্সি জগৎকে দোর্দণ্ডপ্রতাপে শাসন করতেন। কিন্তু এখন এঁরা প্রায় লুপ্ত হতে চলেছেন। সেই সঙ্গে কলকাতার ট্যাক্সির স্বর্ণযুগেরও অবসান ঘটেছে। কলকাতার মতন এতো নোংরা এবং এতো ঝড়ঝড়ে ট্যাক্সির এমন বিপুল সমাবেশ পৃথিবীর আর কোনো মহানগরীতে যে নেই তা বিশ্বজনের অজ্ঞাত নয়। তবু রক্ষে, ইদানীং কলকাতার ট্যাক্সি ড্রাইভারের শ্রী অঙ্গে একটা ইউনিফর্ম জুটেছে। ছেঁড়া এবং ঘামে ভেজা নোংরা গেঞ্জির পাবলিসিটি থেকে অসহায় যাত্রীদের চোখগুলো কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছে।

একজন মধ্যবয়সী যাত্রী দ্রুতবেগে এগিয়ে সামনের বাঙালি ট্যাক্সিটা দখল করে উদ্ধার করলেন সুখময়কে।

সর্দারজীর ট্যাক্সিটা বেশ পরিষ্কার। বাংলার সর্দারজীরা আজকাল রাতের এই সময় তেমন ডিউটি দেন না, এঁদের কয়েকজনকে এখনও দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ কলকাতায় সকালবেলায়। পাম অ্যাভিনিউয়ের বাসিন্দারা এঁদের ভালভাবেই চেনেন।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে সুখময়ের ট্যাক্সি এখন ফোরশোর রোড ধরে নতুন হাওড়া ব্রিজে উঠছে। বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে যাতে লোকে বেশী ভালবাসে তার জন্যেই বোধ হয় এঁদের নামাঙ্কিত সেতুর তুলনায় বিদ্যাসাগর সেতুতে অনেক বেশী সাজগোজ এবং আয়োজন। চাঁদনী রাতে বিদ্যাসাগর ব্রিজের ওপর থেকে চার্নক সায়েবের মানসকন্যা কলকাতাকে যেন স্বপ্নপুরি মনে হচ্ছে। আগ্রার তাজমহলের সঙ্গে ব্যঙ্গাত্মক তুলনা করে যারা কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বদনাম ছড়ায় তারা একবার এই জ্যোৎস্নাধোয়া রাতে বিদ্যাসাগর সেতুতে আসুক! দেখুক শ্বেতাঙ্গিনী ভিক্টোরিয়াকে, ভাল না লেগে উপায় থাকবে না।

চলমান মোটরযানে ইরাবতীর খুব কাছে সরে আসতে সুখময়ের প্রবল লোভ হচ্ছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত মধ্যপথ অবলম্বন করলো সাবধানী সুখময়। সামান্য একটু সরে এসে শান্তভাবে সুখময় বললো, "মিষ্টি সোনা টায়ার্ড

হলে তোমাকে আরও সুন্দর দেখায়।”

“কোনটা তোমার বেশি পছন্দ মিঠু? টায়ার্ড না ফ্রেশ ইরাবতীকে?” মিষ্টি প্রশ্ন এলো ইরাবতীর দিক থেকে।

“বুঝতে পারি না! তোমাকে ফ্রেশ দেখলে মনে হয় ফ্রেশই ভাল, আবার আজ টায়ার্ড ইরাবতীকে দেখে মনে হচ্ছে মিষ্টি মেয়েদের ক্লান্তিতেও অদ্ভুত এক লাবণ্য আছে!”

“আমার কেমন ভয় হচ্ছিল, স্টেশনে নেমে তোমাকে দেখতে পাবো না।” একটু অসহায়ভাবে বললো ইরাবতী।

“তোমার কেন এমন মনে হলো মিষ্টি সোনা? তুমি অফিসের কাজ করে দূর দেশ থেকে ফিরছো আর আমি স্টেশনে থাকবো না?” সুখময়ের ভীষণ ইচ্ছে, ভাল একটা চাকরি পেলে ইরাবতীকে কাজ করতে মানা করবে। ইরাবতী যে এই অফিস-কাছারির হাঙ্গামা সামলাতে একটু কষ্ট পায় তা বুঝতে অসুবিধা হয় না সুখময়ের। আগে ওর তেমন ছোটাছুটি ছিল না, এখন মিসেস চট্টরাজ প্রায়ই ইরাবতীকে পাঠাচ্ছেন খড়্গপুরে এবং জামশেদপুরে।

ইরাবতীর শরীরের দিকে তাকিয়ে সুখময় এবার বললো, “দূর থেকে তোমাকে একটু রোগা মনে হলো, মিষ্টি সোনা।”

“উঃ আগে যা মোটা ছিলাম! কলেজের ছবি দেখলে মনে হয় জ্যান্ত কুমড়োপটাস!”

“কলেজে আমার কিন্তু কখনও তোমাকে হেভিওয়েট মনে হয়নি সোনা। এক একটা আশ্চর্য শরীর থাকে, সব অবস্থাতেই সুন্দর দেখায়।”

“ক্যালরির গোপন রহস্যটা আমি ‘বডি বিউটিফুল’ পড়ে এবার জেনে গিয়েছি। একজন এন আর আই বাঙালি ডাক্তার সম্প্রতি মার্কিনি মুলুক থেকে জানিয়ে দিয়েছেন— পঁচিশ বছর বয়স থেকে প্রত্যেক বছরে দৈনন্দিন খাবার ১৫ ক্যালরি কম করতে হবে।” ইরাবতী সম্প্রতি কোনো কাগজে প্রবন্ধটা পড়েছে।

সুখময় বললো, “বিদেশী ডাক্তারদের কথা মোটেই শুনো না ইরাবতী।

আসলে ওদেশের মানুষদের ধাতটাই আলাদা। ওদের সঙ্গে আমাদের কোনো তুলনা চলে না। ওই হিসেব অনুযায়ী চলতে গেলে তো পঁয়ষট্টি বছর হলে প্রায় না খেয়েই দিন কাটাতে হবে! দেড় হাজার মাইনাস চল্লিশ ইনটু পনেরো—মানে হাজার ক্যালরির তলায় থাকতে হবে!”

শরীর সংক্রান্ত ম্যাগাজিনের সাম্প্রতিক ইস্যুটা ইরাবতী রেল স্টেশনে কিনেছে। খড়গপুর স্টেশনেও আজকাল এইসব মহিলা ম্যাগাজিন বিক্রি হচ্ছে। এবারের প্রচ্ছদ কাহিনীর নামটি জব্বর। প্রস্ফুটিত অপরাহ্ন। অর্থাৎ মধ্যবয়সে মহিলাদের সৌন্দর্যচর্চা।

আগের ইস্যুটাও সুখময় দেখেছে ইরাবতীর সংগ্রহে—'বিকশিত বসন্ত'! সেটা কমবয়সী মেয়েদের শরীরের যত্ন সম্বন্ধে। তার আগের সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী 'যখন ফুটল কুসুম'। সদ্যযৌবনা মেয়েদের শরীর ও স্বাস্থ্য সংবাদ। বুড়ো বুড়ো ডাক্তারদের টেলিফোনে জ্বালাতন করে এবং প্রয়োজনে প্রশ্নবাণে ক্ষতবিক্ষত করে অভিজ্ঞ সম্পাদকমণ্ডলী এক এক বয়সের এক এক শরীর নিয়ে সৌন্দর্যচর্চার বিস্তারিত ইঙ্গিত দিয়ে চলেছেন তাঁদের পত্রিকায়। এইসব সংখ্যা একবার পড়ে কেউ ফেলে দেয় না, যত্ন করে রেখে দেয় প্রযোজন হলে রেফারেন্স হিসেবে বারবার পড়বার জন্যে।

ইরাবতী যে অফিসের কাজে বাইরে যাচ্ছে তা সুখময়ের অজানা ছিল না। এবার এক যাত্রায় রাউরকেল্লা, টাটানগর এবং খড়্গপুরে এজেন্সির কাজ সেরে ফেলার পরিকল্পনা নিয়েছিল ইরাবতী। আমাদের মন্থরগতি দেশ সামান্য কাজেই তিন জায়গায় তিনটে দিন অবশ্যই কেটে যায়। জাপান, জার্মানি বা ফ্রান্স হলে এককোপেই একদিনে তিনটে কাজ সামলানো যেতো। ওখানকার ট্রেনগুলোর এমন দ্রুতগতি যে আকাশের এরোপ্লেন পর্যন্ত লজ্জা পায়। ট্রেনে ওঠো আর নামো, সোজা কর্মক্ষেত্রে চলে যাও আর কাজ কবো, নির্ধারিত বিজনেস শেষ করে আবার ফিরে চলো বুলেট স্পিডের ট্রেন ধরতে। ইচ্ছে করলে তোমার নিজস্ব গাড়িকেও একই ট্রেনের সহযাত্রী করে নিতে পারো। পরের স্টেশনে তা হলে পবনির্ভর হবার প্রয়োজন হবে না।

সুখময় ব্যাপারটা বোঝে। ইরাবতীর সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে বিস্তারিতভাবে। বিদেশের পরিবহন সিস্টেম গোড়াতেই স্বীকার করে নেয়, পথে বেরুনো সব কর্মী-মানুষের নিজস্ব একটা নীড় আছে এবং নিজের ঠিকানায় ফিরে না আসা পর্যন্ত কর্মব্যস্ত মানুষের শরীর ও মন কিছুতেই শান্ত হয় না।

ইরাবতী এখনও জানে না, আজ সন্ধ্যায় স্টেশনে হাজির হবার আগে সুখময় কোথায় গিয়েছিল, কাদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল এবং সেখানে কি সব কথাবার্তা শুনে এসেছে সুখময়।

পুরনো বন্ধুমহলে ওদের ব্যাপারটা কতখানি পল্লবিত হয়ে প্রচারিত এবং পুনপ্রচারিত হয়েছে তা পুরো না বুঝলেও কিছুটা আন্দাজ করা উচিত ছিল দূরদর্শী সুখময়ের।

চটকদার খবরের প্রধান সূত্র কী কী হতে পারে তাও আন্দাজ করা ওর পক্ষে কঠিন নয়। অরিন্দম মাটা তো কলেজ লাইফ থেকেই একটি চলমান সংবাদ সরবরাহ সংস্থা। ওর সঙ্গে নিশ্চয় সমস্ত প্রাক্তন সহপাঠিনী সহসার নিশ্চয় যোগাযোগ আছে।

অরিন্দমের সঙ্গে আজ যে মুখটা সুখময়ের চোখের সামনে সারাক্ষণ ভেসে উঠছে তা অবশ্যই সহসা রায়চৌধুরীর!

কুমারী সহসার খবর ইদানীং পাচ্ছে না সুখময়। নিশ্চয় তার হাতে কাজের অভাব নেই।

সহসা অবশ্য চিরকালই পুরনো দিনের কলেজ সহপাঠীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। সুখময়ের থেকে বেশি এ বিষয়ে কারও জানবার

কথা নয়। আসলে সহসা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আনন্দ পায়। অরিন্দম মাইতিও নিজের ক্যাটারিং বিজনেসের কথা মনে রেখে ঐ একই পথের পথিক। পৃথিবীতে যত বেশি লোকের সঙ্গে জানাশোনা হয় একজন উঠতি ক্যাটারারের পক্ষে যে ততই ভাল অরিন্দম তা ভালভাবেই জানে। সে নিজেই তো বলে, "যত জানা শোনা তত অর্ডার তত টাকা, বুঝলে সুখময়। ক্যাটারার, উকিল, ডাক্তার এবং গুরুদেবদের এইটাই হচ্ছে সাফল্যরহস্য।"

ভাব বিনিময়ের আদর্শ সাবজেক্ট সুখময়ের ব্যাপারটা ইদানীং অবশ্যই বেশ মুখরোচক হয়ে উঠেছে। বন্ধুরা শুনেছে, তাদের সুখময় মুখার্জি তলিয়ে গিয়েছে! সেই সুখময় যে একদিন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দর জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারা নিয়ে ডজন ডজন বই পড়ে ডাইরিতে নোট করতো। একসময় সে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে কথায় কথায় সরস উদ্ধৃতি দিতে পারতো। সুখময় আশ্বাস দিতো, বলতো, যে যা চায় ঠাকুর তাকে তাই দিতে ভালবাসতেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের মুখে কোনো আগল ছিল না, কারণ মনের মধ্যে কিছু লুকিয়ে রাখতে চাইতেন না তিনি। আর ওই যে ম্যাদামারা মেনিমুখো মানুষ। তাদের থেকে ডাকাত-পড়া ভাবের মানুষকে অনেক বেশি পছন্দ করতেন তিনি। রামখেস্টান সেই সুখময় এখন তলিয়ে গিয়েছে, চুপিচুপি মনের সাধ মিটিয়ে ডুব সাঁতার কাটছে এক প্রাক্তন সুদেহিনী সহপাঠিনীর সঙ্গে।

ইরাবতী, ডুব দাও, ডুব দাও পুরনো সহপাঠীদের কাউকে ভাল লাগলে অবশ্যই বিয়ে করো। কিন্তু তাই বলে বিনা বিবাহে কারুর সঙ্গে একসঙ্গে থাকা? পাপিষ্ঠার তাকে প্রাণ ভরে নিষিদ্ধ জীবনযাপন ছাড়া একে আর কী বলা চলতে পারে?

অরিন্দম মানুষটি একটু সেকেলে, একটু বোকাসোকা। তার মাথায় নিশ্চয় ঢুকেছে, ইরাবতী নামে এক প্রাক্তন সহপাঠিনী এখন বন্ধুবর সুখময়ের রক্ষিতার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন।

এসব কথা এই মুহূর্তে ইরাবতীকে বলা যায় না। সে পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে এসেই রাস্তার জামাকাপড় ছেড়ে একটা রঙিন তাঁতের শাড়ি পরে সুখময়ের সঙ্গে ডাইনিং টেবিলে হাজির হয়েছে। যতক্ষণ ইরাবতী জামাকাপড় ছেড়েছে এবং বাথরুমে থেকেছে সুখময় ততক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেনি। এখন বিদেশী স্টাইলে জীবনযাত্রার হাওয়া বইছে দক্ষিণের এই ফ্ল্যাটে।

পশ্চিমী স্বামীদের পদক্ষেপ অনুসরণ করে সুখময় ফ্রিজ থেকে কিছু খাবার বার করে দ্রুত গরম করে নিয়েছে। গরম হবার পরে এই পৃথিবীতে অনেক জিনিস খুব তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এই ঠাণ্ডাকে প্রতিরোধ করার জন্যে সংসারী মানুষ নানাদিকে নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার বছর ধরে। মানুষ চায়, যা ঠাণ্ডা তা ঠাণ্ডাই থাকুক, যা গরম তা গরমই থাকুক। অথচ প্রকৃতির ইচ্ছা অন্য রকম--সেখানে গরম ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে এবং ঠাণ্ডা ক্রমশ গরম হয়ে তার প্রাথমিক প্রকৃতি হারিয়ে ফেলে। প্রকৃতির প্রত্যাশা, স্বভাবের দূরত্ব কমে গেলে মিলনের পথ মসৃণ হবে।

দ্রুত ডিনারের পাট চুকিয়ে ইরাবতী ও সুখময় দু'জনে ড্রইয়ংরুমে মুখোমুখি এসে বসেছে। সুখময় যে বারবার ইরাবতীর মুখটা খুঁটিয়ে দেখছে, তা বুঝেই ইরাবতী যেন বললো, "দুনিয়ার ধুলো আর তেল আমার মুখে এসে জমা হয়েছে।"

তাতে যে ইরাবতীর মাধুর্য একতিলও কমে যায়নি একথা শোনবার আগেই ইরাবতী স্নানঘরে ঢোকবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। ইরাবতী বুঝতে পারলো না, এই সময় সুখময় চাইছিল আরও একটু অন্তরঙ্গ হতে।

এই অন্তরঙ্গ শব্দটার অর্থ একদিন সুখময় নিজেই বুঝিয়েছিল ইরাবতীকে— যাহার অঙ্গ আত্মসদৃশ। ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন, 'তোরে অন্তরঙ্গ জানি, করিনু যুগলপানি, উপকারে আসিতে আমার।'

অন্তরঙ্গতার কথা ভাবছে না বোধ হয় ইরাবতী। সে স্নানঘরে ঢুকে পড়লো নিজেকে আরও স্নিগ্ধ করতে। স্নান ও নিদ্রা এই দুটিই

পাপীতাপীদের উষ্ণ দেহকে শীতল করার জন্যে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।

সুখময়ের মনে পড়লো, ইরাবতী সেবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, অন্তরঙ্গের উল্টোটা কী?

মাথা খাটিয়ে বার করতে পারেনি সুখময়, সে তখন অভিধান বার করে বলেছিল, "ওরা লিখেছে 'বহিরঙ্গ', কিন্তু কথাটা তেমন যেন জমছে না।"

স্নান ঘর থেকে বেশ কিছুক্ষণ পরে সুসজ্জিতা ও তরতাজা হয়ে বেরিয়ে এলো ইরাবতী! বিজ্ঞাপনদাতারা এইসব ক্ষেত্রে যে দুটি কথা ব্যবহার করেন তা হলো 'ফ্যাকটরি ফ্রেশ' অথবা 'ফ্রেশ ফ্রম দ্য ওভেন' অথবা 'সদ্য বাগান থেকে তোলা'। ইরাবতীর বাঁ হাতে একটা জাম্বো সাইজের ক্রিমের শিশি। আজকাল কত কি যে ইন্ডিয়াতে পাওয়া যাচ্ছে। হয় এদেশে তৈরি হচ্ছে, না হলে বিদেশ থেকে সোজা পথেই চলে আসছে মনিহারি দোকানে শোভা পাবার জন্যে। এই ক্রিমটা মুখে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রয়োগ করতে করতে ধৈর্য লাগে, সময় লাগে। সুখময় বুঝেছে, শরীরের ব্যাপারে মেয়েদের সত্যিই অশেষ ধৈর্য। শরীরচর্চা, রূপচর্চা, সংসারচর্চা—ইত্যাদি চলমান রাখতে সমস্ত জীবনের সিংহভাগ অংশ ব্যয় করতে প্রস্তুত মেয়েরা।

পাম এভিনিউ-তে সুখময়ের শয়ন মন্দিরে পাশাপাশি দুটি সিঙ্গল খাট আছে। তবে জোড়া দেওয়া নয়। দুটির মধ্যিখানে দু' ফুটের দূরত্ব, হাত বাড়ালে অবশ্য হ্যান্ডশেক করা যায়, কিন্তু খাট এখনও জোড়া লাগেনি। এটা যেন ইরাবতীর লজ্জা অথবা দ্বিধা। নিজেকে বুঝিয়ে দেওয়া, নৈকট্য আছে, আবার দূরত্বও আছে এই ঘরের মালিক মানুষটির সঙ্গে।

ইরাবতীর একটা অভ্যাস ভীষণ ভাল লাগে সুখময়ের। শোবার আগে সে বিলিতি স্টাইলের রাতের পোশাকগুলো পরে না। ভগবান অনেক ভেবেচিন্তে ভারতীয় মেয়েদের শাড়ি উদ্ভাবন করেছিলেন। ঝালে ঝোলে অম্বলে, জেগে থাকা ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় সমানভাবে সব প্রয়োজন মিটিয়ে দেয় এই শাড়ি। কোন এক সাহিত্যিক আরও এগিয়ে গিয়ে শাড়িকে মিলনে-বিচ্ছেদে এবং জীবনে-মরণে সমান উপযোগী বলে বর্ণনা করেছিলেন।

ইরাবতী সাধারণত রাতের খাওয়া, প্রসাধন ও ত্বকচর্চা শেষ করে একটা বই অথবা কয়েকটি ম্যাগাজিন নাড়াচাড়া করে। বাংলা এবং ইংরিজিতে প্রকাশিত মেয়েদের কাগজে নাকি হাজার রকমের দামী ও দুষ্প্রাপ্য খবর প্রকাশিত হয়। মেয়েদের নিজস্ব বন্ধু বলতে এখন এই কাগজগুলো। সম্পাদকের কাছে পরমআত্মীয়ের মতন খোঁজ করতে, প্রশ্ন করতে, মন্তব্য পাঠাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না মেয়েদের।

এই কাগজ পড়তে পড়তেই ইরাবতী সেদিন সুখময়কে বলেছিল, "মেমসায়েবদের সব উল্টো। গরমের রাত ছোট, শীতের রাত বড়—তাই নাইটির আয়তন বাড়িয়ে কমিয়ে ওরা প্রতিবাদ জানাতে চাইছে—এখন শীতের রাতে পশ্চিমী মেয়েদের অঙ্গাভরণ ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। গ্রীষ্মের রাতে উল্টো ঘটনা ঘটবে। কিন্তু শাড়ির ব্যাপারটাই আলাদা। সাইজের সমস্যা থেকে এই বস্ত্রখণ্ড মেয়েদের মুক্তি দিয়েছে। কে যে সব বয়সের সব আকারের মেয়েদের জন্যে এক সাইজের শাড়ির কথা প্রথম ভেবেছিলেন তা ইতিহাসে লেখা থাকা উচিত ছিল। তাঁর চিন্তার মধ্যে রীতিমত বিপ্লব ছিল।

মিষ্টিসোনাকে এতো ক্লান্তির পরও ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে। একবার ইচ্ছে হলো, সুখময় কোনো কথা না বলেই, আস্তে আস্তে ইরাবতীর একক বেডটায় সরে গিয়ে কিছুক্ষণের সান্নিধ্যসুখ নিশ্চিত করে। যা সত্য তা কেন অনুভবের বাইরে থাকবে?

কিন্তু ইরাবতী আধশোয়া অবস্থায় হঠাৎ সুখময়কে বললো, "আমি আজ ভীষণ ক্লান্ত। আমার মাথাটা এখনও ধরে রয়েছে, সুখময়।" মিঠু কথাটা

ব্যবহার করলো না সুখময়ের মিষ্টিসোনা।

"তোমার কপালটা একটু টিপে দেবো? এখনই মাথাধরা কমে যাবে," জিজ্ঞেস করলো সুখময়। আসলে সে সেবার অনুমতি চাইছে।

"মেয়েদের কাগজে লিখেছে, মাথা টিপলে মাথাব্যথা বেড়ে যায়।" ইরাবতী উত্তরটা নিশ্চয় কোনো মেয়েদের ম্যাগাজিন অথবা স্বাস্থ্য পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করেছে।

"সে দিন তুমি যখন আস্তে আস্তে আমার কপাল টিপে দিলে আঙুলে একটু ম্যাজিক মলম লাগিয়ে তখন আমার মাথাব্যথা ভীষণ কমে গেলো, মিষ্টিসোনা," ইরাবতীকে মনে করিয়ে দিতে চায় সুখময়।

ইরাবতীর উত্তর : "ওটাও সেবার অন্য একটা মেয়েদের কাগজে বিজ্ঞাপন লিখেছিল—ইমামী মেনথোপ্লাস। কখন যে ওরা কি লেখে ঠিকঠিকানা নেই। সব সময় ওদের লেটেস্ট কথাগুলো শুনতে বলে ওরা। মানুষের শরীর নিয়ে, স্বাস্থ্য নিয়ে, সুখ নিয়ে, অসুখ নিয়ে সারাক্ষণই তো গবেষণা চলছে। সেকেলে সব চিন্তা কথায় কথায় ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে!"

"ওদের বিশ্বাস নেই, মিষ্টিসোনা। নতুন কথা বলবার জন্যে পশ্চিমের মানুষগুলো সারাক্ষণ ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। নতুন হতে গিয়ে ওরা পুরনো শরীরটা ভাঙচুর করতেও দ্বিধা করছে না।" সুখময় যে অনেক খবরাখবর রাখে তা বুঝছে ইরাবতী।

আজ বিছানায় শুয়ে ইরাবতী অন্য রাতের মতন অনেকক্ষণ ম্যাগাজিন পড়লো না। সে বললো, "বাইরে থেকে রিলিফ দিতে না পারলে ওরা ভিতর থেকে নিবৃত্তির পথ খুঁজতে বলে।"

আসলে ইরাবতী আজ বাথরুমে ঢুকে স্নানের আগে মাথা ধরার ট্যাবলেট গুঁড়ো করে খেয়েছে। বিভিন্ন রঙ এবং সাইজের ট্যাবলেট স্ট্রিপ ইরাবতী ওর একক বেডের লাগোয়া একটা ড্রয়ারে রেখে দেয়। ড্রয়ারটা সে বিশেষভাবে তৈরি করে নিয়েছে, সঙ্গে একটা চাবিও করেছে। রমণী শরীরকে যন্ত্রণামুক্ত, গ্লানিমুক্ত রাখতে যে কত রকম রাসায়নিক রিলিফের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তা ছেলেরা ঠিক বুঝতে পারে না।

সহসা

সুখময় জানে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ খাওয়ার পর কোনো ডেলিকেট শরীরকে উত্ত্যক্ত করা সুবিবেচনাপ্রসূত নয়। তবু সে কি রকম যেন শূন্যে ভাসছে আজ সমস্ত দিনের কর্মশেষে।

ইচ্ছে করছে, দু' ফুট দূরের ওই সিঙ্গল খাটটায় গিয়ে কিছুক্ষণের আশ্রয় নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বুঝে নেয়, সুখময় মুখার্জি এই পৃথিবীতে একা নয়। শুধু সুখময় মুখার্জি নয়, ইরাবতী, তুমিও কখনও একা নও। সেবার সুখময় তো ইরাবতীকে কত কষ্ট করে কত ধৈর্য ধরে বুঝিয়েছিল।

ইরাবতীর চোখে তখন জল। সে বলছিল, "কেন এমন হয় বলতো, সুখময়। একা থাকতে আমার ভীষণ ভয় করে।"

ইরাবতীকে সেবার সুখময় সান্ত্বনা দিয়েছিল। "ইরাবতী, এই পৃথিবীতে মানুষকে একা আসতে হয়, একা চলে যেতে হয়, কিন্তু একাকিত্ব মানুষের স্বভাব নয়। কোন দুঃখে তুমি একা থাকবে? দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর তো কখনও কাউকে একা থাকতে বলেননি।"

ইরাবতী অবশেষে কান্না থামিয়েছে। সুখময় ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছে, "ঠাকুর রামকৃষ্ণর এক চেলা বলতেন, মানুষ যখন একলা থাকে, তখন সে নিজের মধ্যেই আর একজন সঙ্গী খুঁজে নেয়, এবং তার সঙ্গেই অনর্গল কথা বলে যায়। এর নামই তো চিন্তা।"

কিন্তু নিজের সঙ্গে সব সময় যে কথা বলতে ইচ্ছে করে না, এ কথা ইরাবতী কখনও লুকিয়ে রাখেনি।

নিজের কাজে মানুষ কখনও একঘেয়ে হয় না কথাটা সাধুরা বললেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। আসলে, সান্নিধ্যের রসায়নে মানুষ প্রতিনিয়ত পাল্টে যায়, তাই জন্যে তো প্রিয়সঙ্গ এবং সাধুসঙ্গর জন্য জগৎ জুড়ে এত ব্যগ্রতা।

"ইরাবতী তুমি তো কোনও অন্যায় করোনি, কোন দুঃখে তুমি নিজেকে

একলা থাকার শাস্তি দেবে? এই পৃথিবীতে কত লোক রয়েছে, তাদের মধ্যে বিরোধ আছে, দূরত্ব আছে। তবু তারা পরস্পরকে কাছে চাইছে বলেই তো এত দুঃখের মধ্যেও মানুষের সমাজ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।”

তখন পরিস্থিতি ছিল একটু গুরুতর। ইরাবতীর পক্ষে তখন ভয় পাওয়া অবশ্যই অসম্ভব অথবা অস্বাভাবিক নয়।

আসলে, একা মনে করলেই মানুষ একা। হাজার মানুষের ভিড়ে ভরা পাড়ায় বসবাস করেও ইরাবতী নিজেকে সম্পূর্ণ একা বলে আশঙ্কা করছে, আর নির্জন অরণ্যে অথবা গিরিগহ্বরে নিতান্ত একলা মানুষ স্রেফ তুমি আছো আমি আছি এই বিশ্বাসে মাতাল হয়ে নিশ্চিন্তে রজনী যাপন করছে।

ইরাবতীর তখনকার অবস্থা ভুলবার মতন নয়। একটা মানুষ পরিস্থিতির চাপে পড়ে কিছু সময়ের ব্যবধানে কেমন পাল্টে যেতে পারে তা না দেখলে ভাবা যায় না। ভাগ্যেরও কী পরিহাস!

বিছানায় জেগে থাকা সুখময় হঠাৎ নিজেকে উত্তেজিত করছে। শ্রীমান সুখময় মুখার্জি, সাউথ ক্যালকাটার পাম এভিনিউ-এর সুখময়, নিজের অবস্থাটা একটু বোঝো। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হয়েই তুমি অদৃষ্টের ফেরে একই ঘরে শুয়ে আছো তোমারই বয়সিনী সমকালের এক রমণীর সান্নিধ্যে। এ কথা সত্য জীবনে অনেক কিছু ঘটে যায় যা কিছুতেই আগে থেকে আন্দাজ করা যায় না। কিন্তু সুখময় মুখার্জি, তুমি কি কখনও ভেবেছিলে ইরাবতী ও তুমি একই ঘরে এইভাবে দুটো বেডে কাছাকাছি পাশাপাশি শুয়ে থাকবে? ইরাবতী তোমাকে বলবে, “আমি একটু রোগা হয়ে আমার ভালই হয়েছে। তুমি কী বলো?”

সহসা

ইরাবতী ঘুমিয়ে পড়েছে অল্প সময়ের মধ্যেই। রুদ্ধদ্বার এই ঘরেই যে একজন বিয়ে-না-করা পুরুষ উপস্থিত রয়েছে তার জন্যে বিন্দুমাত্র দুর্ভাবনা ছিল না তার মনের মধ্যে। থাকলে নিশ্চয় ইরাবতীর চোখে এমনভাবে ঘুম নেমে আসতো না।

শুধু একটা বেয়াড়া অভ্যাস রয়েছে ইরাবতীর। সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে সে কিছুতেই ঘুমোতে পারে না। অন্তত একটা ছোট আলো জ্বেলে রাখা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সেবার সেই রাত্রে সুখময় বুঝতে পারছিল না, ঘুমোবার সময় বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে রেখে কী হবে? বাইরের ব্যালকনি দিয়ে সারা কলকাতার স্ট্রিটলাইটের অর্ধেক আলো তো ইরাবতী যে ঘরে শুয়ে আছে সে দিকেই সারারাত্রি প্রখর নজর রেখেছে! এই সব আলো তো কারও নিষেধ না শুনেই হোলনাইট ধরে ডিউটি দেবে।

কিন্তু কী যে হলো, সেরাত্রে সুখময় যখন ঘরের আলোটা নেভালো তখনই ইরাবতী একটু কাতরভাবে বলে উঠল, "প্লিজ, সুখময় আলোটা জ্বালিয়ে রাখো।"

কীসের ভয়ে আলো চাইছে ইরাবতী? চিন্তিত হয়ে সুখময় অন্ধকার ঘরের আলো আবার জ্বালিয়ে দিয়েছে। পরে অবশ্য ক্ষমা চেয়েছে ইরাবতী। "আমার যেন কেমন মনে হলো আমি হারিয়ে যাচ্ছি। আমি ভীষণ অন্ধকারে একলা ডুবে যাচ্ছি, সুখময়। আলো ছাড়া আমার নিজের যেন কিছু নেই।"

অন্ধকারে কেউ ডুবে মরে না, ইরাবতীর জানা উচিত। মানুষ ডুবে যায় জলে।

"ইরাবতী, তুমি নিজের নামের মানেটা জানো?" একবার সুখময় প্রশ্ন করেছিল দ্বিতীয় পর্বের পরিচয়ের প্রথম দিকে।

"খুব জানি। ইরাবতী একটা নামকরা নদী।" আরও গভীরে যেতে পারতো ইরাবতী। সংস্কৃত অভিধান খুললে জানতে পারতো, ইরা মানে জল, যা জলবতী তাই তো ইরাবতী।

বেগবতী নদীকে ভীষণ পছন্দ সুখময়ের চিরকাল। স্রোতস্বিনীর দিকে তাকিয়ে বেলুড়মঠের স্নানের ঘাট থেকে কতবার জলবতী ভাগীরথীকে দেখেছে সুখময়। তখন সে জানতো না যে ইরার আর এক অর্থ সুরা। এই সুরা পুরুষের রক্তে বেজায় নেশা ধরায়, সুখময়ের মতন মানুষকেও এই নেশা পাগল করে দেয়।

সেবারও ইরাবতীকে বেশ আলোড়িত হতে দেখা গেলো। সহসা রায়চৌধুরী একদিন কোন সময়ে তাকে তীব্র ব্যঙ্গবাণে ক্ষতবিক্ষত করার চেষ্টা চালিয়েছে। যা বয়ে যায় তাই নাকি ইরা ; যাকে ধরে রাখা যায় না তা ইরা ছাড়া আর কী হবে?

ঘুমেব ঘোরে সুদেহিনী ইরাবতী এখনই পাশ ফিরল। ক্লান্তি ও ওষুধের কেমিষ্ট্রি দুটোই হাত মিলিয়েছে বেচারার শরীরে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার। সুখময় জানে, এখনও যদি চুপি চুপি আলো নিভিয়ে দেওয়া হয় তা হলে ইরাবতী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠবে, বিচলিত হয়ে বিছানায় বসে পড়ে নিশ্চয় নিজের আঁচল সামলাবে।

সেবার গভীর রাতে পাম অ্যাভিনিউতে সি ই এস সির আলো হঠাৎ চলে গেল। ইরাবতী প্রবল অজানা আশঙ্কায় হুড়মুড় করে বিছানায় উঠে বসলো, ভেবে বসলো, অন্য বিছানায় যে পুরুষমানুষটি শুয়ে আছে সে-ই আলো নিভিয়েছে, ইচ্ছে করে। দূরে রাস্তার আলোগুলোও লোডশেডিং-এর সুযোগে মনের আনন্দে ডিউটি থেকে সরে পড়েছে। সুখময়ের সঙ্গে তারা কোনো ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়নি।

তবু ইরাবতী বললো, "আমার ভীষণ ভয় পাচ্ছে, সুখময়।

"কেন ভয় পাচ্ছো ইরাবতী? আমি তো তোমার কাছেই রয়েছি।"

ইরাবতী সরল মনে সুখময়কে বললো, "বিশ্রী এক স্বপ্ন দেখলাম, সুখময়। আমার কোনো বন্ধু চুপিচুপি আমার পরম শত্রু হবার জন্যে সাজগোজ করছে।"

"শত্রু হবার জন্যে সাজগোজ করার তো দরকার হয় না, ইরাবতী।" সুখময় শান্ত করতে চায় ইরাবতী নামক প্রস্ফুটিতযৌবনা মেয়েটিকে।

"ঠিক বলেছো তুমি। শত্রুর তো কোনো ইউনিফর্ম থাকে না। আসলে শরীরটা ঘুমিয়ে পড়লে মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধিও ঘুমিয়ে পড়ে। ঘরের মধ্যে আমার পাশে তুমি তো রয়েছ, সত্যিই তো, আমার ভয় কি? এইটুকু বুদ্ধি ঘুমের মধ্যেও আমার মগজে অবশ্যই থাকতে পারতো!"

ভাগ্যে ওর হাতের গোড়ায় একটা টর্চ ছিল। ব্যাটারি ভরা সেই টর্চটাই জ্বালিয়ে দিয়েছিল ইরাবতী। অন্ধকারকে ওয়ার্নিং দিয়ে আয়ত্তে রাখতে পারে এই টর্চের আলো। এখনও ঘুমোতে যাবার আগে ইরাবতী নিয়মিত দেখে নেয়, বালিশের তলায় টর্চটা ঠিক আছে কিনা।

সুখময় একবার মাঝরাতে আলো চলে যাওয়ার পরে ইরাবতীকে বলেছিল, "কোনো কোনো মানুষ ঠিক তোমার উল্টো। আলো জ্বালা থাকলে তাদের ঘুমই আসবে না।"

ইরাবতী তর্ক করেনি, শুধু বলেছে, "তা হলে দিনের বেলায় মানুষ তো কখনও ঘুমোতেই পারতো না।"

সেদিন রাত্রে অন্ধকারকে বাধা দেবার জন্যেই টর্চটা জ্বালানো রয়েছে। ঘর থেকে অন্ধকার পুরো দূর হয়নি, তবু যে একটা মৃদু প্রতিবাদ জানাবার ব্যবস্থা করা গিয়েছে বলে আশ্বস্ত হচ্ছে ইরাবতী।

এরপরেই ইরাবতী নিজেকে ক্রমশ প্রকাশ করে ফেলেছিল। স্বীকার করেছিল, "চিরকাল এমন ছিল না, সুখময়। সব আলো নিভিয়ে আমি নিজের বিছানায় নিশ্চিন্তে ঘুমোতে যেতাম।" ইরাবতী এরপর স্বেচ্ছায় তার জীবনের অন্য এক পর্বের বর্ণনা শুরু করেছিল।

বোধ হয় প্রথমে একটু দ্বিধা হয়েছিল। সুখময়ের কাছে অন্য এক অন্তরঙ্গ পুরুষ সম্পর্কে প্রাণখোলা আলোচনা। কিন্তু বুকটা এখন হালকা রাখতে চায় ইরাবতী আজকাল। কিছুই মনের মধ্যে জমিয়ে রাখতে ভাল লাগে না। এতে শরীরটাও কেমন ভারী ভারী লাগে। সুখময় তো বুদ্ধিমানপুরুষ, তার কাছে রমিত সেনগুপ্ত তো কোনও অজানা পরিচ্ছেদ নয়। সুখময় তো জানে কে এতোদিন স্বামী হিসেবে ইরাবতীর শরীরের ওপর সারাবাত আধিপত্য করেছে। ইরাবতী স্বামী হিসেবে তার কাছে নিত্য আত্মসমর্পণ করেছে।

ইরাবতী আর দ্বিধা করেনি। আধো-আলো আধো অন্ধকারে পাশের খাটে শুয়ে থাকা সুখময়কে সলজ্জভাবে বলেছে, "রমিতের ছিল উল্টো স্বভাব। বিছানায় শুয়ে একদম আলো সহ্য করতে পারতো না। ঘুমোবার সময়ে ঘরে কোনও আলোই থাকবে না।"

দু'জনের মধ্যে শেষপর্যন্ত কি ফয়সালা হয়েছিল তাও জানা গেল। পাশাপাশি দুটো ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা, একটা ঘরে যথেষ্ট আলো, অন্য ঘরে যথেষ্ট অন্ধকার। যতক্ষণ স্বামী-স্ত্রী জেগে আছে ততক্ষণ কোনো অসুবিধে নেই, তাই দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় খাবার আশঙ্কা দেখা দেয়নি।

ব্যাপারটা সহজ করে দেবার জন্যে সুখময় বললো, "আমার কোনো কিছুতেই অসুবিধে নেই, ঘুম যখন আসে তখন আলো বা অন্ধকার কারও তোয়াক্কা করে না।"

ইরাবতী ও রমিতের ব্যাপারটায় সে গুরুত্ব দিতে চায় না, ব্যাপারটা সহজ করার জন্য সুখময় বললো। "অনেকের ওরকম হয।"

সুখময়ের দিক থেকে উত্তরটা সহজভাবে এসে ইরাবতীকে সাহস দিচ্ছে। ইবাবতীকে এবার বুঝতেও একটুও কষ্ট হচ্ছে না সুখময়ের।

এরপর কিছুক্ষণের নীরবতা। ইরাবতী ভাবছে রমিতের কথা। যে খাটটায় ওরা দু'জনে শুতো সেটা নেই এখন।

ঘুমোবার আগে যে খাটে রমিত অতিথি হয়ে আসতো সেই খাটটা ওরা কেড়ে নিয়েছে। গোড়ার দিকে তখন কি ছেলেমানুষী। তখন একটা বেবির ইচ্ছে হয়েছে ইরাবতীর।

সহসা

ইরাবতীর জানাশোনা সমবয়সিনীদের সংসারে প্রায় সকলের তখন বেবি এসে গিয়েছে।

বিয়ের প্রথম দিকে বেবির কথা অতো ভাবতোই না ইরাবতী। বেবি ইজ এ গুড থিং ; কিন্তু ফুলশয্যার মাসেই সবাইকে বেবির জালে জড়িয়ে পড়ে জীবনের অন্য সব সাধ-আহ্লাদ চিরতরে বিসর্জন দিতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

কিন্তু এ দেশের বয়সী মহিলাদের জীবনে যেন অন্য কোনও ভাবনাচিন্তা নেই। বেবিহীন কমবয়সী বিবাহিতা রমণী দেখলেই তাকে মা করবার জন্যে এই সব মহিলারা প্রবল উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বয়োজ্যেষ্ঠারা অবশ্য আজকাল সময়ের সঙ্গে তাল রেখে একটু বুদ্ধিমতী হচ্ছেন। ভগবানের ঘাড়ে সব দোষ না চাপিয়ে এঁরা প্রথম সুযোগেই সুকৌশলে জেনে নিতে চান কেন বেবি আসছে না? ইচ্ছে করে ওষুধ খেয়ে? না দেহযন্ত্রের অসহযোগিতায়?"

উঃ, আগেকার যুগে এতো সব হাঙ্গামা ছিল না। বেবির আবির্ভাবটা মেয়েদের ইচ্ছের ওপরে একেবারেই নির্ভর করতো না। জীবনের কোনও বড় ব্যাপারেই তখন মেয়েদের কোনও নিজস্ব মতামত ছিল না, চয়েস ছিল না—শিক্ষা, স্বামী, সন্তানের আগমন—বিধাতা কারও সঙ্গে শলাপরামর্শ না করেই এসব সিদ্ধান্ত মেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন এবং সব মেয়েরা ওইসব দায়িত্ব নীরবে মেনে নিয়েছে চমৎকার ভাবে। শরীর ও মন কোনোটাই এ দেশের মেয়েদের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, এই বিশ্বাস নিয়েই এ দেশে মেয়েরা বড় হয়েছে, বেঁচে থেকেছে এবং সাধ আহ্লাদ দূরে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের দায়দায়িত্ব প্রাণ দিয়ে পালন করেছে। অনেক মেয়ে বোনাস হিসেবে পেয়েছে সন্তানশোক, বৈধব্যযাতনা, দারিদ্র্য জ্বালা এবং রোগ জর্জরিত শরীর—যা স্বামীসেবায় এবং স্তন্যদানে ক্রমশ আরও বিশুষ্ক হয়েছে।

এ সব কথা অবশ্য ইরাবতীর নিজস্ব নয়, মেয়েদের পত্রিকাতেই এবিষয়ে অনেক মন্তব্য নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। রমিতও এই ধরনের

লেখা মন দিয়ে পড়ত, এবং মাঝে মাঝে খোলাখুলি আলোচনা করত ইরাবতীর সঙ্গে। স্ত্রীর সঙ্গে কোনও বিষয়ে অকারণে দ্বিমত হওয়াটা রমিতের স্বভাবে ছিল না।

পরে ইরাবতীর হাসি এসেছে সেসব দিনের চিন্তাগুলো স্মরণ করে। রমিত বোধহয় জানতো না, স্বল্পদিনের বেবির জন্যে শয়ন মন্দিরে সারারাত আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। অথচ শোবার ঘরে আলো জ্বলে থাকা মানেই রমিতের বিনিদ্র রজনী!

এই রমিত নামটা নিয়েও সুখময়ের সঙ্গে ইরাবতীর কয়েকবার আলোচনা হয়েছে। উচ্চারণ রোমিত, কিন্তু বাংলায় ওই ধরনের কোনও শব্দ নেই।

রমিত মানে যে রমণীয় অথবা মনোরম তা ইরাবতীই প্রথমে বাংলা অভিধান খুলে রমিতকে দেখিয়ে দিয়েছিল। ও বেচারা কোনওদিন বাংলা সাহিত্যের ধারে-কাছে যায়নি। ইংরিজি মাধ্যমে পড়া বংশ, ভুল করে নিজের নামটা রোমিত লিখে এসেছে, কেউ সংশোধনও করে দেয়নি বিয়ের আগে পর্যন্ত।

ইরাবতী অবশ্য বলেছে, "লজ্জা পাবার কিছু নেই। সর্বনামটা নামের মালিকের প্রিভিলেজের-এর সঙ্গে ও-কার জুড়লে কেউ বাধা দিতে পারে না তোমাকে। তবে আমার রমিত কোন অপরাধে রোমিত হবে?"

এর পরে আরও মজা হয়েছে। সহসা রায়চৌধুরী বানানের কথাটা মনে রেখে, বোমিত না বলে সব সময় রমিত বলে ডাকতে শুরু করেছে। মিস্টার রমিত সেনগুপ্ত!

এতেও সমস্যা হয়েছে, ওই উচ্চারণ মোটেই পছন্দ হয়নি ইরাবতীর। সে একদিন সোজাসুজি সহসাকে টেলিফোনে বলেছে, "প্লিজ সহসা, ওর নাম ওইভাবে উচ্চারণ করলে মনে হয় আমি 'র' মিট অর্থাৎ কাঁচা মাংসকে বিয়ে করেছি! আমার স্বামীকে ডাকতে হবে রোমিত, লিখতেও হবে রোমিত, লোকে যেন ভাবে রোমান যুগের কোনও সম্পর্ক ইতিহাসের নজর এড়িয়ে কখন সংস্কৃতে ঢুকে বসে আছে। নিজের স্বামীর নাম না হলে

কে আর বই হাতড়ে রমিত শব্দের উৎপত্তি নিয়ে মাথা ঘামাতো?”

কথাটা যে ঠিক নয়, রমিত নাম সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ যে অন্যত্র হতে পারে তা ইরাবতী তখনও আন্দাজ করতে সমর্থ হয়নি। এই রকমই হয়, নিজের স্বামী সম্বন্ধে অতিমাত্রায় নিশ্চিত হতে গিয়ে অনেক মহিলা এই সংসারে অনেক মূল্য দিয়েছেন।

একই ঘরে শুয়ে থাকা একজন পুরুষ ও রমণী যখন একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে না তখন একটা আলো অপরিচিত প্রহরীর মতন জেগে থাকলে মন্দ হয় না।

শোবার সময় সুখময় কখনও পশ্চিমি স্টাইলের স্লিপিং ড্রেস পরায় অভ্যস্ত ছিল না।

চিরকালই একটা গেরুয়া রঙের খাদি পাঞ্জাবি এবং শাদা পায়জামা পরে সে রাতের প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েছে। তারপর, অর্থাৎ অনেকদিন পরে, ব্যাপারটা ঘটল। যতদিন মানুষ একা, রাত্রে যখন কারুর কাছে কোনোরকম কৈফিয়ত দেবার আশঙ্কা নেই তখন নৈশ সাজসজ্জাটা নিতান্তই নিজের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সেদিন ইরাবতী একটা কাণ্ড করে বসল।

সুখময়কে অবাক করার জন্যেই বোধ হয় ইরাবতী রাত দুপুরে সুন্দরভাবে ইস্ত্রিকরা এক সেট স্ট্রাইপ্‌ড্ নাইটড্রেস তার নিজস্ব সুটকেস থেকে বার করে সুখময়ের দিকে এগিয়ে দিল।

এই ধরনের স্ট্রাইপ্‌ড্ পাজামার রঙিন ছবি সুখময় অনেকবার মেয়েদের ম্যাগাজিনে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে দেখেছে। রঙিন বিজ্ঞাপনে শোবার ঘরগুলো হয়ে ওঠে স্বপ্নময়। কত মাথা খাটিয়ে কত অনুসন্ধান করে, প্রত্যেকটি

জিনিস যেখানে রাখবার সেখানে রেখে বিশেষজ্ঞ চিত্রকাররা মহামূল্যবান ক্যামেরায় এইসব ছবি তুলে নেন। ইমপোর্টেড বিজ্ঞাপনী ক্যামেরা যেকোনো অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে অতি সহজে। যেখানে টিভি থাকবার কথা ঠিক সেখানে টিভি। যেখানে বই সাজানো থাকবার কথা সেখানে ঝকঝকে একসেট বই, যেখানে রঙিন ল্যাম্পশেড থাকবার কথা সেখানে ল্যাম্পশেড, বালিশের খোল, বিছানার চাদরের ডিজাইন, মিনারেল ওয়াটারের বোতল এবং নায়ক নায়িকার হাল্কা শরীর, হাল্কা শরীর ঘিরে ততোধিক হাল্কা বেশবাস সব একই সঙ্গে একই ছবিতে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞাপনের ছবি দেখে আজকাল প্রথমে বোঝা যায় না, কিসের বিজ্ঞাপন—চাদর কোম্পানির? না পর্দা কোম্পানির? না টিভি কোম্পানির? না সিগারেট কোম্পানির? না চুলের খুস্কির ওষুধ কোম্পানির? না নিছক মাথাধরাবোধক ট্যাবলেটের? ঠিক মতন হিসেব রাখলে, অন্তত ষাট-সত্তরটা প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন হতে পারে এই একই ছবি। কারণ আধুনিক জীবনের সব প্রত্যাশার, সব প্রাপ্তির, সব অপ্রাপ্তির, সব ভ্রান্তির, সব পরিণতির এবং সব অপরিণতির ছায়া একত্রিত করেই তৈরি হয় একালের বেডরুম—দিনের শেষে ঘুমের দেশে পাড়ি দেবার শেষ তরণী। তাই বেডরুম সাজাতে নায়ক নায়িকার কোনো কার্পণ্য নেই।

সুখময়ের মনে পড়লো, মেয়েদের ম্যাগাজিনে এক সময় পুরুষের সব নাইট ড্রেসের ছবিতে সে মোটামোটা স্ট্রাইপ দেখেছে। এর কারণ কি তা খোঁজ করে দেখলে মন্দ হতো, না। কিন্তু তখন সুখময়ের ছেলেমানুষী কমছে, সংসারের গরম ঠাণ্ডা ঘটনার বৃষ্টিতে সে আগের তুলনায় অনেক প্র্যাকটিকাল হয়ে উঠছে। যার অনুসন্ধান করে লাভজনক কিছু পাওয়া যাবে না তাতে সময় ব্যয় করা যে দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নয় তা সুখময় বুঝতে শিখেছে।

কিন্তু তখনও নোঙর করার সময় আসেনি, কাছি দিয়ে জীবনতরণীকে কোনো গাছে শক্ত করে বেঁধে ফেলার সময়ও নয়। তখন সবেমাত্র নতুন

পালে নতুন হাওয়া লেগেছে সুখময়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনোরকম তোয়াক্কা না করে।

ইরাবতী সেই অবস্থায় সুখময়ের দিকে ওই শাদার ওপর হাল্কা নীল স্ট্রাইপ দেওয়া নাইট সুট এগিয়ে দিল। খুব চেনা-চেনা মনে হলো সুখময়ের, কিন্তু কোথায় দেখেছে স্মরণে আসছে না? কোনো বিজ্ঞাপনে? না অন্য কোথায়?

ও-বিষয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে সুখময় সদ্য উপহার পাওয়া পাজামা পরে ফেলেছে। তারপর সে শুয়ে পড়েছে বৈঠকখানার চিলতে ঘরের ছোট তক্তপোশে যা রাবীন্দ্রিক স্টাইলে দিনের বেলায় ডিভানের এবং রাত্রে অতিথির বেডের কাজ করে।

এই যে মানুষটা বাইরের ঘরে হাল্কা বেডটাকে শিলিং ফ্যানের কাছাকাছি টেনে এনে শুয়ে পড়বার ব্যবস্থা করছে সে অবশ্য এ বাড়ির অতিথি নয়। মাননীয়া অতিথিকে গর্ভগৃহে স্থান দিয়ে গৃহস্বামী কোনো শক্তিমানের বিশেষ খেয়ালে নিজ গৃহে অতিথির স্থান দখল করেছে। তখনও পরে কি ঘটবে অতশত বোঝা যায়নি। সুখময় তখনও স্রেফ কর্তব্য করার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। সেই সময় কেউ যদি লক্ষ্য করে থাকে যে তার রাতে পরবার পাঞ্জাবিটা বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে উঠেছে তাহলে দোষ দেওয়া যায় না। বাসাংসি জীর্ণানি এটসেটরা মন্ত্র দেহের ক্ষেত্রে কেউ প্রয়োগ করতে চায় না, কিন্তু জীর্ণ শরীরেও যে জীর্ণ বস্ত্র মানায় না তা কারও অজানা নয়।

সেদিন ইরাবতীর দেওয়া উপহারের তাৎপর্য সুখময় প্রথমে বুঝতে পারেনি। বাস জীর্ণ হয়েছে, পরিবর্তনের উপাদান সামনে রাখা হয়েছে, এরপর আর কি প্রশ্ন থাকতে পারে?

জামাকাপড়ে রং দেখা হয়, বুনন দেখা হয়, সেলাই দেখা হয়, কিন্তু ইতিহাস দেখার প্রশ্ন তো ওঠে না। সুতরাং সেবার রাত্রে সুখময় সরল মনেই নাইট ড্রেসটা পরেই শুয়ে পড়েছিল।

ঘুমোতে অবশ্য একটু দেরি হয়েছিল, হাতের গোড়ায় রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য লাটু মহারাজের জীবনচরিত একটা পড়েছিল। অদ্ভুত মানুষ, অদ্ভুত

জীবন, পোশাকি নামটাও স্বামী অদ্ভুতানন্দ।

পাশের ঘরে ইরাবতী একটু আগেই ঢুকে পড়েছে, শোবার আগে সে সাবধানে দেখে নিয়েছে ভিতর থেকে ঘরের ছিটকিনিটা বন্ধ হচ্ছে কিনা। প্রথম কয়েক দিন দরজার ছিটকিনি নিয়ে সামান্য ধ্বস্তাধ্বস্তি ছিল, সুখময় নিজেই তখন সাহায্য করেছিল ইরাবতীকে। অনেকদিন এই বাড়িতে বেডরুমে ছিটকিনি লাগানোর রেওয়াজ ছিল না, তাই সাধারণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো তেমন সজাগ এবং সদাপ্রস্তুত নেই।

সদাপ্রস্তুত কথাটার বাংলা ইরাবতী ঠিক বুঝতে পারেনি, আসলে চালু বাংলাটা হলো 'এভারেডি', কিন্তু কথাটা কারও রেজিস্টার্ড ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সবাই বিনামূল্যে ব্যবহারের অনুমতি পাবে না। পৃথিবীর সব শব্দে মানুষের এখন আর সমান অধিকার নেই। বহু শব্দই বিজ্ঞাপনী প্রয়োজনে বণিকদের ট্রেডনেম হয়ে যাচ্ছে।

সুখময় অন্যদিনের তুলনায় একটু দেরিতেই ইরাবতীর কাছ থেকে পাওয়া ওই স্ট্রাইপ দেওয়া রাতপোশাক পরেছিল। পোশাকটা বেশ নরম। নতুন বেশবাসে আগে একটা খড়খড়ে ভাব থাকত। আজকাল সবায়ের মধ্যে এক বেয়াড়া পবস্পর বিরোধী প্রত্যাশা—নতুন হবে অথচ নতুনের আচরণ চলবে না, যেন তোমাতে আমাতে কতদিনের আদানপ্রদান এবং পরিচয়।

তবু ওই স্ট্রাইপের স্মৃতিটা ঘুরে ফিরে রাতে সুখময়ের মনের মধ্যে আসছে ভাবনাটা কিছুতেই তাড়ানো যাচ্ছে না। ড্রেসটায় যেন একটু চেনা চেনা ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

এবার হঠাৎ পুরনো কিছু স্মৃতি চুপিচুপি মাথা চাড়া দিয়ে সুখময়ের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সেবার সেই সাতসকালে রমিত সেনগুপ্তর বার্ডওয়ান রোডের বাড়িতে হাজির হওয়া ; সুখময় মুখার্জি তখন বিপন্ন এবং সাহায্যপ্রার্থী। শনিবার সকাল আটটাতেই পাকড়ানো দরকার ছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপ রমিত সেনগুপ্তকে। সুখময় অবশ্য জানতো না, উইকএন্ডে বড় কোম্পানির বড় অফিসারদের ঘড়িগুলোকে ঢালাও ছুটি দেওয়া হয়।

সহসা

সময়কে সেলাম ঠুকে সারা সপ্তাহ চালানোর পরে শনিবারে সময়ানুবর্তি হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে থাকে না পদস্থ অথবা উঠতি অফিসারদের। সোমবারের সকালে কিন্তু এঁরা আবার অন্য মানুষ, তখন মনে হয়, ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী চলবার জন্যেই যেন এঁদের জন্ম হয়েছে।

দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতায় রমিত সেনগুপ্তর বার্ডওয়ান রোডের ফ্ল্যাটে ঢুকেই সেবার সুখময় বুঝেছিল, এ-পাড়ায় এখনো ভোর হয়নি। শনি রবিবার দশটার আগে সায়েবপাড়ায় সকাল হয় না, যদি না রয়াল অথবা টলি ক্লাবে সায়েবের কোনো গল্‌ফের টাইম বুকিং থাকে।

ভুল বুঝে, ড্রইং রুম থেকেই চলে যাবার কথা ভাবছিল লজ্জিত সুখময়। কিন্তু ওঁদের কাজের লোকটি শুনল না। সে বললো, "বউদি স্নানে ঢুকেছেন, দাদার চায়ের জল গরম হচ্ছে। চায়ের অর্ডার দিয়েই দাদা সকালবেলায় অধৈর্য হয়ে ওঠেন, এক মিনিটও অপেক্ষা করতে চান না। তাই দাদার চায়ের জল গরম হতে থাকে সকাল পৌনে-আটটা থেকে।"

এরপরে কাজের লোকটি ভিতরে গিয়ে গৃহস্বামীকে কী খবর দিয়েছিল তা সুখময়ের জানা নেই। তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিস্টার রমিত সেনগুপ্ত রাতের বেশবাস পরিবর্তন না করেই ড্রইংরুমে হাজির হয়েছিলেন।

এতবড় অফিসারের ঘুম এমন অসময়ে বিনা নোটিশে ভাঙানো! কিন্তু মোটেই রাগ করলেন না উদার হৃদয় রমিত সেনগুপ্ত, বরং সুখময়কে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্যে ক্ষমা চাইলেন।

সুখময়ও বারবার ক্ষমা চাইলো এই অসময়ে আকাট গদ্যের মতন

হাজির হবার জন্যে। তারপর মিস্টার রমিত সেনগুপ্ত অতিথিকে যা বলার তা বললেন, "সব শুনেছি, সব মনে আছে। আপনি চিন্তা করবেন না, নিরাশ হবেন না।" কিন্তু সে তো অন্য এক গল্প, মস্ত এক গল্প যা সুখময় থেকে শুরু হয়ে প্রথমে সহসা রায়চৌধুরীর কাছে পৌঁছল, তারপর সহসা থেকে মোড় নিয়ে রমিত সেনগুপ্ত ; কিন্তু সেখানেও ইতি নয় ; গল্পটা সোজা ঢুকে পড়েছে ইরাবতী সেনগুপ্তর জীবনে। সেখানেও কিন্তু গল্প শেষ হয়নি। সুখময়, গল্পটা তো তোমার কাছেই আবার ফিরে এসেছে, তুমি তো এই গল্পে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়েছ!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই রাত্রে পাম অ্যাভিনিউতে নিজের বসবার ঘরে সিঙ্গল তক্তপোশে পাশ ফিরতে গিয়ে বার্ডওয়ান রোডের দৃশ্যটা সুখময়ের বেশ মনে পড়ে গিয়েছিল। হাতের গোড়ায় আয়না নেই সুখময়ের। এ বাড়ির একমাত্র আয়না যে-ঘরে রয়েছে সেখানে ইরাবতী সেনগুপ্ত নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদে শুয়ে আছে ভিতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ করে।

সামনে আয়না থাকলে এই মুহূর্তে সুখময় চিনতে পারত স্ট্রাইপ দেওয়া যে রাত্রিবাসটা তার অঙ্গে শোভা পাচ্ছে ঠিক সেরকম একটা স্ট্রাইপ দেওয়া নাইটড্রেস পরেই রমিত সেনগুপ্ত বার্ডওয়ান রোডে ভোর আটটার সময় একদিন সুখময়ের সঙ্গে সৌজন্যের আদানপ্রদান করেছিলেন। মোটেই ভুল হচ্ছে না সুখময়ের।

রমিত সেনগুপ্ত মানুষটি প্রথমশ্রেণীর ভদ্রলোক। সেদিন সুখময়কে বলেছিলেন, "কি মিস্টার মুখার্জি, বারবার ক্ষমা চেয়ে কেন লজ্জা দিচ্ছেন? আমারও প্রয়োজন হলে অবশ্যই যেতাম আপনার বাড়ি, আমি কেমন করে জানবো শনিবারে সকাল আটটা মানে কোনো কোনো লোকের রাত সাড়ে-তিনটে—কলকাতায় থেকেও কত লোক যে বিলেতের গ্রীনউইচ টাইম মেনটেন করেন ভাবলে অবাক হতে হয়।"

বার্ডওয়ান রোডের ফ্ল্যাটে বসে তবু বেশ লজ্জা লাগছিল সুখময়ের। পৃথিবীর সব দেশে কৃপাপ্রার্থীদের জন্যে সৌজন্যের নিয়মকানুন বিশেষ

কঠোর। যাঁর কাছে আবেদন নিবেদন তাঁর পদতলে প্রত্যাশার অনেক বেশি বিনয় নিবেদন না করলে উদ্দেশ্য ভণ্ডুল হতে পারে। সংসার অভিজ্ঞ সুখময়ের কাছে এসব তো অজানা থাকা উচিত নয়।

এইখানেই রমিত সেনগুপ্ত কিন্তু তাঁর উষ্ণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "আরে মশাই, রাখুন আপনার পোশাকি ভদ্রতা! অনেক সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, খান এককাপ চা, সহসা নিজে আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। আমার ডিপার্টমেন্টে সহসা একজন ভেরি ভেরি ইমপর্টান্ট ফাইটার। সে আপনার সম্বন্ধে খুবই ইন্টারেস্টেড। বেচারা সারাক্ষণ চিন্তা করছে আপনার সম্বন্ধে।"

শেষের কথাগুলো রমিত সেনগুপ্ত বোধ হয় ভদ্রতা করে ব্যবহার করেছিলেন—আসলে সহসা তখন সুখময় সম্বন্ধে বেশ সহানুভূতিপ্রবণ সেই জন্যই বোধ হয় একটু চিন্তিত। ইংরিজি ইন্টারেস্টেড কথাটার যে কত রকম উল্টোসোজা মানে হয়।

এরপরে হা-হা করে হেসেছিলেন বার্ডওয়ান রোডের বাসিন্দা বিলিতি কোম্পানির এগজিকিউটিভ রমিত সেনগুপ্ত। "আরও সারপ্রাইজ পয়েন্ট আছে, সুখময়বাবু। আপনি মুখ খুলে বলেননি, কিন্তু এ বাড়িতেই আর একজন পাওয়ারফুল পার্সোনালিটি প্রতিষ্ঠিতা হয়ে আছেন যিনি আপনাকে চেনেন। আপনাদেরই সঙ্গে পড়েছেন। আমার স্ত্রী ইরাবতী। কলেজে ইরাবতী সেন ছিল, বিয়ে করেও আমি আদি-টাইটেলটা কেড়ে নিইনি, বরং গুপ্ত শব্দটা যোগ করে দিয়ে তাঁর গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছি।"

ইরাবতী! ইরাবতী! কলেজ জীবনের ইরাবতী ওর ডাকনাম যে টুকটুকি তা কোনো অজ্ঞাত পথে ছাত্রমহলে চাউর হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সেদিন বার্ডওয়ান রোডের নিবাসে ইরাবতীর সঙ্গে সুখময়ের সাক্ষাৎ হয়নি।

রমিতই অতিথিকে জানালেন, "ইরাবতী এখন উইক-এন্ড ইয়োগিক একসারসাইজ করছে বাথরুমে। তারপর গরম জলে স্নান সারবে। তারপর শনিবারের কী একটা স্পেশাল পুজোয় বসবে। এই চেনে কোনো ব্রেক

হবার উপায় নেই। নো কথাবার্তা, নো খবরের কাগজ পাঠ, নট ইভ্‌ন টেলিফোন। দেবতারা আজকাল মেয়েদের আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ভীষণ স্ট্রিক্ট—পুজোর সময় পান থেকে চুন খসলে ওঁরা বেঁকে বসতে পারেন। আচার, আচার, জানেন সুখময়বাবু, এই রিচুয়ালগুলোই আমাদের নিষ্ঠাবতী মেয়েদের যুগযুগ ধরে পুজোর ঘরে কখনও ব্যতিব্যস্ত, কখনও বন্দিনী করে রেখেছে। আপনি কিন্তু এ-ব্যাপারে রাগ করতে পারবেন না, আচারের একটা অদৃশ্য পরিকাঠামো এখনও খাড়া হয়ে আছে বলেই আমাদের এই সমাজটা এখনও কোলাপ্‌স করেনি। আমাদের মেয়েরা এখনও সনাতন রিচুয়ালগুলো সিরিয়াসলি নিচ্ছে বলেই পুরুষরা এখনও সনাতন সিস্টেমটাকে অসম্মান করতে সাহস পাচ্ছে না। এই ভাবেই ধর্মগুলো, বিশেষ করে হিন্দু ধর্ম বেঁচে রয়েছে, বাইরের কোনো শাসন ছাড়া।"

জোরে হেসেছিলেন রমিত সেনগুপ্ত। তারপর বলেছিলেন, "সুখময়বাবু আপনি নিজেও তো লেখেনটেখেন শুনেছি। আপনি আশা করি ভুল বুঝবেন না, কেন আপনাব সহপাঠিনী নিজের বাড়িতে আপনাকে পেয়েও আপনার সঙ্গে দেখা করলো না। আমাদের দেবতারা নিষ্ঠার এবং নিয়মকানুনের বেজায় ভক্ত। নট্ এ ব্যাড থিং! কী বলেন?"

এতরাত্রে নাইটড্রেস পরেই বিছানায় উঠে বসেছে সুখময়। রাতপোশাকটা কার শ্রীঅঙ্গে এতোদিন শোভা পেয়েছে তা এতোক্ষণে ভালভাবে বুঝে নিয়েছে সুখময়।

জামাটা চিনতে পেরে হঠাৎ একটু অস্বস্তি বোধ করছে সুখময়। কিন্তু আর ভাবনা না বাড়িয়ে সুখময় এবার আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর কখন যে সুখময় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলো, ওই স্ট্রাইপ দেওয়া নাইটড্রেসটাই সত্য, আর সব কিছু মায়া, কিংবা মোহ। জামাটা সময়কে অবজ্ঞা করে সবসময় অপরিবর্তিত থাকছে, শুধু জামার ভিতরের মানুষটা সময়ের

খেয়াল অনুযায়ী পাল্টে যাচ্ছে। কখনও রমিত সেনগুপ্ত নামে একটা চেনা লোক ওই পরিচ্ছেদে আশ্রয় নিয়েছে, আবার কখনও একজন সুখময় মুখোপাধ্যায় সেখানে প্রবেশ করেছে যাকে চিনেও যেন চেনা হয়নি সুখময়ের। স্বপ্নের মধ্যেই হঠাৎ কে যেন সুখময়কে বলছে, গীতার ওই বাসাংসি জীর্ণানি বক্তব্যটাই ভুল—বাস জীর্ণ হয় না, আত্মসুখের সন্ধানে খেয়ালী আত্মাই সুযোগ বুঝে বাস পরিবর্তন করে।

ঘুম আসতে দেরি হওয়ার জন্যই বোধ হয় সুখময়ের ঘুম ভাঙতে সেবার দেবি হয়ে গিয়েছিল।

এর মধ্যে ইরাবতী কখন তার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে। দৈনন্দিন দেহচর্চা শেষ করে সে স্নান সেরে নিয়েছে, দৈনন্দিন প্রাত্যহিকও ভোলেনি। তারপব বাইরে এসে এ সংসারের অতিথি ইরাবতী কয়েকবার দেখে গিয়েছে নীল স্ট্রাইপ দেওয়া নাইটসুটের ভিতরে বন্দি এবং গভীর ঘুমে অচেতন সুখময়কে।

রান্নাঘরে আওয়াজ হয়েছিল একটু। কাজের মেয়েটি সময়মতোই ডিউটিতে এসে গিয়েছে। এরপর ধড়মড় করে উঠে পড়েছে সুখময়।

প্রথমেই ইরাবতীর কাছে সুখময় ক্ষমা চেয়েছে। সুখময় জানে ভোরবেলায় ইরাবতী বিছানায় শুয়ে একপাত্র গরম চা পছন্দ করে। সকালের চা তৈরি করতে সুখময় মোটেই অনভ্যস্ত নয়। বরং বহুদিন একলা থেকে থেকে সংসারকর্মে সে অন্য অনেক পুরুষের তুলনায় বেশ পটু হয়ে উঠেছে।

স্ট্রাইপ রাতপোশাকের নতুন মালিককে ইরাবতী আজ কী ভেবে চা

করতে দিল না। প্রায় জোর করেই রান্নাঘরে ঢুকে ইরাবতী সকালের কাজগুলো ঝটপট সেরে ফেললো। তারপর দু'কাপ ধূমায়িত চা হাতে করে বাইরের ঘরে ঢুকে সুখময়ের সিঙ্গল বেডের সামনে বসে পড়ল। ইরাবতী সুখময়ের রাতের জামাটা আবার খুঁটিয়ে দেখেছে। এই জামাটা এতদিন তার সুটকেসেই সযত্নে সুরক্ষিত ছিল। যার জামা সে হঠাৎ কখন হাজির হয় তার ঠিক নেই ; সে ফিরে এলে দেখতো ইরাবতী প্রস্তুত ; সারাক্ষণ তাকে অধীরভাবে ফিরে পাবার জন্য তৈরি সে। ইরাবতীর মনে পড়ছে, যে-মানুষটি প্রতিরাত্রে এই জামার মধ্যে প্রবেশ করে নিত্য শয্যাসঙ্গী হতো সে ঘুম থেকে উঠেই গরম চায়ের জন্য অধৈর্য হয়ে উঠতো।

ব্যাচেলর সুখময় এতোদিন অন্যভাবে জীবন অতিবাহিত করেছে। শুধু একক জীবনের স্বাধীনতা নয়, তার সব কিছুই দ্বিতীয় কোনো মানুষের দৃষ্টির বাইরে। কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না বুঝলে সব মানুষ আচমকা অনেকটা স্বাধীন হয়ে যায়, অনেক বাধাবন্ধন চুকে যায় মুহূর্তের মধ্যে। দীর্ঘদিন একক জীবনযাপনের পরে তাই মানুষ সংসারী হতে ভয় পায়। মানব-মানবীর যুগলজীবনের প্রথম কথাই হলো ব্যক্তিগত প্রাইভেসির চির অবসান ; নিজেকে নানাভাবে অডিটরের সামনে মেলে ধরবার জন্যে সারাক্ষণের প্রস্তুতি। যুগলজীবনকে স্বীকৃতি দেওয়ার মানেই তো এককজীবনের বিসর্জন—যদি-না কোনো উপায়ে নিজেকে কিছুটা লুকিয়ে রাখার সুযোগ করে নেওয়া যায়।

যখন সুখময় ক্ষণিকের অতিথি ইরাবতীর স্বেচ্ছা উৎসাহে তৈরি চা খেয়েছে তখন ইরাবতী মাঝে মাঝেই নতুন মানুষটির শরীরে জড়ানো স্ট্রাইপ দেওয়া পুরনো নাইটড্রেসের দিকে তাকিয়েছে। সেই মুহূর্তেই কি ইরাবতীর মনে অন্য ভাবনার প্রথম উদয় হলো? কে জানে! মন বড় জটিল ব্যাপার। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞদের যত জিজ্ঞাসা করা যাবে তত রকমের মতামত পাওয়া যাবে।

আর সহসা রায়চৌধুরী? না ঐবিষয়ে ইরাবতীকে কোনো প্রশ্ন করবার প্রবৃত্তি এই মুহূর্তে সুখময়ের নেই।

আসলে সিংগল সুখময়ের একক জীবনটা খুব সহজ ছিল, একেবারে সরল রেখার মতন, আচমকা বাঁকটাক তেমন কোথাও নেই, যে-কোনো জায়গা এবং যে-কোনো দূরত্ব থেকে সুখময় মুখার্জিকে মাপজোক করার কিংবা বোঝবার কোনো অসুবিধে নেই।

সুখময় নিজে তো কামনাবাসনার আঁকাবাঁকা আল ধরে এগোতে এগোতে কখনও শর্টকাট নেবার জন্যে তেমন উৎসাহী হয়নি।

সুখময় মুখার্জির মধ্যে খ্যাতনামা হবার, কীর্তিমান হবার, অথবা প্রশংসনীয় হবার তেমন কোনো বাসনা কিংবা পরিকল্পনা কখনও প্রবলভাবে উপস্থিত ছিল না।

ওই যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন জন্মালি তো দাগ রেখে যা, কথাটা সুখময় ইস্কুল-জীবনেও পড়েছে। ক্লাসের শিক্ষক হরিকিঙ্করবাবু ছাত্রদেরও প্রশ্ন করেছেন, তোমরা আমাকে বলো কে কীভাবে জগৎসংসারে দাগ রাখতে চাও।

সুখময় তখনই সোজাসুজি মন্তব্য করেছে, "দাগ কাটলেও তা মিলিয়ে যায়, স্যার। যেমন জলের মধ্যে দাগ, কাটতে কাটতেই হারিয়ে যায়।"

সুখময় মুখার্জি স্মরণীয় হবার হাঙ্গামায় যেতে চায় না। জন্ম যখন হয়েছে তখন জীবনটা কোনোক্রমে কাটাতেই হবে। হয় বেড়ালছানার মনোবৃত্তি নিয়ে, না হয় বাঁদরছানার মানসিকতা অবলম্বন করে। অসহায় বাঁদরছানা অবস্থা বুঝে মাকে আঁকড়ে ধরে, বেড়ালছানা অতশত ভাবে না, তার সব দায়দায়িত্ব মায়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে সে নিশ্চিন্তে মিউ মিউ করে। ব্যাপারটা বুঝে মা নিজেই তার ঘাড়ে কামড় ধরে যেখানে নিয়ে যাবার সেখানে নিয়ে যায়।

সুখময় কম বয়েসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড়েছে। লীলাপ্রসঙ্গও সে শেষ করেছে। ফলে দক্ষিণেশ্বরের ক্ষ্যাপা ঠাকুরই তার একান্ত কাছের লোক। কর্মে বীর হওয়ার চেয়ে ধর্মে ধীর হওয়াটাই তার কাছে অনেক যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে।

সুখময় পড়েছে, কর্মে বীর হতে যাওয়া মানেই খাল কেটে হাঙর

হাঙ্গামার কুমীরকে নিজের জীবনে ডেকে আনা। দুনিয়ার ঝঞ্ঝাট নিজের ঝাঁকায় তুলে নিয়ে নিরন্তর বয়ে বেড়ানো এবং গলদঘর্ম হওয়া। সেইসঙ্গে বিবেকানন্দর মতন নিজেকে অহরহ মনে করিয়ে দেওয়া—এহি করেঙ্গা, ওহি করেঙ্গা, নিজের মুক্তি হোক-না হোক পরের মুক্তির জন্যেই নিজেকে নিঃশেষ করাটাই আমার ব্রত।

অমন মহাশক্তির আধার হয়ে জীবনসন্ধ্যায় স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি তো স্বীকার করেছেন, খ্যাতিমান হতে চাননি তিনি কখনও, ব্যাপারটা তাঁর ঘাড়ে চেপে গিয়েছিল পরিস্থিতি ও সময়ের পাকেচক্রে। খ্যাতির পিপাসা অনেকটা মরুতৃষার মতন, বড়ই দুরারোগ্য ব্যাধি, তিলে তিলে মানুষকে ক্ষয় করে ফেলে, বাঁচবার কোনো পথ থাকে না।

হরিকিঙ্করবাবু ক্লাসের বাইরে সুখময়কে বলেছেন, "বুঝেছি স্বামী বিবেকানন্দ নন, শ্রীরামকৃষ্ণই তোমার হিরো, ডাকাত পড়া ভাবটা তোমার মনের মধ্যে নেই! তা দেখো, তাতে কিছু এসে যায় না। ঠাকুর তো নিজের হাতে কাউকে সন্ন্যাসী পর্যন্ত করলেন না, কাউকে রিলিফ মিশন চালাবার মতলবও দিলেন না, একটা পাবলিক বক্তৃতাও দিলেন না, জাতির উদ্দেশে এক লাইন বক্তব্যও রাখলেন না, তবু তার নাম নিয়ে এখন কত কি হচ্ছে এবং আরও কত কি হবে! তোমরা দেখবে।"

"সোজা পথ ধরে ঠিকানায় পৌঁছতে সময় অনেক কম লাগে," এই কথাটি ঠাকুরই বোধ হয় কোথাও বলেছেন, হরিকিঙ্করবাবুর মুখে সুখময় সেই স্কুল-জীবনে শুনেছিল। পরে অনেক খুঁজেছে, উদ্ধৃতিটির সন্ধান করতে পারেনি।

সুখময় আন্দাজ করে নিয়েছিল, মানুষকে একদিন-না-একদিন তার ভাগ্যদেবতার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়তে হবে। সোজাপথ ধরলে পৌঁছতে সময় কম লাগবে।

তাই তো কোনোরকমে ইস্কুল-কলেজের পাট চুকনো, কোনো রকমে একটা প্রাণধারণের উপযোগী চাকরি জোগাড় করে ফেলা, কলকাতায়

কোনোরকমে মাথা গোঁজবার মতন একটা ছোট্ট বাসস্থান ভাড়া নেওয়া, পরের ওপর কোনো ব্যাপারেই তেমন নির্ভরশীল না হওয়া এবং যেন তেন প্রকারেণ জীবনকে সোজা রাস্তায় চলমান রাখা যাতে আঁকাবাঁকা গলির গোলকধাঁধায় ঢুকে পথ হারিয়ে না যায়।

কিন্তু ইতিমধ্যে পাকেচক্রে সুখময়ের চোখের সামনে, তার প্রত্যাশার বাইরে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে কত কি ঘটতে শুরু করল। কলেজের পুনর্মিলন উৎসবে বন্ধুদের গৃহিণীরা যে বিরক্তভাবেই সুখময়ের দিকে তাকাচ্ছিল তা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি সুখময়ের। ভাগ্যে ইরাবতী ওখানে উপস্থিত ছিল না। অবশ্য অরিন্দম, সুনন্দা, সীমারেখা এরা প্রত্যেকে একাই একশ! এরা প্রবল উদ্দীপনায় ইরাবতী-সুখময়ের অবৈধ জীবনের বুলেটিন প্রচার শুরু করলে বিশ্বসংসারে কারও কিছুই অজ্ঞাত থাকবে না।

ঘড়ির কাঁটা এরপর সোজা পথ ধরেই অনেকটা এগিয়েছে। শয়ন ঘরের স্তিমিত আলোকে বেশ বোঝা যাচ্ছে সত্যিই কারও জন্যে অপেক্ষা করে থাকার মানসিকতা সময়ের নেই।

আসলে এই সময়েরই অপর নাম মহাকাল, যার শুরুও নেই শেষও নেই। অথবা থাকলেও তা মানুষের বুদ্ধির বাইরে। পুরোটা মেপে দেখার ক্ষমতা নেই বলেই, সীমাহীনকে খণ্ড খণ্ড করে সীমায়িত করার চেষ্টা চলেছে যুগ যুগ ধরে।

মূল শয়নকক্ষে ঘুমিয়ে থাকা যুবতী রমণীটির দিকে কোনো রকম বিশেষ দৃষ্টি না দিয়েই ঘড়িটা নিজেই সীমাহীন পথের যাত্রী হয়েছে।

এতো রাত। তবু কেন ঘুম নেই? এক-এক দিন মনের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে

সুখময় মুখার্জির। অথচ আগে এমন হতো না। ইচ্ছে করলেই কত সহজে ঘুমিয়ে পড়তে পারতো সুখময়। সুখময় তখন ভাবতো, সোজাপথে সময় একটু কম তো লাগবেই। যারা ব্যস্ত হয়ে আঁকাবাঁকা আল ধরেছে তাদের ঘুম আসবে কী করে?

ঘুমের ঘোরে ইরাবতী পাশ ফিরলো। তার মুখটা এতোক্ষণ দ্বিতীয় বেডের উল্টোদিকে ছিল, এখন তার বিশিষ্ট অতিথিকে সোজাসুজি দেখতে পাচ্ছে নিজের বিছানা থেকে সুখময়।

ঘুমের মধ্যেও ইরাবতী আঁচলটা মাঝে মাঝে টেনে নিচ্ছে বুকের কাছে। এইটাই মেয়েদের স্বভাব বোধ হয়। আর কোনো মেয়েকে এতো কাছ থেকে এইভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখবার সুযোগ তো সুখময় মুখার্জি তার এই চৌত্রিশ বছরের জীবনে কখনও পায়নি। কাউকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পাবাব কথাও মনে তেমনভাবে আনেনি সুখময়। দ্বৈতজীবনের হাজার হাঙ্গামা, কয়েকটা সহজ লোভনীয় আকর্ষণের জন্যে বড় বেশি মূল্য দিতে হয় মানুষকে।

বাড়ি থেকে যে সুখময়েব ওপব চাপ আসেনি তা ঠিক নয়। তার মা বাববার এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। মানি অর্ডার প্রাপ্তির চিঠি দিয়ে মা লিখেছেন, "খোকা, এই বয়সে তোমার উপার্জিত অর্থপ্রাপ্তিই আমার কাছে সব নয়। আমি অবশ্যই তোমাকে সংসারী এবং সুখী দেখে যেতে চাই। তুমি যে ঠাকুরের কথা নিত্য স্মরণ করো, তিনিও তো বলেছেন, সংসাররূপ দুর্গে বসবাস করেই গৃহী মানুষ মোক্ষের সন্ধান করতে পারে।"

দুর্গে বসবাস করে সমস্ত বিপদ আপদের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষের সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনব চিন্তা বটে! গৃহীর ভূমিকাকে তিনি কোনো অংশেই ছোট করতে চাননি। আর কেনই বা করবেন? তিনি নিজেও তো চাকরি করেছেন, মাইনে নিয়েছেন, পেন্সন ভোগ করেছেন, দাম্পত্য বন্ধনে নিজেকে বন্দি করেও মুক্ত রেখেছেন, আবার সুযোগ বুঝে এবং

প্রয়োজনবোধে যোগ্য মানুষের কানে বৈরাগ্যের মন্ত্র প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। সন্ন্যাসের পথ অবশ্যই দুর্গম, কিন্তু গৃহী হয়েও সন্ন্যাসশিখরে আরোহণ করে আকাশ ও পৃথিবী দুইকে শাসন করবার দুঃসাহসও দেখিয়েছেন কেউ কেউ। তার ফলে পৃথিবীতে অনেক কাণ্ড ঘটেছে এবং বোধ হয় আরও ঘটবে।

কিন্তু সুখময়, তুমি সুবিবেচনার কাজ করেছ! মায়ের কথা শুনে ভাগ্যে ভাল ছেলের মতন সুড়সুড় করে ছাঁদনাতলায় হাজির হয়ে মালা বদলের প্রস্তুতি নাওনি। তাহলে এখনকার এই ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর রূপ নিতো। প্রিয় সুখময়, এতোদিনে তুমি কোথায় তলিয়ে যেতে তা ভেবে দেখেছো?

কিন্তু সেই পথটাই তো সোজা হতো। তা হলে আর যাই হোক এই মুহূর্তে একই ঘরে আরেকটা আলাদা সিংগলখাটে কলেজের বান্ধবী ইরাবতী সেন এইভাবে ঘুমিয়ে থাকবার সুযোগ পেতো না। অথবা তেমন অবস্থার সৃষ্টি হতো না।

সুখময় যদি মাতৃনির্দেশে যথাসময়ে সংসারী হতো তা হলে ইরাবতীর কী অবস্থা হতো সে নিয়ে মাথা ঘামাবার অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে সুখময় মুখার্জি? পৃথিবীতে কত মেয়ে রয়েছে, কত তাদের সমস্যা, সেসব নিয়ে চিন্তা করার ইজারা কার থেকে তুমি পেলে?

সুখময়, প্লিজ, মনে রেখো, তোমার পরে নাই ভুবনের ভার। যে জগৎ-মাঝি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে বিশ্বসংসারের হাল ধরে বসে আছেন তিনিই তখন ভাবতেন ওই ইরাবতীর কথা, যে এই মুহূর্তে সমস্ত দুশ্চিন্তা বালিশের তলায় চাপা রেখে বন্ধু সুখময়কে নির্ভর করে তারই শয়নমন্দিরে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে।

সাধে কি আর বিশ্বসংসারে ঘুমকেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বলা হয়েছে। নিদ্রা না থাকলে এই মানবসংসার বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠতো। সাধে কি আর মহাকবি ও মহাদার্শনিকরা সাহস করে মৃত্যুকেও চিরনিদ্রারূপে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালিয়েছেন।

সহসা

ঘুমের যতই প্রশস্তি হোক, বোধ হয় সুখময়ের চোখে এখন আর ঘুম আসবে না। পুরনো স্মৃতির লাটাই ধরে সুতো টানা মাত্র অনেকগুলো দৃশ্য একের পর এক চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে।

কলেজ থেকে বি এ পাশ করে সুখময় আর স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় মুখো হয়নি। বিভিন্ন জায়গায় সে অবশ্য চাকরির খবরাখবর করেছে এবং শেষ পর্যন্ত একটা স্থিতি হয়েছে। সেই সময় একবার কলকাতার রবীন্দ্রসদনের সামনে সহসা রায়চৌধুরীর সঙ্গে সুখময়ের দেখা হয়ে গিয়েছিল। সহসা কলেজে থাকাকালীন বন্ধুদের সঙ্গে বেশি কথা বলত না। সেবার কিন্তু সুখময়কে দেখতে পেয়েই সহসা কেমন নির্দ্বিধায় এগিয়ে এলো।

"তুমি একটু কালো হয়ে গিয়েছ, সুখময়।" সপ্রতিভ সহসা সোজাসুজি বলেছিল। "খুব আউটডোরে ঘোরাঘুরি করছ?"

"আউটডোর নয় সহসা, বিচরণ যত্রতত্র। কলকাতায় মেসে থাকি, অতএব ভোজনম্ এবং শয়নম্ দুই হট্টমন্দিরে বলতে পারো, তবে কেরানির শরীর সব সয়ে যায়।" এবার হেসেছে সুখময়।

সহসা বলেছে, "তুমি কি শেষ পর্যন্ত সাধুসন্ন্যাসী হয়ে যাবে নাকি সুখময়? জনপ্রিয় খবরের কাগজে পর পর তোমার কয়েকটা লেখা পড়লাম, সব রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে!"

হা-হা করে হাসলো সুখময়। সহসাকে সে বললো, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এখন বেশ জনপ্রিয় সাবজেক্ট, বিশেষ করে ঠিকে লেখকদের জন্যে। সম্পাদকরা আগ্রহে রচনা নিয়ে নেন, যদিও সব সময় সেই পুরনো কাশুন্দি ঘাঁটা। রোজ রোজ তো আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নতুন কোনো তথ্য আবিষ্কার হচ্ছে না। নতুন কিছু সংবাদ প্রকাশিত হবার আশাও কম, সহসা।"

সহসার উত্তর : "অতশত জানি না, রবিবারের কাগজে তোমার ব্রাইট মুচমুচে লেখাগুলো পড়তে ভাল লাগে। ওই যে তুমি লিখেছ, মনের দুঃখে ঠাকুর একবার দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে সুইসাইডের চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের অফিসে এখবর কেউ জানতো না।"

তা হলে সহসা কি এখন কোনো অফিসে কাজ পেয়েছে! মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করা যায় না। বলা যায় না যে সহসা নিজেও আরও একটু কালো, আরও একটু লাবণ্যহীনা হয়েছে। এধরনের কথা মেয়েদের মুখ থেকে শোনা যায়, কিন্তু মেয়েদের তা ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া সবাই জেনে গিয়েছে, সুন্দর অথবা সুন্দরী থাকাটা এখন শুধু যত্নসাধ্য নয়, বেশ ব্যয়সাধ্য ব্যাপারও হয়ে উঠেছে। কোন কাগজে সুখময় পড়েছিল, সুন্দর হয়ে ওঠাটা এখন আর প্রকৃতির দয়াসাপেক্ষ নয়, দেহ সৌন্দর্য বর্তমানে বিউটি পারলারের পরিচালকের প্রফেশনাল চ্যালেঞ্জ ছাড়া আর কিছু নয়।

সুখময় হিসেবটা দেখেছে, পাতে দেবার মতন সৌন্দর্য বজায় রাখতে আজকাল প্রতি মাসে বাঙালি মেয়েদের অন্তত হাজাব টাকা প্রয়োজন, তাও জামাকাপড়ের খরচ বাদ দিয়ে। এই হাজার টাকাতেও জনতা ক্লাশে ভ্রমণ! এ-সি চেয়ার-কোচে খরচ ডবল—পায়ের চর্চা, মুখের চর্চা, হট বাথ, কোল্ড স্প্রে, একসারসাইজ, মাস্ক, মেকআপ, ওয়ার্ক-আউট কত কি গজিয়ে উঠেছে এই শহরে। ফলে যে কেউ বলে দেবে, কলকাতার সাধারণ মেয়ে আগের যুগের অ্যাভারেজ মেয়ের চেয়ে অন্তত সাড়ে বারো শতাংশ বেশি সুন্দরী হয়ে উঠেছে।

এই কাগজেই লিখেছে, এখন থেকে এই শহরে বার্ধক্য আর মেয়েদের তাড়া করতে সাহস পাবে না—মেয়েদের শাদা চুল এখন থেকে হেয়ার ড্রেসার ছাড়া অন্য কোনো মানুষ দেখতেই পাবে না।

সহসা যখন চর্চিতাসুন্দরী হয়নি, সে যখন স্রেফ বয়সের গরীমার ওপর নির্ভর করে বসে আছে, তখন বুঝতে হবে তার নিজেব রোজগার এখনও সীমিত। হয়তো এল-আই-জি, বড় জোর এম-আই-জি। মিড্‌ল ইনকাম

গ্রুপ! এই কিছুদিন আগেও বাঙালিরা যাদের মধ্যবিত্ত বলতো। এখন ওটা একটা বদনাম—খবরের কাগজের সম্পাদক এবং জেনারেল ম্যানেজার থেকে আরম্ভ করে ফিনান্স মিনিস্টার পর্যন্ত কেউ এই মধ্যবিত্তকে পছন্দ করে না, অথচ এদের সহ্য করতে হয়, কারণ সারাক্ষণ এদের মুখে চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি, যদিও এদের ক্রয়ক্ষমতা নেই। ক্রয়ক্ষমতাই যে কলিযুগের একমাত্র ক্ষমতা তা বুঝতে বাঙালিদের পুরো একটা শতাব্দী লেগে গেল।

সুখময় সম্পর্কে সহসার দুশ্চিন্তার অবসান হয়নি। বৈরাগ্যের দিকে না ছুটলে সুখময় এইভাবে এত সময় ধরে কেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমুদ্রে ডুবে রয়েছে?

সুখময় রসিকতা করলো, "এইসব গুজব তো বিবেকানন্দ-গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ সম্পর্কেও রটেছিল যখন সাতখণ্ডের ঢাউস বই লিখছেন তিনি। বৈরাগ্য তো দূরের কথা তাঁর গৃহিণী তখন পুরোদমে স্বামীর সহযোগিতা করছেন নরেন্দ্রনাথ দত্তর কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের ইতিহাস রচনা করতে। এই সংসারে, আমাদের মেয়েরা নিজেদের ক্ষতি করেও দাম্পত্য দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসে সহসা। তুমি তাকিয়ে দেখো।"

খুব হেসেছে সহসা। বলেছে, "আমার ওসব জেনে কী লাভ, সুখময়? আমি তো এমন কোনো পাগলের গলায় মালা দিচ্ছি না যে নিজের সংসার ছাড়া অন্য সব বিষয়ে মাথা ঘামাবে।"

সহসা এখন কথাবার্তায় বেশ ফ্রি হয়ে গিয়েছে। এমনভাবে যে সে একজন প্রাক্তন পুরুষ সহপাঠীর সঙ্গে রবীন্দ্রসদনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে তা আগে ছাত্রজীবনে কারও পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল না।

রবীন্দ্রসদন থেকে বেরিয়ে নন্দন প্রাঙ্গণে যেতে যেতে সহসা ও সুখময় মনের আনন্দে মুড়ি খেয়েছিল। মুড়ি কিনে দাম দেবার জন্যে সহসা ঝুলোঝুলি করেছিল। যতক্ষণ না মেয়েবান্ধবীদের দাম দেবার অধিকারটা পুরুষবন্ধুরা সহজভাবে মেনে নিচ্ছে ততক্ষণ স্ত্রী-স্বাধীনতার 'কনসেপ্ট' পুরো স্বীকৃতি পাচ্ছে না, এই হচ্ছে সহসার ধারণা।

সহসা বললো, "সুখময় অর্থনৈতিক -স্বাধীনতার তিনটে পথ মেয়েদের সামনে খোলা আছে এই শহরে—হাত দেখা, নার্স হওয়া অথবা সেক্রেটারিয়াল প্রশিক্ষণ নেওয়া।"

সহসা বলেছিল, "হাত দেখাটা সুখময় আমার পোষায় না, মনে হয় যেন ভাগ্যচক্রের কাছে আত্মসমর্পণ করে জীবন-সংগ্রামে হেরে গেলাম। নার্সিং শিখতে বেশ ধৈর্য লাগে, সময় লাগে। তাছাড়া ওখানে আজকাল বড্ড ভিড়—স্বনির্ভর হওয়ার লোভে দুনিয়ার যত বাঙালি মেয়ে নার্সিং স্কুলে ফর্ম জমা দিচ্ছে। ধরে নিলাম নার্স হতে পারলাম, কিন্তু সারাক্ষণ শারীরিক যন্ত্রণার মুখোমুখি হওয়া, রাত জেগে অনিচ্ছুক মৃত্যুপথযাত্রীদের পাহারা দেওয়া এ আমার নার্ভে নেই, স্বভাবেও নেই, সুখময়। আমি সুখের সন্ধানী, সুন্দর জিনিসের কাছাকাছি থাকতে আমি ভীষণ ভালবাসি। তাই সেক্রেটারিয়াল ট্রেনিংটাই বেস্ট মনে হলো।"

সুখময় : "হাজার রকম কাজের মধ্য দিয়ে একটা প্রাণবন্ত, সুন্দর এবং সুসভ্য পুরুষ মানুষকে সারাদিন ধরে সামলানো, এর মধ্যে অবশ্যই নাটক আছে।"

সহসা বুঝেছে, সুখময় রসিকতা করছে। উত্তর দিতে সেও কম যায় না।

"সুখময়, ব্যাপারটা অত সহজ ভেবো না—সাংসারিক কোনো যোগাযোগ নেই, অথচ লেডি সেক্রেটারির হানড্রেড পারসেন্ট সাংসারিক কর্মযোগ। তুমি জানো, যে পুরুষের হয়ে কাজ করছ তার পদোন্নতি হলে স্ত্রীর যেমন আনন্দ হয়, সেক্রেটারিরও আর একধরনের আনন্দ হয়। এই আনন্দের প্রকৃতি ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না।"

সুখময় খুশি হয়েছে। "ভারী সুন্দর বলেছ, সহসা। গল্প লেখকদের জন্যে তুমি নতুন দৃষ্টিকোণ খুলে দিলে! একটা প্রাণবন্ত মানুষকে নিদের হাতে মানুষ করা, তাকে গড়ে তোলা, তার হয়ে নিরন্তর যুদ্ধ করা, তার ব্যর্থতায় ব্যথিত হওয়া, তার সাফল্যে আনন্দ পাওয়া অবশ্যই বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কর্মকুরুক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক, অথচ কামিনী ব্যাপারটা একেবারেই উপস্থিত নেই, বড় জোর কিছু বাড়তি কাঞ্চনের প্রত্যাশা। কিন্তু

সংসারের আইনকানুন বাঁচিয়ে কর্মের আদর্শ পরিবেশ বলা যায়।”

“তুমি ঠিক ধরেছো, সুখময়। বস-এর দ্রুত প্রমোশন হলে তাঁর সেক্রেটারিও তো কিছু স্বীকৃতি পাবে। আদর্শ ম্যানেজাররা সারাক্ষণ তাঁদের কর্ম সহকারিণীর নীরব ভূমিকা স্বীকার করেন। ডোন্ট ইউ থিংক, এটা একটা বিরল এবং ওয়ান্ডারফুল রিলেশন, অভাবনীয় সম্পর্ক?”

একসময় সহসা বললো, স্টেনোগ্রাফি শিখে আমি স্বনির্ভর হয়েছি, সুখময়। সাধারণ বাঙালি মেয়েদের মতন দু'মুঠো অন্নের জন্যে আমাকে সারাক্ষণ ঠাকুরদেবতাদের ছবির সামনে মাথা খুঁড়তে হয় না।”

“জানো সুখময়, কলকাতা শহরে তো এতো বেকার সমস্যা, কয়েক লক্ষ লোক বিশ বছর ধরে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে লাইন লাগিয়ে বসে আছে, কিন্তু ভাল সেক্রেটারির এখনও জয়জয়কার! ভীষণ চাহিদা।

সহসা কাজ শিখেই কাজ পেয়েছে। প্রথম কাজটা তেমন পছন্দ হয়নি বলে আর এক কাজ নিয়েছে।

“প্রথম তিন বছরে চারটে কাজ পাল্টেছি, সুখময়। প্রত্যেকবার আমার মাইনে বেড়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে বাড়ির সামনে থেকে নিয়ে যাবার এবং পৌঁছে দেবার ফ্রি ট্রান্সপোর্ট, ফ্রি লাঞ্চ, এমন কি বাড়ির পর্দা কেনার জন্য বাৎসরিক টাকা।”

“এবার চাকরি পাল্টালে সহসা তুমি হয়তো ডিনারও ফ্রি পাবে! সেই সঙ্গে হয়তো প্রতি বছর এক ডজন শাড়ি, এয়ারলাইনসের মেয়েরা যেমন পায়।”

“রসিকতা হচ্ছে! একজন সহপাঠিনী কাজকর্ম শিখে খেটেখুটে একটু সুখের মুখ দেখছে সেটা তোমাদের ভাল লাগছে না।”

সহসা

আরও সময় কেটেছে। সুখময় শান্তিতে কাজ করছে। বেকারদের এই শহরে নিশ্চিন্তভাবে কাজ করছ, আর কী চাই? সুখময় নিজের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়, দু' একটা প্রবন্ধ লেখে, আর্ট এগজিবিশনে যায়, নন্দনে ছবি দ্যাখে। ছুটির দিনে চলে যায় গোলপার্কে ইনস্টিটিউট অফ কালচারে বক্তৃতা শুনতে কিংবা বাগবাজারে মায়ের মন্দিরে এবং ফেরার পথে বই কিনতে।

ক্যালকাটা ক্লাবের সামনে নন্দন চত্বরেই হঠাৎ আবার দেখা হয়ে গিয়েছে সহসা ও সুখময়ের। গোটা কলকাতা শহরে এইটুকুই তো ভদ্র জায়গা, যেখানে একজন মহিলা একজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে বিনা অশান্তিতে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারেন।

"কেন? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল? গড়ের মাঠ।"

সহসার মৃদু আক্রমণ : "সারাজীবন তো বেলুড়, বরানগর, কাশীপুর উদ্যানবাটি করে বেড়ালে, সুখময়! কলকাতার কয়েকটা জায়গায় তো কখনও একটু ঘুরে দেখলে না। শহরের পরিবেশ ক্রমশই খারাপ হয়ে যাচ্ছে সুখময়। একলা ঘুরলে দুষ্টলোকে জ্বালাবে, দোকলা ঘুরলেই পিছনে পুলিস লাগবে! কোনো মেয়ের পক্ষে নিজের ইচ্ছে মতো একটু ঘুরে বেড়ানোর উপায় নেই এই শহরে! মেয়েদের প্রচণ্ড ইজ্জত আছে এই শহরে যারা বলে তাদের বোন বা বউকে একবার একলা গড়ের মাঠে বা ইডেন গার্ডেনে দু' একদিন পাঠিয়ে তারপর খবর নিও।"

সহসা যাঁর কাছে কাজ করে সেই মিস্টার সেনগুপ্ত যে তাঁর সেক্রেটারির সঙ্গে এবিষয়ে সম্পূর্ণ একমত তা সুখময়ের জানা হয়ে গেল।

"আমি ওঁকে বলেছি, দ্য টেলিগ্রাফে একটা আর্টিকল লিখুন, সেই সঙ্গে কয়েকটা ফটো পাঠান। মিস্টার সেনগুপ্ত চমৎকার ইংরিজি লেখেন। যেমন সহজ ভাষা, তেমন ধারালো প্রয়োগ এবং সেইসঙ্গে ক্ষুরধার হিউমার।"

সুখময় বললো, "শুনেছি ইন্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির বড় সায়েব তপন মিত্রও ওই রকম—চমৎকার ইংরিজি লেখেন, চমৎকার ছবি তোলেন, ভাল বক্তৃতা করেন।"

প্রমোশনের খবরাখবর নিয়েছিল সুখময়। সহসা গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, "খোদ বড় সায়েবের সেক্রেটারি হয়ে কচি কচি মেয়েদেব ওপর মনের আনন্দে লাঠি ঘোরাতে আমার অনেক বছর সময় লাগবে, সুখময়। ততদিনে নির্ঘাত বুড়ি হয়ে যাব। আমার মিস্টার সেনগুপ্ত খুবই ইয়ং। আমার থেকে ধরো এই আট বছরের বড়। তোমার অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির হিরো অনেক এগিয়ে আছেন আমার সায়েবের তুলনায়।"

সহসা তোমার কত বয়স হলো? চট করে জিজ্ঞেস করা যায় না। তবে সে সহপাঠিনী—ইরাবতী, মাধবী, সহসা এরা সব একবয়সীই হবে।

সুনন্দা ব্যানার্জি তো সাহস দেখিয়ে এক ক্লাস জুনিয়র থেকে স্বামীনির্বাচন করলো। সুপ্রতীক ব্যানার্জি যে আসলে জুনিয়র নয় তা অবশ্য সুনন্দাই সুপরিকল্পিতভাবে প্রচার করেছে সহজবোধ্য কারণে। ইস্কুলে একটা বছর সুপ্রতীকের নষ্ট হয়েছে পিতৃদেবের আকস্মিক জয়পুর থেকে কলকাতায় বদলি হওয়ায়, সময় মতো ভর্তির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ সুনন্দাকে নিয়ে গালগল্প করে লাভ নেই।

মেয়েদের বয়স নিয়ে এতো চিন্তা হঠাৎ সহসার মাথায় এলো কেন? সুখময় নিজেকে জিজ্ঞেস করেছিল।

অপ্রাসঙ্গিক এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মনকে ব্যস্ত না করার উপদেশ দিয়েছিলেন সেবার স্বয়ং রমানন্দ মহারাজ। একবার শরৎ বোস রোডে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে রুগি নিয়ে গিয়েছিল সুখময়। স্বামী বমানন্দ কথায় কথায় বললেন, "মনেরও একটা ফিল্টার দরকার। সব সময়ে সব বিষয়ে মনকে অযথা খাটালে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে। ফোকাস থাকে না। দেখুন না হ্যারিকেন লণ্ঠন আর এভারেডি টর্চের মধ্যে কত তফাত! চারদিকে অকারণে বিক্ষিপ্ত হয় না বলেই তো টর্চে অত জোর আলো হয়।"

এরপরেও ঘুরে ফিরে রবীন্দ্রসদনের উদ্যানে অথবা নন্দনের প্রাঙ্গণে কয়েকবার সুখময়ের দেখা হয়েছে সহসার সঙ্গে।

নন্দনের প্রাঙ্গণে এসে চেনা-জানা একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হলে মন্দ লাগে না। দেখা না হলেও, মনের দুঃখের কথা বিশ্বসংসারের কেউ ধরতে পারে না।

সুখময় প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভরিয়ে এককালের সহপাঠিনীকে জিজ্ঞেস করেছে, "সহসা, তুমি সেই পুরানো জায়গাতেই কাজ করছো তো? কলকাতার কেউ কাজ পায় না, আর তুমি খেয়ালখুশি মতন একটা চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরিতে চলে যাও।"

না, কর্মপরিবর্তন করেনি সহসা। কিন্তু মেয়েটার মনে যেন আগেকার সেই আনন্দের ঝঙ্কার নেই।

কাজে আনন্দ না থাকলে সমস্ত শরীব থেকে অনবরত বিষ ক্ষরণ হয়। সেই জন্যেই ঠাকুর সবাইকে বলতেন, আনন্দে থাকো! বিশ্বসংসারকে দূষণ মুক্ত রাখতে হলে আনন্দের ভীষণ প্রয়োজন।

মেয়েদের পক্ষে এদেশে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা খুব শক্ত, একথা সহসা হঠাৎ জানিয়েছে সুখময়কে।

"যতোই তুমি পড়াশোনায় ভাল হও, যতোই তুমি কাজে দক্ষ হও, যতোই তুমি সাধনা করো, মেয়ে হয়ে জন্মালে এদেশে এসবের কোনো মূল্য নেই। এখানে জয় কেবল সুন্দর মুখের, সেই সঙ্গে যদি ফর্সা হলে তো সোনায় সোহাগা।"

কী হলো? সহসা আজ কেন এত বিরক্ত হয়ে আছে? সুখময় বললো, "সহসা, আজ রবীন্দ্রসদনে বাংলাদেশের শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার রবীন্দ্রসঙ্গীত রয়েছে। চলো, শুনবে চলো, শরীর মন সব স্নিগ্ধ হয়ে যাবে রবীন্দ্রনাথের সুরে, রবীন্দ্রনাথের গানে। সাধে কি আর বিবেকানন্দ অমন প্রাণ খুলে গাইতেন রবীন্দ্রনাথের গান!"

সহসা খুশী হলো। "গান শোনার ইচ্ছে যে নেই তা নয়। কিন্তু সুখময়, আজ এসেছি অন্য একটা কাজে। মিস্টার সেনগুপ্ত এবং তাঁর গৃহিণীর জন্যে

শনিবারের থিয়েটারের টিকিট কাটতে হবে।”

“দু'জনের পাশাপাশি সীট না পাওয়ায় সে বার ভীষণ বকুনি খেয়েছি, সুখময়। দোষটা কিছুটা আমারই, কাউন্টারে টিকিট কেনার পরে আমি নম্বরটম্বর দেখে নিইনি। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী মাত্র দেড় ঘণ্টার জন্যে একটু দূরে অবস্থান করলে কতটা ক্ষতি হতো বিশ্বসংসারের?”

সুখময়ের লোভ হয়েছিল একবার বলে, “সহসা তোমার উচিত ছিল মিস্টার সেনগুপ্তকে ‘পজেস’ করা। যার তার হাতে একটা ভাল মানুষকে স্বামী হিসেবে তুলে দেওয়াটা সুবিবেচনার কাজ নয়।”

“কিন্তু সেক্রেটারিরা তো বসের পত্নী নির্বাচন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পায় না। বউ সিলেকশনের ব্যাপারে সবার জন্যে সেই আদ্যি কালের রীতিই চলে আসছে। মনুষ্যত্বের মর্যাদা নেই, ব্যক্তিত্বের মূল্য নেই। অপরপক্ষের শরীরের খোলটা অথবা খোলসটাই সব থেকে মূল্যবান। আমরা সাদা আমেরিকানদের সমালোচনা করি। কিন্তু বর্ণবৈষম্যে বাঙালিরা যে এখনও পৃথিবীর ফার্স্ট সেকথা এদেশের প্রত্যেকটা ফর্সা এবং কালো মেয়ে উভয়েই হাড়ে হাড়ে জানে।”

সুখময় সুরসিক। সে বললো, “বসের পত্নী নির্বাচনে সেক্রেটারির ভূমিকা থাকলে তাঁর হয়তো কোনোদিনই ছাঁদনাতলায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হবে না!”

“রাখো তোমার রসিকতা, সুখময়। শোনো আমার মিস্টার সেনগুপ্তর পত্নীসংবাদ!”

“শিমুল ফুলটির ব্যাপারই অদ্ভুত! সুখময়। বিয়ের পরেই ক'মাসে মিস্টার রমিত সেনগুপ্তর পার্সোনালিটি রাতারাতি চেঞ্জ করে দিয়েছে।”

“বিয়ের পরে স্বামীর ব্যক্তিত্ব নবকলেবর ধারণ না করলেও তো মেয়েরা ভীষণ দুঃখ পায়, সহসা। মেয়েরা তো চায় বিয়ের পর পুরুষমানুষকে নতুন করে গড়তে। একেবার ঢেলে সাজাতে।”

“সুখময়, তুমি কি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা ছেড়ে দিয়ে মেয়েদের কাগজে অণুউপন্যাস লিখছ আজকাল? এসব কথা শিখলে

কোথায়? লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করেছ বলেও তা শুনিনি।" বন্ধুকে তীব্র বকুনি দিতে দ্বিধা করল না সহসা।

সহসার কাছে সেবার সুখময় যা জানতে পেরেছিল, রমিত সেনগুপ্ত বয়সে স্ত্রীর থেকে আট ন'বছর বড়। মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু সর্বদোষ হরে গোরা! আর পুরুষের ক্ষেত্রে—পদ, প্রতিষ্ঠা, পে স্কেল, প্রমোশন, প্রতিপত্তি এই সবই ধ্রুব! মাইনে বেশী হলে বয়সের দূরত্বটা অতি সহজেই ছোট হয়ে যায়।

"ভাল কেরিয়ার তৈরি করতে এদেশের পুরুষদের একটু সময় লাগে সহসা, বাঙালি মেয়েরা এই ব্যাপারটা ভালই বোঝে।" সুখময় বলেছিল।

"ওমা! সেই ভরসায় তুমিও বিয়ে না করে অনন্তকাল হাত গুটিয়ে বসে থাকবে নাকি?" সহসার সরস মন্তব্য, কথায় একটু ঝাল আছে কিন্তু জ্বালা নেই।

"সহসা, কারও কারও জীবনে সবুরে মেওয়া ফলে, আমার ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা আলাদা। বিনা হাঙ্গামায়, বিনা উমেদারিতে আমার যে কলকাতা শহরে একটা চাকরি হয়েছে এইটাই যথেষ্ট। ছোট্ট প্রতিষ্ঠান, আমাদের কোম্পানিতে কেউ প্রমোশন, পারফরমেন্স বোনাস, পার্কুইজিট ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামায় না।

"তুমি বলছো, কাজ করছে সবাই, অথচ কাজের জায়গায় তেমন কোনো প্রত্যাশা নেই?" সহসা ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। "ছেলেরা কিন্তু অফিসে প্রমোশনের ব্যাপারে ভীষণ সাবধানী। খবর থাকলেও সহজে তারা মুখ খুলতে চায় না, যেমন মেয়েরা বিয়ের ব্যাপারে

ভীষণ চাপা হয়। বর সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে, টেলিফোনে নিয়মিত তার সঙ্গে প্রেম হচ্ছে, তবু সুনন্দা ব্যানার্জি কখনও স্বীকার করতো না সুপ্রতীকের অস্তিত্ব।”

আরও অনেক কথা হয়েছিল। তারপর সহসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সুখময়কে বলেছিল, “এবার যাই, ভি আই পি দম্পতির পাশাপাশি টিকিট কেটে আমাব সামান্য সেক্রেটারি জীবন ধন্য করি। এদের লজ্জা করেও না আমাকে এইভাবে রিকোযেস্ট করতে। এই তো তিন সপ্তাহ আগে লম্বা ছুটি কাটিয়ে দু'জনে ফিরে এলেন। আমাদের শুধু হয়রানি হওয়া—একডজন জায়গায় যাচ্ছেন মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সেনগুপ্ত, ট্রাভেল প্রোগ্রাম ছাপাও, প্লেনের টিকিট কাটাও, হোটেল রুম বুক করো, কনফার্মেশন নাও, গাড়ির ড্রাইভারকে স্পেশাল ইন্সট্রাকশন দাও, দিকে দিকে ফ্যাক্স পাঠাও এবং নিয়মিত বিভিন্ন জায়গায় ফোন করো সায়েবকে। এমন সময় ফোন করতে হবে যখন মিসেস সেনগুপ্ত বিরক্ত হবেন না। অথচ ট্যুব থেকে ফিরে এসে সেক্রেটাবির জন্যে একটা থ্যাংকসও নেই দেবীর কাছ থেকে। অফিসে স্বামীর সান্নিধ্যে আমাদের যে থাকতে দিচ্ছেন এটাই যেন যথেষ্ট।”

আরও অনেক কথা শোনা গেল সহসাব কাছ থেকে। “একবার তো যা ঘটলো কখনও কিন্তু ওসব ঘটেনি। মিস্টার রমিত সেনগুপ্তকে দেখাশুনা আমরা তো আজ থেকে করছি না। মিস্টার সেনগুপ্ত যেখানেই থাকুন ট্যুবে, সওয়া-আটটায় সেক্রেটারির টেলিফোন না পেলে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কলকাতাব বাইরে বসকে এস-টি-ডি কববাব জন্য, তাড়াতাড়ি অফিস চলে এসেছে সহসা। কিন্তু ছুটির ভোরবেলায় ফোন ধরে নিউ মিসেস সেনগুপ্ত হোটেলরুম থেকে যা ব্যবহার করলেন! যেন এতো সকালে তাড়াতাড়ি ফোন করে বিধিবহির্ভূত কাজ করছে স্বামীর কর্মচারীরা। অথচ ভদ্রমহিলাব তো অজানা নয় যে রমিত সেনগুপ্তর একজন সুদক্ষ সহকারিণী আছে, যাকে এতোদিন সবাই সায়েবের দক্ষিণ হস্ত বলে বর্ণনা করে বাহবা দিয়েছে। ঠিক আছে, তুমি রমিত সেনগুপ্তকে বিয়ে করেছ, এনেছ নিজের

তাঁবে, কিন্তু সহসা রায়চৌধুরীও তো উবে যাচ্ছে না তোমার একচেটিয়া স্বামীর জীবন থেকে।”

একবার খুব রাগ হয়েছিল সহসার। বিখ্যাত হেড হানট্রেস মিসেস থাডানি সেবার সহসাকে ফোনও করেছিলেন ঠিক সেই সময়। “হ্যালো কেমন আছো, গীতা?”

“কেমন করে ভাল থাকবো, সহসা? তোমাকে আমার পছন্দমতো জায়গায় নিয়ে যেতে পারছি না। অথচ আমার ক্লায়েন্ট তোমার বায়োডেটা এবং রিপোর্ট দেখে পাগল—সহসা রায়চৌধুরীর মতন মহিলা চাই, না হলে সেক্রেটারি চাই না।”

হাসলো সহসা। “গীতা, বোকাসোকা মেয়েদের ঘর ভাঙতে তুমি সত্যিই এক্সপার্ট।”

“সহসা শোনো। তুমি অফিসের চাকরিকে হিন্দু ম্যারেজের মতন ‘সেক্রেড’ ভেবে বসে আছো কেন? তুমি যখন বিয়ে করে ঘর বাঁধবে তখন আমি অবশ্যই এসব প্রশ্ন তুলবো না। কিন্তু চাকরিতে মাইনে, পারফরমেন্স অ্যালাউন্স, পার্সোনাল কমফর্ট এসবই সবচেয়ে ইমপর্টান্ট কথা। মিস্টার সেনগুপ্তর অফিস তোমাকে এখনও বাড়ির টেলিফোনের খরচা দেয় না অথচ তোমাকে কথায় কথায় বাড়িতে ফোন করতে মিসেস সেনগুপ্তর দ্বিধা নেই।”

“গীতা, আমি এখনও এই কোম্পানিতে জেনারেল ম্যানেজারের সেক্রেটারি হইনি। আমি একজন ইয়ং নট সো সিনিয়র অফিসারকে আমার সাধ্যমতো দেখা শোনা করি।”

“তুমি কার কাছে কি কাজ করো সেটা আমার কাছে বড় কথা নয়, সহসা। তুমি টাটা টি, আসাম টি, আই টি সি এমনকি বি-ও-সিতে খোঁজ করে দেখো। ইভ্‌ন এল অ্যান্ড টি ইস্টার্ন রিজিওন্যাল অফিস কিংবা সীমেন্স কোম্পানিতে একটু খোঁজ নাও।”

সহসা শান্ত হয়ে উত্তর দিলো, “আমি সব বুঝি গীতা। তোমার উদ্দেশ্য আমাকে নতুন জায়গায় প্লেস করে আমার নতুন এমপ্লয়ারের কাছ থেকে

দু'মাসের মাইনে প্লেসমেন্ট কমিশন হিসেবে আদায় করা। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য মাইনে পাওয়া এবং সেই সঙ্গে মনে একটু শান্তি পাওয়া। আমি যে-মানুষটির কাছে কাজ করি, তোমাকে কী বলব....."

"কাম অন সহসা, তোমার মনে কি কন্ট্রাক্টের বাইরের কোনো চিন্তা চুপিচুপি জমা হচ্ছে?" হাসছে গীতা থাডানি। মেয়েদের পার্সোনাল ব্যাপারে মেয়েরা সত্যিই ভীষণ নিষ্ঠুর হতে পারে।

সহসা এবার মিসেস থাডানিকে শুনিয়ে দিলো, "তার কোনো সুযোগ নেই গীতা। আমার প্রেজেন্ট বস অনেক ভেবেচিন্তে খোঁজখবর নিয়ে বিয়ে করেছেন, বিবাহ বার্ষিকীও হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া যাঁকে তিনি বিয়ে করেছেন তাঁকেও আমি জানি। আমাদের সঙ্গে একই কলেজে পড়তেন। দেখতে টুকটুকে, কিন্তু পড়াশোনায় মোস্ট অর্ডিনারি।"

টেলিফোনের অপরপ্রান্তে হাসছেন মিসেস গীতা থাডানি। "তার মানে তো স্পেশাল এনার্জির অযথা অপচয় হচ্ছে। তাই না সহসা? আমি তো সতেরো বছর ধরে বাঙালি মেয়েদের হ্যান্ডল করছি। যে তোমাকে ভালবাসে, অ্যাডমায়ার করে এবং মূল্য দেয়, তাকে বিয়ে করলেই সব সমস্যা চুকে যায়, ব্যাপারটা সিম্পল থাকে। কিন্তু বেঙ্গলে ভালবাসা হয় এক জায়গায়, বিয়ে হয় অন্য কোথাও। এরকম মিসম্যাচ না-হলে ধারাবাহিক কাহিনীর চেইন তৈরি হয় না। বাঙালি লেখকরা এক সময় গল্প-উপন্যাসে এই অচরিতার্থ কামনার চেন তৈরিতে ইন্ডিয়ার সেরা শিল্পী ছিলেন. আমি এখনও সেই জন্যে বাংলা সিনেমা কখনও মিস করি না, বুঝতে পারি ব্যাপারটা কত দুঃখের, কিন্তু বুঝতে পারি না, বাঙালি মেয়েদের জীবনে বার বার এমন ঘটনা কেন, সমস্যা কেন গজিয়ে ওঠে?"

"গীতা, চান্স পেয়ে তুমি আমাকে আজ অনেক কথা শুনিয়ে দিচ্ছ! তবে তোমাকে বলছি, যাঁর কাছে আমি কাজ করবো তাঁকে পছন্দ হওয়াটা আমার মতন একজন কর্মীর কাছে একটা মস্ত বড় প্লাস পয়েন্ট।"

"সহসা, এধরনের কথা ওঠে কেবল এই কলকাতায়। নট্ ইন মুম্বাই, নট ইন বাঙালোর নট ইভ্‌ন ইন চেন্যাই! চাকরি পাল্টানোর ক্ষেত্রে সব সময়

টোয়েন্টি পার্সেন্টি প্রিমিয়ামের প্রশ্ন। আরে বাবা, তোমার বস নিজেও তো পঞ্চাশ পার্সেন্টি মাইনে বেশি পেলে এখনই হেড অফিসে নিজের কাগজ পাঠিয়ে দেবে। লয়ালটি বলে কোনো জিনিস আজকাল কর্মক্ষেত্রে থাকে না—সহসা, আমাদের ওয়ার্কপ্লেস ইজ নট্ রামাকৃষ্ণ মিশন অর মাদার তেরেজাস মিশনারিজ অফ চ্যারিটি।"

"গীতা, তুমি সুন্দর কথা বলো। হেড হান্টার না হয়ে তুমি হাইকোর্টের ব্যারিস্টার হলে না কেন?"

গীতার গলা এবার ভিজে উঠলো।

"মাই ডিয়ার সহসা, মিস্টার থাডানি আচমকা কার অ্যাক্সিডেন্টে অকালে চলে না গেলে আমি চাকরিই করতাম না। গত জন্মে আমি নিশ্চয় বাঙালি মেয়ে ছিলাম, সহসা। আমি হোলটাইম হাউস ওয়াইফ হতে চেয়েছিলাম, ব্যারিস্টার হবার সাধ কখনও হয়নি। শোনো সহসা, এই মুহূর্তে হাতে একটা দামী সুযোগ রয়েছে বলে তোমাকে রিকোয়েস্ট করা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আর যদি কোনও কারণে বা কোনও দুঃখে কখনও কলকাতা থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিতা হতে চাও, তাহলে আমাকে বোলো। কাছাকাছি কয়েকটা শহরে অনেকগুলো ভাল কাজ আছে। তবে কেবল তোমার মতন হাইলি এফিসিয়েন্ট লাইভ ওয়্যার মেয়ের জন্যে।"

"তোমাকে হাজার ধন্যবাদ, গীতা। রমিত সেনগুপ্ত লোকটা সত্যিই ভালমানুষ, ওঁকে এখন আমি ছাড়বো না।"

এই ভালমানুষটাই এবার হয়তো বউয়ের চরিত্রগুণে একেবারে পাল্টে যাবে—একেবারে ইউ টার্ন করে অন্য পথে চলতে শুরু করবে। কিন্তু এখনও মানুষটা পুরোপুরি নির্ভর করে সহসার ওপরে।

খোলাখুলি মানুষ রমিত সেনগুপ্ত। তিনি নিজেই সহসাকে বলেছেন, "কুষ্ঠিতে ছিল একটু বেশি বয়সে হঠাৎ আমার বিবাহ হবে।"

আজও যে মিস্টার সেনগুপ্ত তাঁর সেক্রেটারিকে পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রসদনে তার কারণ, টিকিট কেনার আগে খোঁজ করতে হবে শনিবার

সন্ধ্যার নাটকটা সত্যিই ভাল কিনা। "যদি ভাল না হয় তা হলে কিন্তু টিকিট কাটবেন না, মিস রায়চৌধুরী। ওই সময়টা স্যাটারডে বা টলি ক্লাবে বসে বউয়ের সঙ্গে গল্প করলে সময় ভাল কাটবে, বাজে নাটক সাফার করার চেয়ে দুঃখ জীবনে নেই।"

রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে সুখময় এবার সহসাকে জিজ্ঞেস করলো, "টিফিন টাইমে তোমাকে ফোন করা যায়?"

'টিফিন টাইম কেন, যখন খুশি আমাকে ফোন করতে পারো সুখময়, যতক্ষণ ইচ্ছে।"

কিন্তু সুখময়ের অসুবিধে আছে। অফিসে যাঁর টেবিলে পি অ্যান্ড টি ফোন তিনি দেড়টা থেকে দুটো পনেরো মিনিট পর্যন্ত টেবিল ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। সেই সময়টুকু যা ডায়াল করার স্বাধীনতা।

সহসা ঠিকানা দিয়েছে অফিসের। বলেছে, "চলে এসো একদিন, অফিসের লাঞ্চবক্স শেয়ার করবো এবং কফি খাওয়াবো নিজের হাতে। চান্স পেলে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো স্বয়ং রমিত সেনগুপ্তর। মিস্টার সেনগুপ্ত সাপ্তাহিক পত্রিকায় তোমার রিসেন্ট কয়েকটা লেখা পড়েছেন, ঠাকুরের যে মাঝরাতে ভীষণ খিদে লেগেছিল এবং তা নিয়ে রাতদুপুরে অনেক মজার কাণ্ড হয়েছিল তা সেনগুপ্ত জানতেন না। আর ঐ যে লিখেছো, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা পুরী সম্প্রদায়ভুক্ত এটাও উনি শোনেননি। কোথায় খবরটা তুমি পেয়েছো তা হয়তো জানতে চাইবেন।"

সহসার ঠিকানাটা সুখময় ডায়রিতে লিখেছে, কিন্তু হুট করে অবিবাহিতা বান্ধবীর অফিসে হাজির হওয়া যে শোভন নয় তা সুখময় বোঝে। পরস্পরের ঠিকানা দেওয়া-নেওয়া হয়েছে, কিন্তু বাসগৃহের নয়।

সহসা

ঘুমের ঘোরে মাঝ রাতে ইরাবতী আবার পাশ ফিরলো। ওষুধের জোরে সে বেশ নিশ্চিন্তেই ঘুমোচ্ছে। অনেকক্ষণ পাখা চলার পরে রাতের কলকাতা ইতিমধ্যেই অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে। ইরাবতীর শরীরটা একটু কুঁকড়ে গিয়েছে—শীতের সময় এটা হয়েই থাকে। ওর পায়ের গোড়ায় রাখা চাদরটা সুখময়ের নজরে পড়ে গেল।

ওইটা সাবধানে বার করে এনে ইরাবতীর ঘুমন্ত শরীরে বিছিয়ে দিলো সুখময়। রাতের অন্ধকারে মিনি আলোর মায়ামোহে একটা প্রস্ফুটিত সুন্দর শরীর প্রাণভরে দেখার সুযোগ থেকে স্বেচ্ছাবঞ্চিত করতে হলো। সুখময় কোথায় যেন পড়েছিল, না চাইলেও শোয়ার সময় মানুষকে বালিশ দিতে হয়, ঘুমন্ত মানুষকে রক্ষে করতে হয় দুরন্ত প্রকৃতির হাত থেকে।

এই ইরাবতী, এই রমিত সেনগুপ্ত, এই সহসা রায়চৌধুরী সব যে এমনভাবে সুখময়ের জীবনের সঙ্গে এইভাবে জড়িয়ে যাবে তা তো কল্পনাতেও ছিল না।

এই সহসাকে ইরাবতী যে পছন্দ করে না, আবার ইরাবতীকে যে সহসা তেমন পছন্দ করে না, তা আর বিশ্বসংসারকে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। রমিতের সঙ্গে বিয়ের ঠিক আগেই ইরাবতীর সঙ্গে সেবার সহসার দেখা হয়েছিল, সব জেনেও কিন্তু ইরাবতী কোনো ইঙ্গিত দেয়নি।

ইরাবতী এই সমালোচনার উল্টো জবাব দিয়েছে। "সহসা যে রমিতের কাছেই কাজ করে তা তো একবারও বললো না আমাকে, অথচ তখন তো নেমন্তন্নর কার্ড ছাপানো হয়ে গিয়েছে।"

সহসার উত্তর, "পৃথিবীতে একজনই যে ইরাবতী আছেন তা ভাববো কেমন করে?" যাই হোক টেনশনের কমতি নেই।

সহসাকে সমালোচনা করা, ছোট করা কোনো রকমেই সম্ভব নয়

সুখময়ের। সুখময় আজকাল প্রায়ই ভাবে, নন্দনের প্রাঙ্গণে সহসার সঙ্গে ঐ ভাবে কয়েকবার ঘনঘন দেখা না হলেই বোধ হয় ভাল হতো। সুখময়ের সোজা জীবনটা নির্ঝঞ্ঝাটে সাধারণ ভাবেই চলত। বন্ধুদের পুনর্মিলনে পরিচিত এবং অপরিচিত মেয়েরা অমন বিরক্তভাবে দূর থেকে আঙুল দিয়ে দেখাতো না, ঐ সুখময় মুখার্জি, যে একজন মেয়েকে বিয়ে না করে লিভটুগেদার করছে। বিয়েটা নাকি নারীপুরুষের সহ-জীবন, আর লিভটুগেদার হচ্ছে দ্বৈত জীবন। দুটোই একত্রবাস, কিন্তু দুটোর পার্থক্য আকাশ পাতাল।

অথচ এই রমিত সেনগুপ্ত সেবার সুখময়কে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমার স্ত্রী ইরাবতী, আপনাদের সম্বন্ধে ভীষণ ইন্টারেস্টেড! ওর ধারণা, কোনো একদিন আপনি সহসাকে আপনার প্রাণের কথা বলবেন।"

তারপর অবশ্য রমিত সেনগুপ্ত হা হা করে হেসেছিলেন। ব্যাপারটা কেন তখন মোটেই বোঝেনি সুখময়? সে তখন ভেবেছে এমন হাসা এক এক জন দিলদরিয়া মানুষের ধর্ম। এর মধ্যে বাড়তি কিছু থাকে না যা শরীরে বিঁধে যায় বা মনকে ক্ষতবিক্ষত করে।

সুখময়েব চেনাজানা এই ক'জনের জীবনে যা ঘটলো এবং যা ঘটলো না সবকিছুরই মূলেই রয়েছে সহসা। শুধু রমিত সেনগুপ্ত নয়, বিশ্বসংসারকে মাথায় তুলে রাখতে চেয়ে সহসা নিজের বোঝা এমনই বাড়িয়েছে যা এখন বহন করা বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে।

সহসা

জীবনস্মৃতির হিসেব খাতা ধরে অনেক টিক দিয়ে চলেছে সুখময় মুখার্জি। সহসা রায়চৌধুরীকে সে দোষ দিল, অথচ সমস্যার শুরুটা তো সুখময়েরই সৃষ্টি।

তার আগে তো মাত্র কয়েকটা অনির্ধারিত দেখাশোনা—ঐ নন্দনের সবুজ প্রাঙ্গণে একজন প্রাক্তন বান্ধবীর সঙ্গে কিছুক্ষণের ভাববিনিময়। সহসার সঙ্গে পুরনো সম্পর্কটা ঝালিয়ে নেওয়া, তাকে মনে করিয়ে দেওয়া 'প্রাক্তন ছাত্রী কথাটা ব্যাকরণসঙ্গত নয়, ব্যবহার করা নিরাপদও নয়, কারণ ছাত্রী মানে ছাত্রের স্ত্রী!'

"যতসব বিদঘুটে জিনিস তোমার মাথায় ঘোরে," সুখময়কে মৃদু বকুনি দিয়েছিল সহসা, তারপর একসঙ্গে চা খেতে রাজি হয়েছিল রাস্তার ধারে স্টলের সামনে।

সেই যে আলাপ সেই থেকেই জীবনের লাটাই থেকে গল্পের সুতো যেন ছড়িয়ে যেতে লাগলো।

সহসা সুন্দরী নয়, প্রবলভাবে আকর্ষণ করার মতন দেহদাহ তার নেই। ইদানীং মেদের আতঙ্কে শরীরটা সে অতিমাত্রায় শাণিত রাখতে চেষ্টা করেছে, ফলে কমবয়সের স্বাভাবিক লাবণ্যও কিছুটা কমেছে, সেই সঙ্গে তার রঙ আরও কালো হয়েছে। কিন্তু সহসা অফিসের কাজে সর্বগুণান্বিতা হয়েছে, ফলে তার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। এই ধরনের বিশ্বাস মানুষের শরীরের গভীরে আত্মমর্যাদার স্নিগ্ধ আলো জ্বালিয়ে দেয়।

সহসা, তুমি এমন লাইনে ট্রেনিং নিয়েছো যে ভাল চাকরি তোমার পিছনে ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিয়ে অযথা মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হবে না তোমার। আর তোমার বন্ধু সুখময় অনেকদিন আগে ইন্টারভিউ দিয়ে কোনোরকমে এমন একটা কোম্পানিতে ঢুকেছে

যার পড়তি অবস্থা।

একসময় সায়েবরা স্কটল্যান্ড থেকে এদেশে এসে প্রবল উৎসাহে এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রমরমা ব্যবসা চলেছে বহু দশক ধরে। তারপর এদেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে ক্লান্তি এসে গিয়েছে স্কটল্যান্ডের সায়েবদের। পাততাড়ি গুটোবার জন্যে তাঁরা এই কোম্পানিকে চুপিচুপি স্বদেশী বেওসায়ীদের হাতে তুলে দিয়েছেন! এদেশের নতুন ব্যবসায়ী প্রজন্ম গয়লা নয়, তাঁদের মানসিকতা কসাইয়ের! সেই চোখ দিয়েই এঁরা হাটে গোরু কেনেন দুধের জন্যে নয়, মাংসের জন্য। সুখময় কোনোরকমে এই ধরনের এক কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে জীবন শুরু করেছে। মায়ের নাম করে ঢুকে পড়েছে।

তারপর কলকাতার বেশিরভাগ কোম্পানিতে যা হয় তাই হয়েছে, মালিক শোষণ করেছে কোম্পানির রক্ত, আর শ্রমিকও দুধপুকুরে দুধের বদলে জল ঢেলেছে, নিজের কর্তব্য না করে, মাইনে এবং ওভারটাইম নিয়েছে, ফলে কোম্পানি ক্রমশ হারিয়েছে তার প্রাণশক্তি। প্রতিযোগিতায় ধাপে ধাপে পিছিয়ে পড়াব যুগ শুরু হয়েছে। একপয়সা নিয়োগ নেই নতুন যন্ত্রপাতিতে, সময় তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।

কোম্পানির ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনও তেমন মাথা ঘামায়নি সুখময়। বড্ড বড় সব ব্যাপার। একজন সাধারণ কর্মচারী জটীল ফিনান্সের ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে কী করবে?

কে.ম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্য যখন বিপজ্জনক সীমায় ঠিক সেই সময় মালিকদের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। দুই বেওসায়ী ভ্রাতা কোম্পানির দুই প্রান্তে দুটো নল লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানের সবটুকু প্রাণশক্তি টেনে নেবার চেষ্টা চালিয়েছেন নির্লজ্জভাবে। বিজনেসে এই লুণ্ঠনের নাম 'সাইফোন'—সোজা বাঁকা যত পথ আছে সব পথে টেনে নাও কোম্পানির রক্ত—একবারও ভেবো না এর ফল কি ভয়াবহ হতে পারে।

ছোট কর্মচারীরা জানতে পারে না বড় জাহাজে কখন ফুটো দেখা দিয়েছে, কখন সলিল সমাধির সময় উপস্থিত হবে। বেচারা সুখময় সেই

সময় বোকার মতন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে।

মায়ের অনুরোধে কলকাতার ভদ্রপাড়ায় একটা মনের মতন বাড়ি ভাড়া নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে সে। একসময় নিয়মিত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়েছে সে, দালালদের সঙ্গে ফোনে কয়েকবার কথা বলেছে এবং অবশেষে পছন্দমতন জায়গাতে আবাসনের সন্ধান পেয়েছে সুখময়!

সহসা একবার জিজ্ঞেস করেছিল, "কলকাতায় ভাল জায়গা বলতে কোনটা বোঝায় সুখময়?"

"যার যেখানে মজে মন", হেসে উত্তর দিয়েছে সুখময়। "কলকাতার ধনপতিদের আলিপুর ছাড়া মন ভরবে না। অথচ তুমি ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞেস করো, বিনা ভাড়ায় আলিপুরে প্রাসাদ পেলেও এই ডাক্তারবাবু হাওড়া কাসুন্দে ত্যাগ করবেন না। কোটিপতি গুজরাতি স্বপ্নের প্যালেস অর্ধেক ভাড়ায় পেলেও ভবানীপুরের গলি ছেড়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউতে আসবেন না। আমি সামান্য চেষ্টায় দক্ষিণ কলকাতার এই পাম অ্যাভিনিউতে সাময়িক আশ্রয় পেয়ে গিয়েছি, আমি যথেষ্ট ভাগ্যবান।"

নামে অ্যাভিনিউ, আসলে কিন্তু ব্রড স্ট্রীট থেকে বেরনো গলিস্য গলি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অবশ্য জানেন, কলকাতা শহরে রাস্তার নামেরও প্রিমিয়াম আছে। আবার গেরস্ত ঠিকানার জন্যে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। থাকুন না আপনি মদনমোহনতলায় কোনো প্রাসাদে, সামাজিক স্বীকৃতি জুটবে না! অথচ তার সিকিভাগ জায়গা নিয়ে চলে আসুন বালিগঞ্জ গার্ডেনস-এ, দেখুন বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে কত প্রেস্টিজ বাড়ে।

পাম অ্যাভিনিউ নামটায় সাহেবী গন্ধ আছে—যদিও বাংলা করলে দাঁড়াতো তালতলা! কিন্তু ইংরিজিতে জায়গাটা বেশ জাতে উঠে গিয়েছে। তাই সুখময়কে অনেকগুলো বাড়তি টাকা সেলামি গুঁজতে হয়েছে। যেখানে যা সঞ্চয় ছিল সব ভাঙিয়ে এবং কিছু ধার নিয়ে এই পাম অ্যাভিনিউতে উঠে আসা, যেখানে ধনী আছে, দরিদ্রও আছে, আবার

বেশকিছু মধ্যবিত্তও আছে।

সুখময় একবার ভেবেছিল হাউস ওয়ার্মিং অনুষ্ঠান করবে, বন্ধুবান্ধবদের চাপে পড়ে। আনন্দ উৎসবের কোনো একটা ছুতো খুঁজে পেলেই হলো বন্ধুদের! ওরে বাছা, নিজের সম্পত্তি হলে লোকে বাড়ি 'গরম' করার কথা ভাবে। সই করা দলিল অনুযায়ী ভাড়া বাড়িতে মেয়াদ তো দুই কিংবা তিন বছর। হাউস ওয়ার্ম হতে হতেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যদি-না তুমি বাড়িওয়ালার নেকনজরে পড়ে যাও।

সহসা তার বন্ধুর কথা শুনে মিষ্টি হেসেছে, কিন্তু সেলিব্রেশনের জন্যে কোনোও চাপ দেয়নি। সহসা এখনও হোস্টেলে থাকে, সেখান থেকে কেউ তাকে হঠাৎ সরাচ্ছে না। যদিও সহসা নিজেও মাঝে মাঝে কলকাতায় একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট কেনবার জন্যে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

কলকাতায় পুরুষদের কোনো ওয়ার্কিং হোস্টেলে থাকার কথা সুখময় যে ভাবেনি এমন নয়। পুরুষ বাঙালিরা একলা যেখানে বসবাস করেন তাকে মেস বলে। একসময় নীরদ চৌধুরী, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তীর মতন মস্ত মস্ত লোক মধ্য কলকাতার মেসে থেকেছেন। এখন কালচার পাল্টেছে, ঐ পরিবেশ ভাল লাগে না সুখময়ের।

বন্ধুরা বলেছে, "শুধু শুধু মেসের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছো কেন? আমরা বুঝি গৃহটা তোর জীবনের প্রথম পদক্ষেপ, দ্বিতীয় স্টেপে গৃহ থেকে গৃহিণী!" অথচ ওই ধরনের কথা ভাববার মানসিকতা বা অবসর নেই সুখময়ের।

ভাগ্যে বিয়ের কথা তখন ভাবেনি সুখময়। ওর মধ্যে সত্যিই একটা উদাসী মানুষ রয়েছে। যে সংসারে জড়িয়ে পড়তে মোটেই ব্যাকুল নয়। দেহসর্বস্ব এবং সুখসর্বস্ব যারা তারা অবশ্য এসব মানুষের কথা বিশ্বাস করে না। তারা ভাবে ওসব তো কোটিতে একটি বৈরাগীর ভাবনাচিন্তা। কিন্তু উদাসীর সংখ্যা যে নিতান্ত কম নয় তা এরা বিভিন্ন মঠ-মিশনে একটু ঘোরাঘুরি করলে সহজেই দেখতে পেতো। কেউ সংসার না-করে সন্ন্যাসী, আবার কেউ কেউ সংসারে থেকেও সংসারের জালে জড়িয়ে পড়তে

অনাগ্রহী, গৈরিক জার্সি পরতেও এঁদের প্রবল দ্বিধা।

আপাতত পাম অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে যথাসর্বস্ব ঢেলে রাত কাটাবার একটা ভদ্রস্থ ঠিকানা জুটেছে। ভাড়াটে বাড়িকে বাসাবাড়ি বলে কলকাতার বনেদি বাসিন্দারা। যারা ভাড়াবাড়িতে থাকে তারা বাসাড়ে। উপার্জনের একটা মোটা অংশ তাদের ভাড়ায় চলে যায়। কিন্তু বাছা, লোক যে গাঁটের কড়ি খরচ করে জমি কিনেছে, বাড়ি বানিয়েছে, কর্পোরেশনের ত্রৈমাসিক ট্যাক্স গুনছে, তার কথাও ভাবতে হবে তো। কোন দুঃখে হাজার হাঙ্গামা পুইয়ে বাড়ির মালিক হয়ে মানুষ তা ভাড়াটের হাতে তুলে দেবে যদি-না কিছু প্রাপ্তিযোগ থাকে?

সেলামি অথবা পাগড়ি না দিয়ে সুখময়ের উপায় ছিল না। এমন পছন্দমতন জায়গায় না হলে ভাড়া পাওয়া সম্ভব নয়।

খাওয়া দাওয়া যতই সাধারণ হোক, একটু ভাল জায়গায় বসবাস করার সাধ সুখময়ের অনেক দিনের। আয়তন ছোট হোক, কিন্তু নিবাসটি একটু দৃষ্টিনন্দন হোক। গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতায় যত দৃষ্টিকটু বাড়ি এবং ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে তা বোধ হয় ভারতবর্ষের কোনো শহরে হয়নি। এই শহরে স্থপতিদের যে কোনো স্বীকৃতি নেই, সম্মান নেই তা বুঝতে নবাগতদের দশ মিনিট সময়ও লাগে না। সাধে কি আর স্থপতিরা শহর ছেড়ে পালিয়েছে এবং যাবার আগে কলকাতাকে অষ্টাবক্র নগরীর বদনাম দিয়েছে।

কয়েক মাস পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে বসবাস করে এখানকার কসমোপলিটান কালচার মন্দ লাগেনি সুখময়ের। অনেক রকমের হাওয়া বইছে এই পাম অ্যাভিনিউতে—কিছুটা মুসলিম, কিছুটা ক্রিশ্চান, কিছুটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, কিছুটা বাঙালিয়ানা নিঃশব্দ চুক্তি করে অতি সহজে সহঅবস্থান করছে। এখানে প্রতিবেশীদের মধ্যে খুব গায়ে-পড়া ভাব নেই, অপর সম্বন্ধে অহেতুক কৌতূহলও নেই। আবার সবাইকে জীবনযাত্রার একই ছকে ফেলে দেবার প্রচেষ্টা নেই।

এপাড়ায় পূর্বদিকে একটু এগোলে কিছু চীনাও বোধহয় আজও টিকে আছে। অদূরেই বন্ডেল গেট যা একদিন পর্তুগিজদের প্রিয় বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ব্যান্ডেল এবং বন্ডেল কথাটা একই বিদেশী সূত্র থেকে এসেছে। তার অদৃশ্য উপস্থিতি আজও এখানে অনুভব করা কঠিন নয়। পর্তুগীজ ভাষায় বোনান্ডেল কথাটির অর্থ 'ভাল জনপদ'।

এই পর্তুগীজরা যেমন কয়েকশ বছর বাঙালিদের হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছে তেমন দিয়েছেও অনেক কিছু—আচার, জ্যাম, জেলি, মারমালেড, মোরব্বা, সিরাপ, পাঁউরুটি এসব তো বাঙালিদের সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। পাঁও মানেই তো রুটি, তবু বাঙালিরা পর্তুগীজ পাঁওয়ের সঙ্গে নিজেদেব রুটি শব্দটা বাড়তি জুড়ে পাঁউরুটি শব্দ থেকে আনন্দ পাচ্ছে।

সুখময় ভাবছিল, আরও কিছু টাকা ধার করে তার ফ্ল্যাটের ভিতরটা মনের মতন করে সাজিয়ে গুছিয়ে নেবে। জায়গাটা এখন বসবাসযোগ্য হয়েছে, কিন্তু এখনও বেশ কিছু গার্হস্থ্য সুখের অনুপস্থিতি।

একটা ড্রেসিং আয়নার কথা ভেবেছিল সুখময়, তারপর কে যেন বললো যিনি আয়নার সামনে ড্রেসিং করবেন তিনি সংসারে এলে তাঁর পছন্দমতন কেনাকাটা করাটাই যুক্তিযুক্ত হবে।

যাঁরা একলা থাকেন তাঁরাও ড্রেসিং করেন, নিঃসঙ্গ পুরুষেরও সকাল সন্ধ্যায় আয়নায় নিজের মুখটি প্রতিফলিত করার নৈতিক অধিকার আছে, একথা সবাই বুঝতে চায় না কেন?

একটা প্রমাণ সাইজ ভাল আয়নার এখন অনেক দাম। একই দামে আয়না থেকে একাধিক বিকৃত প্রতিবিম্ব একসঙ্গে যাঁরা দেখতে উৎসাহী নন তাঁদের বেলজিয়াম গ্লাসের শরণাপন্ন হতে হয়। দাম বেশী লাগে, কিন্তু উপায় নেই। সুখময়ের মাইনের একটা বড় অংশ এবার চলে গিয়েছে আয়না এবং আনুষঙ্গিক বিনিয়োগে! তবু মনের মধ্যে একটা খুশি খুশি ভাব নিয়ে সুখময় সেদিন অফিসের উদ্দেশে পাম অ্যাভিনিউ থেকে পথে বেরিয়েছিল।

সহসা

বৃহস্পতিবারের অপরাহ্নে সুখময়ের অফিস ম্যানেজার যে তাঁব সহকারীকে এইভাবে ঘরে ডাকবেন এবং আচমকা কথা বলবেন তা অভাবনীয় ছিল।

ম্যানেজার নির্বিকারভাবে সুখময়কে বললেন, "মিস্টার মুখার্জি, বুঝতেই পারছেন সব। কোম্পানির অবস্থা কী রকম হয়েছে তাতো আপনি জানেন। ইউনিয়নের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বেশ দেরি হচ্ছে। এদেশের কাজকর্মের ধর্মই এই, শ্রমিকরা সহজে কোনো পরিবর্তন আনতে দেয় না। তাই জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট কর্মচারীদের ওপর ধকলটা অনেক বেশি পড়ে যায়।"

সোজা কথায়, সামনের ১লা তারিখ থেকে এই অফিসে চাকরি নেই সুখময় মুখার্জির। আগে একসময় সুখময় ছিল কর্মসন্ধানী বেকার, এখন ছাঁটাই হয়ে যাওয়া কর্মী। আগে কুমারী, এখন বিধবা।

মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়া—শব্দটা কয়েকবার শুনেছে সুখময় কিন্তু কখনও তার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। সুখময়ের এতোদিনের চাকরিটা যে এইভাবে আচমকা চলে যেতে পারে তাও স্বপ্নে ভাবেনি। এই জন্য ইউনিয়ন সভ্য হওয়াই ভাল ছিল, অন্তত কিছুদিন ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলতো, একটু সময় পাওয়া যেতো।

"আপনার জন্যে সত্যিই দুঃখিত আমি মিস্টার মুখার্জি।" বলেছিলেন সুখময়ের অফিস ম্যানেজার।

আবার কাটাঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া কেন? অসহায় সুখময় বেশ অপমানিত বোধ করেছে।

ম্যানেজার দুঃখ প্রকাশ করেছেন, "সুখময়বাবু আপনি এতোই তরুণ, আপনার সার্ভিসের মেয়াদ এতই কম যে ভি আর এস দেওয়ার পথও নেই।"

স্বেচ্ছা অবসরের টাকা কড়ি দেওয়া যাচ্ছে না বলে, ছাঁটাই হবার অসম্মান এড়ানো যাবে না এমন কথা নয়। কর্তৃপক্ষ সে ব্যাপারে বেশ উদার।

ম্যানেজার বললেন, "আপনি কোন দুঃখে টার্মিনেশন লেটারের ভিকটিম হবেন? আপনি স্বেচ্ছা পদত্যাগ করুন—আপনার কেরিয়ার রেকর্ডটা স্পটলেস লিলি হোয়াইট থাকবে।"

সুখময় যে ভেঙে পড়বে তা ম্যানেজার আগেই আন্দাজ করেছিলেন। তিনি বললেন, "মিস্টার মুখার্জি, মনে করবেন না আমরা অমানুষ। কর্মী তৈরি করবার জন্যে, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যে স্পেশাল ট্রেনিং নিয়ে এই শহরে এসেছিলাম তেত্রিশ বছর আগে, কিন্তু গত কুড়ি বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় কেবল চাকরি নষ্ট করছি। ইদানিং কলকাতার অফিস পাড়ায় এবং কারখানায় এর নাম রিঅরগ্যানাইজেশন, পুনর্বিন্যাস, ঢেলে সাজানো।"

একের পর এক প্রতিষ্ঠানকে গলা টিপে হত্যা করা, কিন্তু ঢেলে সাজানোর ব্যাপারটা কোথায়? সুখময় কিছুতেই ভেবে পায় না।

ম্যানেজার মিষ্টি ভাবে বললেন, "আমার অ্যাডভাইস নিন মিস্টার মুখার্জি। পদচ্যুত না হয়ে নিজেই পদত্যাগ করুন। মনে রাখবেন, হয়তো এই বিপদ থেকেই আপনার ভাগ্য খুলে যাবে। আপনি ওয়াটশন সায়েবের জীবনী পড়েছেন? একটা আমেরিকান কোম্পানি থেকে চাকরি গিয়ে বেকার বসে না থেকে নিজেই একটা ছোট অফিস ইকুইপমেন্ট কোম্পানি খুললেন—খুদে সেই কোম্পানিটাই আজকের আই-বি-এম, জানেন তো কত শত বিলিয়ন ডলার এর দাম।"

ম্যানেজার সায়েব ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, "চাকরি যাওয়ার সঙ্গে ভাগ্যও অনেকসময় পাল্টে যায়।"

কথাটা তা যে এমনভাবে সুখময়ের জীবনে সত্যি প্রমাণ হবে তা সেই সময় বোঝা যায়নি। ম্যানেজার শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, "বৃহস্পতিবারের বারবেলায় মুখ শুকনো করবেন না মিস্টার মুখার্জি। মনে রাখবেন, আপনি কারও থেকে কম ব্রাইট নন, পৃথিবীতে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড়াতে

আপনি ভয় পাবেন কেন? আমরা খুব ভাল সার্টিফিকেট দিয়ে দেবো আপনাকে।"

কোম্পানির দেওয়া সেই সার্টিফিকেট নিয়ে সুখময় কয়েক সপ্তাহ ধরে সমস্ত কলকাতা চষে ফেলেছে। কোনো ফল হয়নি।

পুরনো কোম্পানি দয়াপরবশ হয়ে ইংরিজি কাগজে 'কর্মপ্রার্থী' কলামে তাঁদের খরচে সুখময়ের চাকরির জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন।

বাজার খারাপ, কোনো উত্তর আসেনি। শুধু কয়েকটা কম্পিউটার ইস্কুল তাদের কাগজপত্র পাঠিয়েছে, কয়েক হাজার টাকা খরচ করে কম্পিউটার শিখুন।

এখন উপায়? সুখময় ঠিক ভাবতে পারছে না।

"সুখময় না! ওমা, কি চেহারা হয়েছে তোমার! কোনো শক্ত অসুখ বিসুখ থেকে উঠলে নাকি? রঙটা তোমার ভীষণ কালো হয়ে গিয়েছে।" হঠাৎ দেখা হওয়ায় সুখময়কে কথাগুলো বললো সহসা রায়চৌধুরী।

বেকারত্বটা কি অসুখ? না স্রেফ একটা প্রবাহমান অর্থনৈতিক অবস্থা। পৃথিবীর বাজারে মানুষও এক ধরনের পণ্য—শ্রমের চাহিদা বাড়লে শ্রমিকরা চটপট নিজেদের দাম বাড়িয়ে দেয়, চাহিদা কমলে মাইনে কমে যায়, মানুষ বেকার হয়ে নিজেদের বাড়িতে বসে থাকে। এটা সুখও নয় অসুখও নয়, স্রেফ বাজারের অবস্থা অনুযায়ী মানুষের দামের ওঠানামা।

এসব কথা সহসাকে অবশ্যই বলেনি সুখময়। শুধু মনে মনে সে ভেবেছে, পণ করেছিল, যত কষ্টই হোক সহসার কাছে আসবে না সাহায্যর জন্যে। ওর শরণাপন্ন হওয়াটা ঠিক নয়। একজন নিরীহ সহপাঠিনীর

সৌজন্যবোধের সুযোগ নিয়ে তার ওপর অত্যাচার করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু কী করবে সুখময়?

সুখময়ের বাড়িওয়ালা বেসরকারি সূত্রে সব খবর পাঠিয়েছেন, সামনের মাসেই সুখময়কে ভাড়ার টাকা আগাম জমা দিতে হবে। এই টাকা না দিলে সুখময়েব কোনো ঠিকানা থাকবে না এই কলকাতায়।

ঠিকানাহীন লোকদের চাকরি সংক্রান্ত চিঠিপত্তর ডাকযোগে কোথায় আসবে? এতবড় শহরে ঠিকানাহীনদের জন্যে কোনোরকম ব্যবস্থা নেই। চাকরি থাকলে নানাবিধ উপদেশ দিতে এবং ডোনেশন সংগ্রহ করার দলের মোটেই অভাব নেই. কিন্তু এই শহরে বেকারদের আশাভরসা দেবার কোনো সংগঠন নেই। যাদের রোজগার নেই, যে লেবু টিপলে একটুও অর্থের বস বেরুবে না সে লেবু নিয়ে এই পৃথিবীতে কোন মূর্খ মাথা ঘামাবে? ভাড়া বাড়ি না হয় ছাড়লো সুখময়, কিন্তু মালিক এমনই ঘাবড়ে রয়েছেন, এই ঠিকানাটাও তিনি চিঠিপত্তরে ব্যবহার করতে দেবেন না। তার জন্যে উকিল এবং পুলিশের কাছে ছুটবার জন্য বাড়িওয়ালা অবশ্যই প্রস্তুত।

সুখময় একবার ভেবেছে, বাড়িওয়ালাকে বাড়ি না ছাড়লেই হলো। করুক না মামলা, অনির্দিষ্টকালের জন্যে উকিলে-উকিলে চলুক মুরগীর লড়াই। কিন্তু এ-পাড়ায় আইনের দরবারে অনেক ঠেকে কিছু নামকরা বাড়িওয়ালা আদালত এড়াবার যন্ত্রণাহীন মসৃণ পথ বার করেছেন। অবসরপ্রাপ্ত অথবা পদচ্যুত পুলিশ কর্মীদের সেবা এজেন্সি গজিয়েছে পাওনাদারের সমস্তরকম ইচ্ছাপূরণের জন্যে।

অভিযোগ নিয়ে আপনি আদালতে যাবেন কোন দুঃখে? বালাই ষাট! এঁরা তো রয়েছেন। আপনার নির্দেশ মতন ভাড়াটেকে ভিটে ছাড়া করে সেবা এজেন্সির কর্ণধার জলগ্রহণ করবেন। এঁরা পাওনাদারের দেনার কিস্তিও আদায় করেন। ঠিকমতন সহযোগিতা না করলে দেনাদার ভাড়াটের দরজার সামনে হিজড়ে নাচের ব্যবস্থা করে দেবেন, কিংবা তার জিনিসপত্তর জোর করে ঠেলা গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে চোখের সামনে উধাও হবেন। নতুন পুজোর এইসব নতুন মন্তর বেরিয়েছিল প্রথমে বোম্বাইতে,

তারপর নানা পথ ঘুরে তা যথাসময়ে হাজির হয়েছে কলকাতা মহানগরীতে।

সেবা এজেন্সির আইনবিরোধী কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ সুখময়ের মোটেই অজানা নয়। বন্ধুদের কাছে সে শুনেছে, ইস্টার্ন বাইপাসে স্কুটার থামিয়ে তা নিয়ে উধাও হয়েছে এজেন্সি। অভিযোগ, আরোহী তার কিস্তি জমা দেয়নি। সুখময়ের সবচেয়ে ভয় এই হিজড়ে পার্টিকে। আচমকা দলবেঁধে বাড়িতে চড়াও হয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে ওরা যে কি কাণ্ড করবে, তা কেউ বলতে পারে না।

সহসা কিন্তু বেশ আগ্রহ নিয়েই সুখময়ের সব খবরাখবর নিচ্ছে। পরিস্থিতি বুঝেও তার মধ্যে বিশেষ উদ্বেগের তেমন লক্ষণ দেখা যায়নি।

সুখময় যে প্রথম তার অফিসে এসেছে তা তার খেয়াল আছে, টেবিলে রাখা অফিসের ড্রাই লাঞ্চ বক্সের সবটাই সে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে দিলো সুখময়ের দিকে। ভাগাভাগি হচ্ছে না, কারণ আজ সহসা ভেজিটেরিয়ান, মাছ-মাংস মুখে দেবে না। সুখময়ের জন্যেই নন ভেজ প্যাকেট নিয়েছে সে। ড্রয়ার থেকে বিস্কুটের কৌটো বের করলো সহসা। "আমাদের কতক্ষণে কাজ শেষ হয় তাব কিছুই ঠিক থাকে না। তাই স্টারভেশন থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে অফিসে বিস্কুট ও কফি মজুত থাকে মিস্টার রমিত সেনগুপ্তর বিশেষ নির্দেশে। ভদ্রলোক মানুষকে খাইয়ে খুব তৃপ্তি পান।"

সুখময় নিজের উদ্বেগ চেপে রাখতে পারছে না। সহসাব সেই পুরনো কথা, ঈশ্বর এই পৃথিবীতে মানুষকে একটা পেটের সঙ্গে দু'খানা হাত ও একখানা মাথা দিয়ে পাঠিয়েছেন।

"মানুষকে হারিয়ে দেওয়া অতো সহজ ব্যাপার নয়, সুখময়। মানুষের চিরকালের স্বভাব হলো সারপ্লাস তৈরি করা।"

চাকরির জন্যে আবেদন পত্র রচনা সেকেলে হয়ে গিয়েছে। সহসা রায়চৌধুরী ঝটপট কম্পিউটারে সুখময়ের একটা ভদ্রস্থ বায়োডাটা তৈরি করে ফেললো। এতে প্রার্থীর সব খবর সুন্দবভাবে সাজানো রয়েছে।

পড়লেই মনে হবে, এমন লোককে কাজ না দিলে প্রতিষ্ঠানই ঠকবে!

অফিসের কর্তার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইছে সহসা। কিন্তু রমিত সেনগুপ্ত টলি ক্লাবে গিয়েছেন মিটিং করতে। নানা বিষয়ে এই অফিসের মিটিং লেগেই আছে। অফিসের বাইরে কর্তাদের সাক্ষাতের ফেভারিট প্লেস ওই টলি অথবা তাজ চেম্বার্স। বড়সায়েব আবার ওবেরয় তেমন পছন্দ করেন না, যদিও রমিত ওঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

মিস্টার রমিত সেনগুপ্ত বলেন, "এই সব হোটেলের চার্জ দেখে চোখ বিস্ফারিত করলে চলবে না। কাজের সময় আপ্যায়নের সুযোগ সুবিধে যত বাড়বে তত নতুন বিজনেস চলে আসবে এই শহরে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। খরচ কমানোটা গুড বিজনেসের প্রথম মাথা ব্যথা নয়। ব্যবসার প্রথম লক্ষ্য হলো ব্যবসাটা বাড়ানো।"

রমিতের সঙ্গে সেবার সুখময়ের দেখা হয়নি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সুখময় নিজের ডেরায় ফিরে এলো। খুব খারাপ লাগছিল, বেচারা সহসাকে সুখময়ের নিজস্ব সমস্যায় এইভাবে জড়িয়ে না ফেললেই হতো। কিন্তু সুখময় এখন সত্যিই অসহায়। মাসমাইনের একটা কাজ বিশেষ প্রয়োজন।

সহসার অবশ্য অত মাথা ব্যথা নেই। মিস্টার রমিত সেনগুপ্তর কাছ থেকে সে শুধু একটা গাইডেন্স চাইছে—"অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ান, অনেককে চেনেন, যদি সুখময়ের চাকরি সম্পর্কে কোনো স্পেশাল আইডিয়া ওঁর মাথায় খেলে যায়। ওঁর চিন্তার ধরনটাই আলাদা।" সবার থেকে স্বতন্ত্র নাকি এই মানুষটি।

সহসার মতে, প্রকৃত ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায় তা এই রমিত সেনগুপ্ত। কোম্পানির ফিনান্স কাম লিগাল ডিপার্টমেন্টে দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল রয়েছেন। কোম্পানির খোদ বড় সায়েবের সঙ্গে সারাক্ষণ ডাইরেক্ট যোগাযোগ। ঝটপট রমিতের উন্নতি হয়েছে কয়েক বছরে। আগে বম্বেতে কি একটা নাম করা এম-এন-সি অর্থাৎ বহুজাতিক কোম্পানিতে সেনগুপ্ত কাজ করতেন। সায়েববাড়ি ছেড়ে আধা-সায়েবী এক পার্সি কোম্পানিতেও

সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন রমিত সেনগুপ্ত।

বাংলার বাইরে বড় হয়ে ওঠা ও লেখাপড়া, তাই ভাল বাংলা লিখতে পারেন না রমিত। একটু আধটু বানান ভুলও হয়, কিন্তু বাংলার কৃষ্টিতে ভদ্রলোকের অগাধ বিশ্বাস।

কলকাতায় ফিরে আসা পর্যন্ত হানড্রেডপার্সেন্ট বাঙালি হবার জন্যে রমিত সেনগুপ্ত প্রবলভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। নিয়মিত আনন্দবাজার পত্রিকা কেনেন, সুযোগ পেলেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে উপস্থিত থাকেন, গভীর আগ্রহে বাংলা গানের ক্যাসেট শুক্রবার রাতে শোনেন, কয়েকবার শান্তিনিকেতনে 'সপ্তাহান্ত' করেছেন। ওখানে রমিত সেনগুপ্তর প্রিয় ডেস্টিনেশন অবশ্যই 'ছুটি'। ওই রিজর্টেই সেনগুপ্ত থাকেন বিনীত আশ্রমবাসীর মতন। বাড়তি প্রয়োজনের মধ্যে একটু ঠাণ্ডা বিয়ার, আর কখনও-বা একটু প্রিমিয়াম হুইস্কি। স্কচ ছাড়া যাঁরা হুইস্কি মুখে দিতে পারেন না রমিত সেনগুপ্ত সে দলেই আছেন। তবে হাতের গোড়ায় স্কচ না থাকলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা পান রমিত সেনগুপ্ত। স্কচ ছাড়াই অন্য কোনো ড্রিংক নিয়ে কোনোরকমে চালিয়ে দেন। প্রশংসা করেন ইন্ডিয়ান রামের, এমন কি এদেশে তৈরি ভারতের নিজস্ব কারামাজভ ভদকার।

যে কোম্পানিতে রমিত কাজ করেন তার নাম হলো : অ্যান্ড লাড্‌লো লিমিটেড। বিগত শতকে ঠিক কবে যে মিস্টার ডেভিড হল্‌ ও মিস্টার আর্থার লাড্‌লো নামে দুই বন্ধু বিদেশ থেকে এসে কলকাতায় এই প্রচণ্ড লাভজনক ব্যবসার পত্তন করেছিলেন তার সঠিক হিসেব নেই।

শোনা যায়, হল্‌ সায়েবের আদি পার্টনার ছিলেন জনৈক বঙ্গসন্তান সুতানুটির সনাতন হাজরা, যিনি ইংরিজিতে নাম লিখতেন হুজরো। উনিশ শতকের সেসব সোনার দিন সময়ের খেয়ালে কবে মুছে গিয়েছে। বাঙালি হুজরোরা হারিয়ে গিয়েছেন চিরতরে। তাঁদের বংশধররা এখন কেরানির চাকরি পাবার জন্যে পথে বসে কান্নাকাটি করছে। এই কোম্পানিতে কোনো একসময়ে এডিনবরা থেকে সদ্য আগত আর্থার লাড্‌লো কাজে যোগ

দিয়েছিলেন। তারপর কোনো সময়ে কোম্পানির প্রধান কার্যালয় হংকং-এ সরে গিয়েছে অদৃশ্য কোনো আর্মেনিয়ান পার্টনারের প্রভাবে। এই ভদ্রলোক বিজনেস কেনবার জন্যে হলের বংশধরদের মোটা দাম দিয়েছিলেন কিন্তু নিজের নাম কোম্পানিকে দেননি।

স্বাধীনতাব ধাক্কা সামলে হল্ কোম্পানি এখনও খারাপ করছে না। যদিও অনাবাসী এক ধনাঢ্য এখন কুয়ালালামপুর থেকে এই ভারতীয় কোম্পানির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করেন। এই অফিসের অনেকেই কে-এল চলে যান প্রয়োজন মতো। এই অফিসে কেউ এখন আর কুয়ালালামপুর বলেন না, ছোট আকারের কে-এলই যথেষ্ট। বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর একজন উৎসাহী বঙ্গসন্তান। হয় অফিস না হয় গুরুদেবের আশ্রম নিয়ে এম-ডি সাহেব নিজেকে সারাক্ষণ ব্যস্ত বাখেন।

কয়েকদিন পরে পাম অ্যাভিনিউতে কুরিয়ার মারফত রমিত সেনগুপ্তর চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল সুখময। রমিত সেনগুপ্ত অবশ্যই জানেন সুখময় মুখার্জি একজন সামান্য চাকরিপ্রার্থী, এই সব মানুষকে কলকাতার প্রতিষ্ঠাবান সমাজ সব সময় তো এড়িয়ে চলে। কিন্তু সুখময়কে রমিত সেনগুপ্ত খবর পাঠিয়েছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

সুখময়ের ভাগ্য খারাপ। অন্য অনেকদিনের মতন রাজনৈতিক দলের শোভাযাত্রায় আজও ট্রাফিক আটকেছিল।

নির্ধারিত সময়ের কুড়ি মিনিট পরে সুখময় যখন পায়ে হেঁটে হল্-হাউসের সামনে পৌঁছলো তখন রমিত সেনগুপ্ত কোম্পানির গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন।

কী আশ্চর্য, সেনগুপ্ত রাগ করলেন না মোটেই। সুখময়কে বললেন, "কী করবেন মশাই! এ শহরের যা অবস্থা, এখানে বিজনেস ফিরিয়ে আনা স্বয়ং মা লক্ষ্মীরও অসাধ্য। তা আই অ্যাম স্যরি, সে দিন আপনি অপেক্ষা করলেন আমি আসতে পারলাম না, আর আজকে পথ আপনাকে আটকে দিলো। তবে সহসা আপনার সব কথা আমাকে বলেছে। সুখময়বাবু, আপনি বুঝতেই পারছেন, সহসা আমাকে কিছু বললে তা আমাকে সিরিয়াসলি নিতেই হয়।"

আবার কবে আসবে সুখময় তাও বোধ হয় এই মুহূর্তে ভদ্রলোককে সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায় না। কারণ সেনগুপ্তর ইলেকট্রনিক এনগেজমেন্ট ডায়েরি হাতের গোড়ায় নেই, যন্ত্রটি নিশ্চয় তাঁর হ্যান্ড ব্যাগে পোরা আছে।

কিন্তু সুখময়ের পক্ষে আরও বিস্ময়। রমিত সেনগুপ্ত হঠাৎ গাড়ির দরজা খুলে বললেন, "উঠে পড়ুন।"

পরম সমাদরে এবং নির্দ্বিধায় সুখময়কে দুধ সাদা টার্কিস তোয়ালে-মোড়া অ্যামবাসাডরে উঠিয়ে নিলেন রমিত সেনগুপ্ত। একটুও ঝাঁকানি না দিয়ে চমৎকার টিউনিং করা গাড়িটা স্টার্ট করল। হাজার ভিড়ের মধ্যেও রমিত সেনগুপ্তের গাড়িটা চলছে যেন জলে সাঁতার কেটে।

সুখময যে নিঃশব্দে গাড়িটার তারিফ করছে তা রমিত সেনগুপ্ত বুঝতে পারলেন।

সুখময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে রমিত বললেন, "একটু অশালীন শোনালেও বলা যায়, রমণীদেহ এবং মোটরগাড়ির আকর্ষণীয়তা পুরোপুরি নির্ভর করে নিত্যতদারকির ওপর! গাড়িতে আমার ভীষণ পার্সোনাল ইন্টারেস্ট, নিজে ড্রাইভ করতেও ভালবাসি। দিল্লি থেকে যখন কলকাতায় চাকরি বদল করলাম তখন আমি বাই রোড কলকাতায় এসেছিলাম। নিজের স্ত্রী, নিজের গাড়ি এসব এক্সক্লুসিভ জিনিস, বুঝলেন মিস্টার মুখার্জি। যখন বিয়ে করবেন এবং গাড়ি কিনবেন তখন সব বুঝতে পারবেন।"

বোঝা যাচ্ছে সুখময়ের বায়োডাটা মিস্টার রমিত সেনগুপ্ত কোনোসময়ে

মন দিয়ে পড়ে নিয়েছেন। সুখময়ের যে বিবাহ হয়নি তা নিশ্চয় আবেদন পত্রে লক্ষ্য করেছেন। সুখময়ের যে গাড়ি নেই তা আন্দাজ করাও শক্ত নয়। কিন্তু ভদ্রলোক কেমন আশা করে বসে আছেন, সব দুঃসময় কাটিয়ে দিয়ে সহসার বন্ধু সুখময়ও একদিন গাড়ির মালিক হবে।

বেশ রসিক লোক এই রমিত সেনগুপ্ত। খোলাখুলি সুখময়কে তিনি বললেন, "সহপাঠিনী সহসার সঙ্গে আপনার যে কোনো অ্যাফেয়ার নেই তা আমার জানা। যখন আপনার বায়োডাটা দিলো তখন সোজাসুজি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ভাই নয়, দাদা নয়, হঠাৎ কার জন্যে তোমার এতো দুশ্চিন্তা? আই মাস্ট সে সহসা সোজাসুজি উত্তর দিয়েছে। আমাকে তার কনফিডেন্সে নিয়েছে। মিস্টার মুখার্জি, এই বিশ্বাস ব্যাপারটা আমি ভীষণ পছন্দ করি—নিজের তাস বিশ্বাসের মানুষকে দেখিয়েও বিশ্বসংসারে ভাল খেলা যায়। এই যে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ, যাঁদের কথা আপনি কয়েক বার পত্রপত্রিকায় লিখেছেন, ওঁরা বড় কেন? ওঁদের সব কিছু স্বচ্ছ, কোনো ব্যাপারে কোথাও কিছু লুকোবার নেই। আপনার আর্টিকেলে পড়লাম মজার কথাটা, বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন! খু-উ-ব ভাল লাগলো। প্রথম বয়সটা প্রবাসে ভেসে ভেসে বেড়িয়ে বাংলা ভাষার ভিতরের রসটা আমার আয়ত্ত হয়নি, মিস্টার মুখার্জি। তাছাড়া মা ছিলেন না। আমি দেখেছি, বাংলায় মেয়েলি কথাগুলো ভীষণ সুইট হয়। শান্তিনিকেতনে একটা রিজর্ট হোটেল আছে, নাম ছুটি, সেখানে এক অধ্যাপিকা মহিলা দয়াপরবশ হয়ে আমাকে কিছু টিচ করেছেন—আমি অবশ্য আরও অনেক ক্রিটিক্যাল বেঙ্গলি ইডিয়ম শিখতে চাই।"

রমিত সেনগুপ্তর গাড়ি কোথায় চলেছে তা সুখময় এখনও জানে না। রমিতের ইঙ্গিতে গাড়ির সারথী খুব চাপা স্বরে গাড়িতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্যাসেট চালিয়ে দিয়েছে। "রেজওয়ানা চৌধুরী, বন্যা—আমার কারেন্ট ফেভারিট।" বললেন রমিত সেনগুপ্ত। "বাংলাদেশের গাইয়েরা কৃপণ নয়, হৃদয় ঢেলে দিয়ে, সর্বস্ব নিবেদন করে রবীন্দ্রনাথকে ধরতে চায় ওরা।"

একমত হলো সুখময়। এবার বিষয় পরিবর্তন করলেন রমিত সেনগুপ্ত।

বললেন, "চাকরি বাকরি আপনার একটা হয়ে গেলে বিয়ে করতে বেশি দেরি করবেন না আমার মতন। জেনে রাখবেন, বিশ্বসংসারে একেবারে নতুন গাড়ি এবং খুব বুড়ো ড্রাইভার প্রায়ই মিসম্যাচ হয়ে যায়। তখন যে পথেঘাটে কতরকমের সমস্যা হতে পারে ভাবলে আপনি ভয় পেয়ে যাবেন," এই বলে দুষ্টুমি করে চোখ টিপলেন রমিত সেনগুপ্ত।

আপাতত সেনগুপ্তর লক্ষ্যস্থল সুতানুটি ক্লাব। রমিত সেনগুপ্ত তাঁর অতিথিকে বললেন, "এবার এই ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি দাঁড়াচ্ছি। সামনের বারে ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে হবে, তারপরের বার অবশ্যই প্রেসিডেন্ট। জেনে রাখবেন, যারা এই শহরের ক্লাবগুলো কন্ট্রোল করে তারাই শহর কলকাতাকে কন্ট্রোল করে। লিডারশিপের মস্ত পরীক্ষা এটা। দেখুন আমাদের সি-এমকে, সর্বহারার নেতা কিন্তু ক্লাব লাইফ ভীষণ ভালবাসেন। সেইজন্যে বিত্তবান এবং বিত্তহীন দুই মহলেই এই সি-এম সমান পপুলার। ওনলি সি-এম ইন দ্য ওয়ার্লড, যাঁর জীবিত কালে সুতানুটির ক্লাবে মাছ ভাজার নাম হয়ে গেলো বোস ফ্রাই। কই? লর্ড কারজন তো পারেননি ওই ক্লাবে নিজের নামে কারজন কাবাব রেখে যেতে। ডাক্তার বি সি রায় হয়তো ইচ্ছে করলে পারতেন, কিন্তু ভীষণ সেনসিটিভ লোক, বেঙ্গল ক্লাবের ভিতর ঢোকানো গেলো না। ইগো, সুখময়বাবু। ডাক্তার রায় এবং লর্ড কারজন দুজনেরই ইগো, তাই কারজন কাবাব বলে আমরা কিছু পেলাম না।"

"লেডিকেনি?" প্রশ্ন করে সুখময়। এটা ওর প্রিয় মিষ্টান্ন ছিল এক সময়।

রমিত সেনগুপ্ত জানালেন, "ওটাতে লর্ড ক্যানিং-এর এক ফোঁটা অবদান নেই। লর্ড ক্যানিংকে খুশি করবার জন্যে হাওড়ার ময়রারা একটা ভেল্কি দেখিয়ে গেলো। আমরাও সাহেবদের ওপর পাল্টা বদলা নিয়েছি কবিরাজী কাটলেট মারফত। কবিরাজের সঙ্গে এই সাহেবী কাটলেটের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই—কভারেজড্ কাটলেটকে কলকাতার ন্যাশনালিস্টরা স্বদেশীযুগে করে দিলে কবিরাজী কাটলেট! অর্থাৎ ডিমে দিয়ে কভার করা কাটলেট! একসময়ে লন্ডনে পাওয়া যেতো সুখময়বাবু।"

সুতানুটি ক্লাবের সামনে এসে রমিত সেনগুপ্ত অ্যাটাচি কেস থেকে সুখময়ের জীবনবৃত্তান্তপূর্ণ কাগজখানা বের করলেন। তারপর বললেন, "দেখি কী করা যায়। চিন্তা করবেন না সুখময়বাবু। বেশি উদ্বেগ থাকলে মানুষ চাকরির ইন্টারভিউতে ভীষণ খারাপ করে।"

এরপর মিস্টার রমিত সেনগুপ্ত ক্লাবের ভিতরে নিয়ে গিয়ে সুখময়কে একটা লেবু সোডা উইথ সল্ট অ্যান্ড সুগার খাইয়ে দিলেন। রমিত সেনগুপ্ত জানালেন, "এখানকার ভার্জিন মেরিও জগদ্বিখ্যাত ড্রিংক, কিন্তু ককটেল স্পেশালিস্ট আব্দুল আজ ডিউটিতে আসেনি। সেক্সপিয়র অসুস্থ হয়েছেন বলে তো সুইনবার্নকে দিয়ে হ্যামলেট লেখানো যায় না। রামকৃষ্ণদেবের ছবি হাতের গোড়ায় নেই বলে তো শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার ছবি ঠাকুরঘরে রাখা যায় না! বুঝতেই তো পারছেন, সুখময়বাবু।"

প্রকৃত দিলখোলা লোক এই রমিত সেনগুপ্ত। ড্রিংকের অর্ডার দিতে দিতে বললেন, "সত্যি কথা বলতে কি এখন আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না সুখময়বাবু। সুতানুটি ক্লাবের সেক্রেটারি না হওয়া পর্যন্ত আমার একটুও স্বস্তি নেই। সাড়ে তিনশ মেম্বারের সমর্থন আমাকে পেতেই হবে। দফায় দফায় ক্লাবের মেম্বারদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আজকাল আবার চা খেয়ে কেউ ক্লাবে ভোট দিতে অনুপ্রেরণা পায় না! অন্য পক্ষে মিস্টার গজানন কেজরিওয়াল রেগুলার দফায়-দফায় মেম্বারদের ড্রিংকস দিচ্ছেন। ঠিক হ্যায়! এই বঙ্গসন্তানও ড্রিংকস দিতে জানে! আমিও দফায় দফায় ড্রিংক ছড়াচ্ছি। নির্বাচিত হলে সবাইকে একদিন একত্রে আনন্দ দিতে হবে, সেদিন আপনাকেও নেমন্তন্ন করবো। আসতেই হবে কিন্তু।"

সুখময় যে ড্রিংক করে না তা ইঙ্গিতে রমিতকে বুঝিয়ে দিলো। রমিত অবশ্য ব্যাপারটায় গুরুত্ব দিলেন না। মৃদু হেসে সুখময়কে বললেন, "ঠাকুর রামকৃষ্ণও তো ড্রিংক করতেন না, কিন্তু যারা ড্রিংক করে তাদের সঙ্গে প্রাণখুলে মিশতে দ্বিধা করতেন না। এই অধমকে একটু কৃপাদৃষ্টি দেবেন!"

রমিত সেনগুপ্ত আরও বললেন, "বিজয়-উৎসবের দিনে আপনার প্রবলেমটা নিয়ে স্পেশাল মাথা ঘামাবো। আপনি ঘাবড়াবেন না, বাড়িওয়ালা চোখ রাঙালে তাঁকে বলবেন, দিনের দিন ঠিক ভাড়া তিনি পেয়ে যাবেন।"

কত ভাড়া জিজ্ঞেস করলেন রমিত সেনগুপ্ত। লজ্জা করলো, কিন্তু বলতে হলো সুখময়কে।

"লজ্জা করবেন না, সুখময়বাবু। এই ক্লাবে যত কাপ্তান ম্যানেজারকে ঢুকতে দেখছেন সব আপনার আমার মতন বাসাড়ে। অন্য লোকের বাড়ি, বসবাস করেন দিশী সায়েবরা, ভাড়া গোনেন কোম্পানি। আজকাল কিছু কিছু ওয়াইফ অবশ্য অন্য ধরনের চিন্তা করছে, আমাব ওয়াইফ ইরাবতী দুঃখ করছে, এক আঁচলা টাকা প্রতিমাসে এইভাবে ভাড়া না দিয়ে ওই টাকায় বাড়ি কেনার কিস্তি মেটালে হতো। কিন্তু এরা ভুলে যায়, সাদা চামড়ার সায়েবরা এই শহরে কখনো নিজস্ব সম্পত্তি করার কথা ভাবতেন না। ভাবলে পুরো শহরটা কবে সায়েবদের হয়ে যেতো। তখন চাপও ছিল না—মেমরা কেউ ভাবতে পারতেন না বছরের পর বছর এই শহরে পড়ে আছেন। আজকাল অন্য ব্যাপার, বউগুলো সবসময় ভাবছে আচমকা স্বামীর কিছু হলে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে কোথায় যাবে? বড় বড় কোম্পানিগুলোও গোপনে গোপনে এই ধরনের মানসিকতা পছন্দ করছে। এর নাম গ্লোরিয়াস আনসার্টেনিটি, গৌরবময় অনিশ্চয়তা! রসেবশে থাকো, কিন্তু কোথাও ভিত নেই, শিকড় গজাবার স্কোপ নেই, স্রেফ জলে ভেসে টিকে থাকা।"

রমিত সেনগুপ্ত যে হৃদয়বান লোক তার আরও প্রমাণ পাওয়া গেলো। তিনি ড্রাইভারকে বললেন, সুখময়কে এসপ্লানেডের বাস-স্ট্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। "বৃষ্টি আসছে মশাই, ভিজে গিয়ে জ্বর বাধিয়ে কোনও লাভ নেই। ব্যাচেলর মানুষ, কে আপনাকে দেখবে?"

সহসা

নির্ধারিত দিনে একটা ফোন করে রমিত সেনগুপ্তর অফিসে যাওয়া উচিত ছিল সুখময়ের। কিন্তু বিনা নোটিসেই ভদ্রলোক দেখা করলেন। তারপর আগের দিনের মতো সুখময়কে তিনি নিজের অ্যামবাসাডর গাড়িতে তুললেন।

সুখময়কে লক্ষ্যস্থলের হদিশ না দিয়ে রমিত সেনগুপ্ত আজ চৌরঙ্গি ধরে দক্ষিণমুখো চলেছেন। সোজা কথার মানুষ তিনি। একটু পরেই ঈষৎ বিষণ্ণভাবে বললেন, "শুনে থাকবেন নিশ্চয়, সুতানুটি ক্লাবের ইলেকশনে মাত্র পাঁচ ভোটে হেরে গিয়েছি। গজানন কেজরিওয়াল লাস্ট মিনিটে ওঁর জি-এম পোটলা বাসুর পরামর্শে সানডে নাইটে একটা গ্র্যান্ড আউটডোর বারবিকিউ থ্রো করে স্কোর করে দিলো। কলকাতার মানুষ টাকায় যতটা নরম হয়, তার থেকে একশ গুণ বেশি নরম হয় খাওয়ায়।"

"এবং পানীয়তে?"

"ওই হল মশাই! এই শহরে কোনও রেসপেক্টেবল সামাজিক গ্যাদারিঙে কেউ শুধু গোগ্রাসে গিলে যায় না, সলিড খাবার নামাবার জন্যে পানীয় তো চাই! বাই দ্য বাই, ঢাকায় গিয়েছিলাম, শুনলাম ওখানে সবাই জলকে পানি বলে। কিন্তু সব জল যে পানি নয় এ কথা বাংলা অভিধানে বলছে। পানের যোগ্য জল হচ্ছে পানি, অর্থাৎ ডোবায়, নর্দমায় পানি নেই, সেখানে জল আছে। এটা আপনি কোনও প্রবন্ধে পরিষ্কার করে লিখে দেবেন তো।"

রমিত সেনগুপ্ত এখনও নিরাশাবাদী হননি। সুতানুটি ছাড়াও আরও কয়েকটি ক্লাবের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে জড়িত। রয়াল, টলি, টার্ফ এগুলোও বিখ্যাত ক্লাব। সায়েবরা ভেবেচিন্তেই এইসব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গিয়েছেন সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরীতে, তা ছাড়াও আছে রোটারি। এ

সবেতেই বিশেষভাবে জড়িয়ে আছেন রমিত।

টলির ম্যানেজিং কমিটির দিকেও রমিত সেনগুপ্তর প্রখর নজর। এরপর তো রয়েছে ঘরের কাছে এবং হাতের গোড়ায় আধাস্বদেশী ক্যালকাটা ক্লাব। "বেঙ্গল ক্লাবে ইংরেজদের অপমান সহ্য করতে না পেরে ইন্ডিয়ানরা এখানে সায়েবদের ভদ্রতার জুতো মেরেছিলেন, ঠিক করলেন এক বছর অন্তর ক্লাবের সভাপতি হবেন শ্বেতাঙ্গ। মেরেছিস কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেবো না?"

রমিত বললেন, "ডেমক্রেটিক হয়েও ডেমক্র্যাসিকে ক্লাব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন দূরদর্শী সায়েবরা যাতে চমৎকার প্রতিষ্ঠানগুলো তথাকথিত গণতন্ত্রের চাপে থেঁতলে না যায়। তাই দিল মে ডেমক্র্যাসি, অথচ ফাইলমে অটোক্র্যাসি চালিয়েছেন সাহেবরা বিভিন্ন ক্লাবে। কে কবে কমিটিতে ঢুকবেন তা একসময় সায়েবরা নিঃশব্দে স্থির করেছেন অদৃশ্য অথচ অমোঘ এক শক্তির হাতছানিতে। আজকাল যাঁরা ক্লাবে সেন্ট পার্সেন্টি ডেমক্র্যাসি চাইছেন তাঁরা অবশ্যই খাল কেটে কুমির আনছেন। প্রকৃত উৎসাহী এবং প্রকৃত উদ্যমী ক্লাব সভ্যরা ভোটে হারার ভয়ে নির্বাচন থেকে পিছিয়ে যাচ্ছেন। যোগ্য লোকরা কমিটিতে দাঁড়াচ্ছেন না। কারণ যিনি গদগদ হয়ে সারাক্ষণ শত শত সভ্যের মানভঞ্জন ও মনোরঞ্জন না করতে পারবেন তাঁর পক্ষে ক্লাবের ব্যালটে বিজয়ী হওয়া একেবারেই সম্ভব হবে না।"

রমিত সেনগুপ্ত এখন পরিচিত মহলে নিজেকে জনপ্রিয় করছেন একের পর এক ড্রিংকের ভাউচার সই করে। বললেন, "ক্লাবে এক পয়সা খরচও করবো না অথচ সবাই আহ্লাদে আটখানা হয়ে আমাকে নিয়ে হরিকীর্তন করবে তা তো এ যুগে সম্ভব নয়। সব মানুষের মনের গেটে সারাক্ষণ যে তালা ঝুলছে তার মাস্টার চাবিকাঠি হলো এই ড্রিংকস। ফ্রি ড্রিংকস অফার করলে অতি বড় পাষাণ ভোটারের হৃদয়ও গলতে শুরু করে সুখময়বাবু।"

তাঁর প্রিয় ক্লাবের দিকে ড্রাইভ করতে করতে সুখময়কে এবার রমিত সেনগুপ্ত বললেন, "এই ক্লাবগুলো হলো কলকাতার প্রকৃত সম্পদ—রিয়াল

অ্যাসেট।"

এসব কথা এইভাবে শুনে বেকার সুখময় মুখার্জি আর কী করবে!

রমিত সেনগুপ্ত কিন্তু প্রবল উৎসাহে বলে চললেন, "অন্য বড় বড় শহরের তুলনায় কলকাতা কিন্তু এখনও ড্যাম চিপ। যাক না কেউ বম্বে জিমখানা কিংবা বম্বে ইয়াট ক্লাবের মেম্বার হতে, তখন ব্যাপারটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবে। ডলার টার্মসে ভাবলেও পকেট টন টন করবে। সে তুলনায় কলকাতায় তো ধর্মশালার চার্জ এইসব ক্লাবে। আপনিও একদিন নিশ্চয় এসব জায়গায় মেম্বার হবেন। ভাল চাকরি বাকরি খুঁজে নিন। তারপর পটাপট উন্নতি করুন। আমি নিজে আপনাকে মেম্বারশিপের জন্যে রেকমেন্ড করব। অফিসে ভাল কাজকর্ম করলে আপনার মেম্বারশিপের টাকা দেবে তো আপনার কোম্পানি।"

লোকটার হৃদয় আছে। ভাবতে পারে অন্য মানুষের জন্যে। সুখময়ের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো।

সুখময়ের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে রমিত সেনগুপ্তর।

যে কাজের জন্যে এতো ঘোরাঘুরি তা কিন্তু এখনও তেমন এগোচ্ছে না।

সহসা চুপি চুপি সুখময়কে বলেছে, "আমি তো যা চাপ দেবার দিয়েছি। লজ্জার মাথা খেয়ে তুমি ওঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে যাও। মিস্টার সেনগুপ্ত যে তোমার জন্যে ফিল করেন তা আমি জানি। ওঁর হার্টটা প্লাস্টিকের নয়। উষ্ণ হৃদয়টাই মানুষটার প্লাসপয়েন্ট এবং মাইনাস পয়েন্ট। ইদানীং একটু বেশি ড্রিংক করেন এবং টার্ফ ক্লাবে ঘোড়ার রেসিং নিয়ে

একটু বেশি মাথা ঘামান। কিন্তু এখনও একটা কোমল হৃদয় আছে। মানুষের কষ্ট দেখলে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিতে চান। যদিও হাত বাড়ালেই তো কাজ হয় না সব সময়।"

রমিত সেনগুপ্তর গাড়িতে চড়ে এর পরের বার টলিক্লাবেও গিয়েছে সুখময়।

রমিত বলেছেন, "আমাদের এই টলি ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট কান্ট্রি ক্লাবস্, সুখময়বাবু। ওই সায়েববাচ্চা বব রাইট-এর জোরে জায়গাটা এখনও রূপকথার রাজ্যের মতন সাজানো। ইংরেজরা এ শহরটাকে এক সময়ে কী রকম রেখেছিল এবং চিরকাল কী রকম রাখতে চেয়েছিল এতোদিন পরেও তার একটা মাত্র নমুনা এই শহরে পাবেন—এর নাম টালিগঞ্জ ক্লাব। লর্ড মাউন্টব্যাটেন পর্যন্ত এখানে এসে তৃপ্তি পেতে পারতেন। এখন কিছু কিছু ভেজাল হয়তো মিশছে। কিন্তু শক্ত হাতের শাসন সৌভাগ্যবশত এখনও সারাক্ষণ রয়েছে। এখানকার কমিটিতে ঢোকা ঢুকতে পারা মানে ইউ আর সামবডি, আপনার জীবনের একটা হিল্লে হয়ে গেলো। এখানে আমাকে ঢুকতেই হবে সুখময়বাবু।"

রমিত সেনগুপ্ত এরপর টলি ক্লাবের সফ্‌ট্ ড্রিংক খাইয়েছেন সুখময়কে। গাছ তলায় বসিয়ে বলেছেন, "এবার চেষ্টা চালিয়ে দেখি, আপনার একটা কিছু হওয়া দরকার। পিকুলিয়র শহর মশাই, আচ্ছা-আচ্ছা লোককে আপনার বায়োডাটা পাঠাচ্ছি আমরা কমপ্লিমেন্ট স্লিপ দিয়ে, ভদ্রতা করে একটা উত্তর পর্যন্ত কেউ দেয় না!"

এরপর সুখময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রমিত সেনগুপ্ত বলেছেন, "বুঝি, এসব কথায় আপনার বাড়িওয়ালার মন ভিজবে না।"

এরপর পকেট থেকে ঝট করে একটা খাম বার করে ফেলেছেন রমিত সেনগুপ্ত। "যদি কিছু মনে না করেন সুখময়বাবু, এই অনভেলপটা রেখে দিন আপনার ব্লেসেড্ বাড়িওয়ালার জন্যে—অন্তত একটা মাসের জন্যে আপনার সমস্যা পিছিয়ে যাবে। দেরিটা যখন আমিই করাচ্ছি তখন

ডেমারেজটা আমারই হওয়া উচিত। আপনি কিন্তু সহসাকে কিছু বলবেন না, সে লজ্জা পেয়ে যাবে।”

ভীষণ লজ্জা লেগেছিল সুখময়ের নিজেরই। খামটা শেষ পর্যন্ত সে নেয়নি। সবিনয়ে বলেছে, “অশেষ ধন্যবাদ, মিস্টার সেনগুপ্ত। আমার বাড়িওয়ালা কেদারবদরি যাচ্ছেন আজ। ফিরবেন পাঁচ সপ্তাহ পরে, সুতরাং এ মাসেই সমস্যাটা আমার মাথায় ভেঙে পড়ছে না।”

খামটা হাতে হাতে ফেরত দিতে পেরে শরীরটা যেন শান্ত হলো সুখময়ের।

রমিত এবার বললেন, “জানেন সুখময়বাবু, পৃথিবীর সব দেশ হুড়মুড় করে এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা ছাড়া। সাতচল্লিশ সালে যত নিরক্ষর এবং দরিদ্র ছিল এ দেশে এখন তাদের সংখ্যা আগের থেকে বেশি। একই সময়ে আমাদের প্রতিবেশীদের অনেকে তাদের রোজগার বাড়িয়েছে তিরিশ গুণ আমাদের তুলনায়। কী যে হবে। আমার ওয়াইফ বলে, এসব সারাক্ষণ ভাববার জন্যে নেতারা আছেন, আই এ এস-রা আছেন। তুমি অযথা ব্যস্ত হয়ো না। ইরাবতী আমার ব্লাডপ্রেসারের কথা ভাবে, আর আমি ভাবি শেষ পর্যন্ত আমাদের এই দেশটার কী হবে।”

সুখময় আজ রমিতের গাড়িতে লিফট নিতে কিছুতেই রাজি হয়নি। পায়ে হেঁটে টলি ক্লাব থেকে বেরিয়ে সে ধীরে ধীরে ট্রাম রাস্তায় এসেছে। সামনে মেট্রো রেল আছে, যতীন দাস পার্কে সহজেই নেমে পড়া যাবে। তা ছাড়া কিছু বাসও আছে। মেট্রোতে ভাড়া বেশি, সময় কম। বাসে সময় বেশি, ভাড়া কম। সময়ের কী দাম আছে সুখময়ের কাছে? সুতরাং বাসেই উঠে পড়লো সুখময়।

ক্লাবে বসে রমিত সেনগুপ্ত সেদিন সুখময়কে বাড়িতে সোজাসুজি খোঁজ নেবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। বিনা নোটিশে ছুটির সকালে বার্ডওয়ান রোডের বাড়িতে খোঁজ করতে গিয়েই সুখময় একটু লজ্জা পেলো।

তবে ইরাবতীর খবরটা ভালোভাবে পাওয়া গেল। ইরাবতীকে নিজের চোখে দেখা হয়নি, কিন্তু তার ছবি সুন্দর ফ্রেমে বন্দি হয়ে বার্ডওয়ান রোডের ড্রয়িং রুমে প্রস্ফুটিত পদ্মের মতন শোভা পাচ্ছে। সুখময়ের মনে পড়ছে, কলেজে ইরাবতীর শরীর একটু ভারী ছিল। সহসা একবার ব্যঙ্গ করেছিল, এই শরীরে ছাত্রদের হৃদয়েশ্বরী হলে ইরাবতীর নাম হয়ে যাবে ঐরাবতী!

সুখময় বাড়ি এসে অভিধান খুলে দেখেছিল, সমুদ্র থেকে উদ্ভূত হস্তির নামই ঐরাবত! ইরাবতীর সাম্প্রতিক ছবি কিন্তু বলছে, সে তার সুন্দর শরীরের যত্ন নিয়েছে, শাসন করেছে এবং তাকে আরও সৌন্দর্যময়ী করে তুলেছে।

সচ্ছল পরিবারে বিবাহ হলে সুদেহিনী মেয়েদের এমনই হয়ে থাকে, তারা সগৌরবে প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পায়। তাই তো হওয়া উচিত, এ-বিষয়ে সুখময়ের মনে কোনো দ্বিধা নেই।

সুখময়ের অবশ্য ইচ্ছে হয়েছিল, একবার ইরাবতীর সঙ্গে দেখা করে যায়। কিন্তু রমিত সেনগুপ্ত তো তার জন্যে যথেষ্ট করে থাকেন, সাতসকালে ওঁর ওপর আরও চাপ দিয়ে কী লাভ? অফিসে সেক্রেটারি, বাড়িতে বউ একই লোকের পিছনে একই উদ্দেশ্যে ফলো-আপ চালালে ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার আশঙ্কা থাকে।

রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার সময় শেষ। এবার সুখময়ের ভাগ্য খুলবে। রমিত সেনগুপ্তর দয়ায় শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় যে সুখময়ের চাকরি হয়ে যাবে তা অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে বেশ পছন্দসই চাকরিই জুটে

গিয়েছে সুখময়ের। নতুন কর্মস্থলে মাইনে আগের অফিসে যা পাচ্ছিল তার থেকে তিরিশ পা ট বেশি।

খবরটা পেয়ে ়ময়ের চোখে জল। নিয়োগপত্রটা সংগ্রহ করেই সে সোজা ছুটেছিল হল্ অ্যান্ড লাড্‌লোর হেড অফিসে।

সহসা এখন অফিসে নেই। সে কয়েক দিন ছুটি নিয়ে কলকাতার বাইরে গিয়েছে।

চাকরির চিঠি দেখে রমিত সেনগুপ্ত খুব খুশি হলেন। বললেন, "তিরিশ পার্সেন্ট বেশি না পেলে আজকাল কেউ চাকরি বদল করে না মিস্টার মুখার্জি। আমি আপনার হয়ে একটা 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' করেছিলাম। আপনার পুরনো চাকরির বর্তমান স্ট্যাটাসটা বন্ধুবর মিস্টার চৌধুরীর কাছে ব্যাখ্যা করিনি। আমার চাকরি নেই সেইজন্যে হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছি একথাটা দুনিয়াব সব লোককে ঢাক ঢোল বাজিয়ে বলে বেড়াতে হবে কেন? এতে তো মার্কেট প্রাইস কমে যাবে!"

"রমিতবাবু, আপনি যা করলেন তা এ যুগে কেউ করে না," সুখময় তাঁন হাত ধরে বলেছে।

সুখময়ের হাতটা উষ্ণভাবে ধরে বমিত উত্তর দিয়েছিল, "কী যা-তা বলছেন সুখময়বাবু! কেউ কিছু না করলে এই যে হাজার হাজার লোক প্রতিদিন চাকরিতে বেরুচ্ছে তাদের কাজ কী করে হলো? দুনিয়ার ক'টা লোক সবকাবি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে চাকরি পেয়েছে, সুখময়বাবু? তবে হ্যাঁ, কোথাও মানুষ দৌড়য় চাকরির পিছনে, আবার আজকাল অনেক চাকরিও ছোটে মানুষের পিছনে।"

সুখময় ওসব কথা বুঝতে চায় না। নিশ্চিত অনশনের হাত থেকে সে কোনোক্রমে বেরিয়ে এসেছে এই রমিত সেনগুপ্তর দয়ায়।

মিস্টার সেনগুপ্ত বলেছেন, "আমার ভূমিকাটা এখানে কিছুই নয়, সুখময়বাবু। আপনার কথা প্রথমে বলেছে সহসা। তারপর যেদিন গৃহিণী ইরাবতী জানতে পেরেছেন আপনার ব্যাপারটা সেদিন থেকে আমার তো জীবন যায়-যায় সিচুয়েশন্! আমি যত ওঁকে বলি খোঁজখবর করছি, ততই

অধৈর্য হয়ে উঠেছেন ইরাবতী।

একটু থেমে রমিত বলেছেন, "আপনি ভাগ্যবান মানুষ সুখময়বাবু। যাদের সঙ্গে কলেজে লেখাপড়া করেছেন তাদের সকলের হৃদয়ে আপনার জন্যে যথেষ্ট সফ্‌ট কর্নার রয়েছে। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই মিস্টার চৌধুরীকে অ্যাপ্রোচ করলাম আপনার জন্যে। ভাগ্যক্রমে মিস্টার চৌধুরীও একজন বিশ্বাসযোগ্য কাজের লোক খুঁজছিলেন। সুযোগ বুঝে ওঁরই একটা কাগজে প্রকাশিত আপনার শেষ লেখাটা মিস্টার চৌধুরীকে পাঠালাম। তারপর সব তো আপনার নিজের হাত যশ! বিজনেস ডিপার্টমেন্ট থাকবেন খবরের কাগজের। তারপর মিস্টার চৌধুরী হয়তো অন্য কোনও বিজনেসে আপনাকে ভাল পোস্টিং দেবেন। কসমেটিকস, প্রিন্টিং, টিভি প্রোডাকশন, অনেক নতুন বিজনেসে উনি তো বিস্তারিত হচ্ছেন। টিভিতে ভাল কিছু হলে, দেবেন সহসাকে একটা চান্স! টিভি স্টার হওয়ার খুব ইচ্ছে ওর, কিন্তু অজানা জায়গায় যতবার টেস্ট দিয়েছে ততবার রিজেক্ট হয়ে গিয়েছে স্রেফ নাকের জন্যে। অথচ খালি চোখে ওর নাকটা কি খারাপ লাগে আপনার?"

এরপর হো হো করে হেসেছিলেন রমিত সেনগুপ্ত। "ওহো আপনি তো বেলুড় মঠ-মিশনের লাইনে ঘোরাঘুরি করেন। মেয়েদের শরীর নিয়ে, ক্লোজ-আপ নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো আপনার স্বভাবের বিরুদ্ধে।"

এবার কোনো উত্তর দেয়নি সুখময়। রমিত সেনগুপ্তর কোনও কথার প্রতিবাদ করবে না সুখময়, আজ কৃতজ্ঞতা জানাবার দিন।

রমিত সেনগুপ্ত শেষে সুখময়কে বললেন, "স্ক্রিন টেস্টে সহসাকে অনেক অ্যাট্রাকটিভ দেখাবে ইরাবতীর থেকে। আসলে আমি শুনেছি, এ-লাইনের অনেক ক্যামেরাম্যান ভীষণ লুজ ক্যারাক্টার, স্পেশাল বেনিফিট না নিয়ে কিন্তু মহিলা আর্টিস্টকে কিছুতেই ছাড়বে না।"

পাম অ্যাভিনিউতে রাত বেশ এগিয়েছে, কিন্তু এখনও অন্ধকারের আধিপত্য শেষ হয়নি।

ইরাবতী ঘুমের ওষুধ খেয়ে ভাল ফল পেয়েছে, তার ঘুমের গভীরতা কমছে বলে এখনও মনে হয় না। অথচ এই ইরাবতী প্রসঙ্গে রমিত সেনগুপ্ত সেবার বলেছিলেন, "কমবয়সী মেয়েরা যত ডিলিকেট হয় তাদের ঘুমও ততো ঠুনকো হয়, সুখময়বাবু। দেখবেন, ডিসটার্বড হলে ওরা একটুতেই রেগে ওঠে। দেখুন না আমার বেটার হাফ ইরাবতীকে। হয়তো ধড়াস করে দমকা হাওয়ায় ঘরের একটা জানলার পাল্লা পড়ে গেলো, অমনি ওর ঘুমের দফারফা। তারপর সাধ্যসাধনা করেও ইরাবতীর ঘুম আসবে না।"

আজ অবশ্য ইরাবতীর মধ্যে সে রকম কোনো লক্ষণ নেই। একটা মানুষ যে পাশের বিছানায় একই ঘরে জাগ্রত অবস্থায় শুয়ে রয়েছে তা ওর খেয়াল নেই। পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে ইরাবতী।

চাকরিতে যোগ দিয়ে প্রথম মাইনে পেয়ে মিষ্টির বাক্স হাতে সুখময় গিয়েছিল রমিত সেনগুপ্তর বার্ডওয়ান রোড নিবাসে।

সময় অপরাহ্ন। ইরাবতীর মুখোমুখি হতে হয়েছে সুখময়কে। ইরাবতীকে সে খুঁটিয়ে দেখলো, তারপর সরল মনে বলতে পারতো, "ইরাবতী, তুমি কলেজলাইফ থেকে অনেক স্মার্ট, অনেক সুন্দরী হয়েছ।"

কিন্তু এখন সুখময়ের মানসিকতা অন্য, সে কেবল কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে ইরাবতীর স্বামী রমিত সেনগুপ্তকে।

রমিত সেনগুপ্ত খুশি হলেও মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, "এসব আবার কেন, সুখময়বাবু?"

সুখময় বুঝিয়েছে, ভেট নয়, ভদ্রতা নয়, স্রেফ প্রসাদ। পুজোর প্রসাদ। ভোরবেলায় সোজা দক্ষিণেশ্বরে চলে গিয়েছিল সুখময়। গতরাত্রে ভবানীপুর থেকে সংগ্রহ করেছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণর ফেভারিট ছানাবড়া। ঠাকুরের জন্মদিনে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ থেকে একবার আধমন ওজনের ছানাবড়া নিয়ে এসেছিলেন বেলুড়মঠে।

হাসতে হাসতে সুখময় বললে, "ঠাকুরের টপ ফেভারিট মিষ্টি, কিন্তু এই ছানাবড়ার বয়স বোধহয় বেশি নয়। শুনেছি, মোগল আমলের শেষের দিকে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে চলে এলে, নবাবের নির্দেশে লালবাগে এই ছানাবড়ার সৃষ্টি হয়। ঠাকুর ভালবাসতেন এই কারণে এটি তৈরি করতে গোরুর দুধ লাগে, হালকা ছানার মিষ্টি। কোনও এক ব্রাহ্ম নেতার সঙ্গে কথা বলে শ্রীরামকৃষ্ণ এতোই খুশি হয়েছিলেন যে তাঁকে রসে ডোবা ছানাবড়ার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন!"

একটা কাঁচের প্লেটে সুখময়কেই মায়ের প্রসাদী ছানাবড়া খেতে দিয়েছিল ইরাবতী। রমিত সম্পর্কে বলেছিল, "ওকে দেবো না, মিষ্টি খেয়ে খেয়ে ওর হুহু করে ওজন বাড়ছে। আপনার তো ফুটবল প্লেয়ারের মতন স্লিম চেহারা!"

"প্রসাদ বলে কথা! তার থেকে বঞ্চিত হওয়া!" রসিক রমিত মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন। দুঃখ করে বলেছিলেন, "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা—স্ত্রীর সব নির্দেশ মেটিকুলাসলি মেনে চলা ছাড়া আমার মতন মানুষের পথ নেই সুখময়বাবু।"

তারপর রমিত ব্যাখ্যা করেছিলেন। ইদানিং মিষ্টি এড়িয়ে চলছেন রমিত সেনগুপ্ত। "আমি এখন বিবেকানন্দ গ্রুপে—নোনতা 'এবং লঙ্কার পরম ভক্ত!"

ভুল হয়ে গিয়েছে, এর পরের বারে সে যখন আসবে তখন রমিতের জন্য কিছু মুখোরোচক নোনতা খাবার নিয়ে আসবে সুখময়।

রমিত তখনও রসিকতা চালাচ্ছেন। "নিয়মিত মিষ্টি খেয়েও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণর অমন শীর্ণ তনু, আর লঙ্কা চিবিয়েও বিবেকানন্দর অমন ভারী শরীর! ছবি দেখে মিলিয়ে নিন। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে ছানাবড়ায় কোনো ক্যালরি নেই এবং ভাজা মিষ্টিতে ওজন বাড়ে না!"

ততক্ষণ ইরাবতী গরম চায়ের নির্দেশ দিয়েছে। সে এখন সুখময়ের ব্যক্তিগত খোঁজখবর নিতে আগ্রহী।

"তোমার স্বামী আমার অশেষ উপকার করলেন," বলছে সুখময়। "এমন উপকার কেউ কারুর জন্যে আজকাল করে না, ইরাবতী।"

"রাখো রাখো," বাধা দিয়েছে ইরাবতী। "ভেবেচিন্তেই কাজটা হয়েছে! কোনদিন তুমি ফেমাস বেঙ্গলি রাইটার হয়ে যাবে, তখন আমরা তো সবাইকে বলতে পারবো সুখময় মুখার্জি আমাদের খুব কাছের লোক! প্রিয়লোক।"

এখানে-ওখানে টুকটাক প্রবন্ধ লিখে যে বড় লেখক হওয়া যায় না, তা সুখময় ভালভাবেই জানে। ইরাবতীর কথায় সে কেবল হাসলো।

রমিত বললেন, "সুখময়বাবু, আপনি রিলিজিয়ন, বিজনেস এবং সায়াপ্স সব মিশিয়ে একটা স্পেশাল ককটেল করুন—একটা দুর্দান্ত বাংলা উপন্যাস হয়ে যাবে! শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবৎ চিন্তা, ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের বিজ্ঞান চিন্তা আর জামশেদজি টাটাব বিজনেস ভাবনা এবং সেই সঙ্গে সাধারণ বাঙালির সীমাহীন বোকামি। আপনার উপন্যাসটা শুরু থেকেই জমে যাবে।"

ইবাবতী চা পরিবেশন করে সুখময়ের পারিবারিক খবরাখবর নিচ্ছে। "সুখময়, তুমি বিয়ে-থা করবে না?"

"দাঁড়াও! কোথায় মাথা গুঁজবো তাই জানতাম না গতমাসের গোড়ায়।"

রমিত বললেন, "নিজস্ব বাড়ি না হলে যদি বিয়ে করা না যায়, তা হলে

তো আমাদের হল্ অ্যান্ড লাড্‌লো অফিসের কোনও অফিসারের বিয়ে হতো না!"

সুখময় লক্ষ্য করলো এই অপরাহ্ণেই রমিত সেনগুপ্ত বেশ কিছুটা ড্রিংক করেছেন।

রমিত বলছেন, "কলকাতা শহরটা আমাদের আয়ত্তে থাকলো না, সুখময়বাবু। সব জায়গায় বহিরাগতর ভয়াবহ ইনভেশন। বহিরাগতরা আমাদের ক্লাব কমিটির মেম্বারও হতে দেবে না, সামান্য সব পোস্টের জন্যে ওরা জলের মতন টাকা ছড়াচ্ছে এক-একটা ক্লাবে। আমাদের কিন্তু হতাশ হলে চলবে না, সুখময়-বাবু। কোনোরকম ফাইট না দিয়ে হার স্বীকার করতে বাঙালিরা চিরকাল ভীষণ ভালবাসে। এবার কিন্তু আমাদের ক্লাবে তা কিছুতেই হতে দিচ্ছি না।"

একটু থেমেছিলেন রমিত সেনগুপ্ত। সকলের কাছে আসন্ন সংগ্রামের এই মেসেজ নাকি ছড়াতে হবে। প্রচার করতে গিয়ে মেম্বারদের সঙ্গে ভাববিনিময়ে বসতে হয়, ফলে উইক এন্ডে একটু বেশি ড্রিংক করতে হয় রমিত সেনগুপ্তকে!

রমিত সেনগুপ্ত বললেন, "আপনি চান্স পেলে চৌধুরীসায়েবের কোনও বাংলা কাগজে স্থানীয় লোকদের ঘরছাড়া হয়ে যাবার আশঙ্কার কথা লিখুন বিস্তারিতভাবে। বিপদটা যে জেনুইন তা সাধারণ মানুষ বুঝতে আরম্ভ করুক। বেরসিক বহিরাগতদের হাতে পুরোপুরি পড়লে কলকাতার এই ওয়ান্ডারফুল প্রতিষ্ঠানগুলো আর ক্লাব থাকবে না, সব গ্লোরিফায়েড পাইস হোটেলে অধঃপতিত হবে। অথচ আপনি প্যাংক্রিজ সায়েবের লেখা কলকাতার নামকরা বেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাস পড়ে দেখুন। রেস্তোরাঁ ব্যবসা চালাবার জন্যে সায়েবরা কখনও ক্লাব তৈরি করেনি, ক্লাব তৈরি হয়েছিল সহমর্মী মানুষের মিলনকেন্দ্র হিসেবে। মূল কথাটা হলো 'লাইক মাইন্ডেড পিপ্‌ল'। আনফরচুনেটলি, একমাত্র ড্রিংকসের সময় লাইক মাইন্ডেডনেস গড়ে ওঠে, কীর্তনরস আর কারণরস এই দুটোই হচ্ছে এখনও পর্যন্ত মানুষের গ্রেটেস্ট লেভেলার। সাধে কি আর রামকৃষ্ণদেব মাতালদের এমন স্নেহপ্রশ্রয় দিতেন!"

এইসব ঘটনা যা চোখের সামনে হয়ে গেলো তাই আজ কেমন গল্পের মতন মনে হচ্ছে।

সুখময়কে চায়ে বসিয়ে ইরাবতী সেদিন অন্য ঘরের ভিতরে গিয়ে অল্পসময়ের মধ্যে চোখ ধাঁধানো সাজগোজ করে বেরিয়ে এল রমিতের সঙ্গে বেরুবার জন্যে।

এটাও ফাইনাল সাজগোজ নয়, সুতানুটি ক্লাবের বিউটি পারলারে হেয়ার ড্রেসার-এর সঙ্গে আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। সময় সম্পর্কে ভীষণ সজাগ এই মিসেস কালরা—দশ মিনিট দেরি হওয়ায় সেদিন দামী ব্যাংকের নামী এম-ডির স্ত্রীকেই তিনি অ্যাটেন্ড করেননি। অথচ এই মহিলার স্বামী মিস্টার রোহিত বাটরা দু'বছরের মধ্যে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হবেন, অর্থাৎ ক্লাবের ভাবী ফার্স্ট লেডিকে হেয়ার ড্রেশারের অপমান।

রমিত বললেন, "দোষ দিতে পারো না, ইরাবতী। টাইম ইজ মানি, সময়কে অবজ্ঞা করেই আমাদের কলকাতার লোকদের এই অবস্থা। সেদিন রেসকোর্সে এক জাপানি ভিজিটরের সঙ্গে আলাপ হলো। জাপানী সায়েব বললেন, মণিবন্ধে এত রিস্টওয়াচ পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না, জাপানে তো নয়ই! অথচ ইন্ডিয়ায় কেউ বোধ হয় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঘোরাফেরা করে না।"

"জাপানিদের আবার সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি! বলুক না ওই ধরনের কথা প্যারিসে গিয়ে, তখন বুঝবে মজাটি।" এই মন্তব্য ইরাবতীর, বিউটি পারলারে যাবার আগেই যে অসামান্যা বিউটিফুল হয়ে বসে আছে।

সেদিন রমিত সেনগুপ্ত ও ইরাবতীকে দেখে কে ভেবেছিল অদ্ভুত এক পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে অপেক্ষা করছে দু'জনের জীবনে, যার দীর্ঘ ছায়া

আরও প্রসারিত হয়ে এক সময়ে সুখময়কেও সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করবে।

ইরাবতী সেদিন কথায়-কথায় ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদামণির ছোট্ট ছবির খোঁজ করেছিল।

সুখময় জানিয়েছিল, " এঁদের সেরা ছবি পাওয়া যায় এন্টালিতে অদ্বৈত আশ্রমের কার্যালয়ে।"

এই প্রতিষ্ঠানে সুখময়ের নিয়মিত যাতায়াত আছে। ওখানকার অরবিন্দ মহারাজের প্রসন্ন ব্যক্তিত্ব ও অস্ফুট ভালবাসা সুখময়কে বড় টানে।

সেদিন শুক্রবার। সুখময়ের নতুন অফিসে হঠাৎ ছুটি হয়ে গেলো।

চৌধুরী গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার স্ত্রী পরিণত বয়সে নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সারদামণির মতন। সংগঠনের মহাদুর্দিনে ঘোমটার আড়াল থেকে নিঃশব্দে তিনি কোম্পানির হাল ধরেছিলেন, কাউকে দিশেহারা হতে দেননি।

তাই চৌধুরীদের ব্যবসায়িক গতি দারুণ আর্থিক দুর্যোগেও স্তব্ধ হয়নি। অথচ এই মহিলা ইংরিজি লেখাপড়া তেমন জানতেন না। জীবনের প্রধান সত্যগুলো বুঝবার জন্যে যে কোনও বই পড়া বিদ্যার প্রয়োজন হয় না তা এই সব বাঙালি মহিলাকে দেখলে অতি সহজেই বোঝা যায়।

মৃতদেহ সৎকারের জন্য শ্মশানে যাওয়ার ব্যাপার নেই, কারণ এই নিষ্ঠাবতী ভদ্রমহিলা তাঁর দেহ দান করেছেন হাসপাতালে। হাসপাতালে দেহ পৌঁছে দেওয়ার পরে কেবল একটা সার্টিফিকেট মিলবে, সেইটাই ডেথ সার্টিফিকেটের কাজ করবে।

কয়েকদিন আগে এন্টালির অদ্বৈত আশ্রমে হাজির হয়েছিল সুখময়।

মাইনের টাকা থেকে সে মাসিক 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক হয়েছে। ইংরিজি কাগজ একটানা একশ বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন মঠ-মিশনের সন্ন্যাসীরা। প্রকাশন সংস্থার শো রুমে ঢুকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও জননী সারদামণির ছবি সংগ্রহ করেছে সুখময়, ছবি নির্বাচনে তাকে সাহায্য করেছেন সদাপ্রসন্ন অরবিন্দ মহারাজ। হাল্কা ফ্রেমে বাঁধানো ছবিগুলো সঙ্গে নিয়ে সুখময় কয়েকদিন ধরে ঘুরছে।

অতএব রামকৃষ্ণ ও তাঁর অনুরাগিণী মিসেসকে ইরাবতী ও তার হাজবেন্ডের সেফকাস্টডিতে তুলে দেবার কাম্য সময় শুক্রবারের এই দ্বিতীয়ার্ধ।

প্রথমে হল্ অ্যান্ড লাড্লোর অফিসে গিয়ে সহসাকে দেখতে পেলো না সুখময়।

সহসা নাকি কাউকে কিছু না জানিয়ে ক'দিন অনুপস্থিত রয়েছে। ওর সঙ্গে দেখা হলে কারণটা জিজ্ঞেস কববে সুখময়। ভালমানুষ বস্ পেলে তাকে এক্সপ্লয়েট করাটা ঠিক কিনা জিজ্ঞেস করবে।

কিন্তু সহসার বসবার ঘরের দিকে আরও এগিয়ে একটু খোঁজ করতেই কী রকম অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হলো।

একজন চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো, "আপনি তো সহসার সহপাঠী বন্ধু। ব্যাপারটা আপনি জানেন না?"

হা ঈশ্বর! সহসার কোনও অমঙ্গল হয়নি তো?

এবার যেন বোমা বিস্ফোরণ হলো। সহসা এবং তার সায়েব রমিত সেনগুপ্ত দু'জনেই নাকি মিসিং!

নিরুদ্দেশ! "দু'একদিনের মধ্যে কাগজে পড়বেন ব্যাপারটা। একটু অপেক্ষা করুন।" এই বলে সন্ত্রস্ত এক সহকারী দ্রুত সুখময়ের সান্নিধ্য এড়িয়ে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কী ব্যাপার? সুখময় কিছুই বুঝতে পারছে না। সহসা ও রমিত সেনগুপ্তর হঠাৎ কী হলো?

কিছুক্ষণ পরে অফিসের একজন মুখচেনা ভদ্রলোক বিভ্রান্ত সুখময়কে জানালেন, “ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, মিস্টার মুখার্জি। ওঁরা দু'জনে বোধহয় একসঙ্গে ট্যুরে বেরিয়েছিলেন। কেউ বলছে লক্ষ্যস্থল ছিল পাটনা। কেউ বলছে ওঁরা চুপিচুপি এলাহাবাদে চলে গিয়েছেন। কোথাকার টিকিট কে কেটেছেন তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কেউ বলছে, মিস্টার রমিত সেনগুপ্ত প্রথমে কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছেন নিঃশব্দে, কোয়ায়েটলি। তারপর আমাদের সহসার কী যে হলো! সহসা হঠাৎ কোথায় চলে গেলো তা এখনও রহস্যাবৃত। নিজের ওয়ান রুম অ্যাপার্টমেন্টেও সহসার কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।”

প্রবল উত্তেজনায় মাথাটা ঘুরছে সুখময়ের। এদের দু'জনেরই কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

“সহসা তো আপনার বান্ধবী ছিল। বলুন তো রমিত সেনগুপ্তর সঙ্গে ওর কোনও গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কিনা?” একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোক অফিসের মধ্যেই সুখময়ের কাছ থেকে জানতে চাইলেন।

“এসব প্রশ্নের আমি কী উত্তর দেবো? এঁরা দু'জনই অতি দয়ালু, অতি চমৎকার মানুষ।” সুখময় উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে পারছে না।

“দয়ালু হলেই মানুষ চমৎকার হয় না, সুখময়বাবু। হয়তো সহসা আপনাকে পছন্দ করতো বলেই রমিত সেনগুপ্তও আপনাকে পছন্দ করতেন। মানুষ কখন যে কী কারণে কার জন্যে টান অনুভব করে এবং প্রয়োজন হলে তাকে টানাটানি করে তা বলা ভীষণ শক্ত। টিভিতে হিন্দি সিরিয়ালগুলো দেখুন, লাইফের সব রহস্য এবং সমস্যা বুঝতে পারবেন—রামায়ণ মহাভারত পুরাণ এসব আর পড়বার কোনও প্রয়োজন নেই।”

সুখময় দূর থেকে দেখলো, জাঁদরেল চেহারার বেশ কয়েকজন লোক রমিত সেনগুপ্তর অফিস ঘরে ঢুকে সব কিছু তছনছ করছে।

যা খবর পাওয়া গেলো, এঁরা কোম্পানির অডিট ডিপার্টমেন্টের লোক। তাঁদের সঙ্গে সারাক্ষণ রয়েছেন এম-ডির পরিচিত একজন প্রাক্তন ডিসি-ডিডি পুলিশ অফিসার। রমিত সেনগুপ্তর অনুপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি ছাড়াই ঘরে

ঢুকে এঁরা কাগজপত্র বার করছেন, দেখছেন এবং সরিয়ে রাখছেন।

যে মানুষটা কোম্পানির কাজে ট্যুরে গিয়েছে তার অফিসঘরে এইভাবে গায়ের জোরে ঢোকা যায়? ব্যাপারটা সুখময় ঠিক বুঝতে পারছে না।

অফিসটা কারুর পৈত্রিক ভিটে নয়! এখানকার সবটাই বাইরের ঘর, অন্দরমহল বলে এখানে কিছু নেই। সব কোম্পানির। তাঁদের যতক্ষণ ইচ্ছে ততক্ষণই কেবল তুমি এখানে আসর আলো করে বসতে পারো—কিন্তু সব সম্পর্কটা কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে কোনও মানবিক অনুভূতি আশা করাটা নিতান্তই বোকামি! স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, বিজনেসটা দানছত্র নয়, বিজনেসে চক্ষুলজ্জার কোনও স্থান নেই।

একজন বেয়ারা সামনে এসে দাঁড়ালো। সুখময়কে কয়েকবার সে যেন সহসার কাছে বসে থাকতে দেখেছে।

হারাধন বেয়ারা এবার সুখময়ের আরও কাছে এসে চুপি চুপি বললো, "কী হলো বলুন তো বাবু? সায়েব এবং সহসা দিদিমণি হঠাৎ কোথায় চলে গেলেন? এমন তো কখনও হয়নি! সহসা দিদিমণির কোনও বিপদ হবে না তো?"

অবশ্যই কারও বিপদ হয় আসন্ন অথবা এসে গিয়েছে—সেটা সহসার, না রমিত সেনগুপ্তর, না অফিসের অন্য কারুর তা এই মুহূর্তে সুখময়ের পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।

মধ্যবয়সী হারাধন বেয়ারা এবার সুখময়কে বললো, "সহসা দিদিমণিকে তো অনেকদিন দেখছি। সায়েবের সঙ্গে ওঁর খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। সহসা দিদিমণি সায়েবকে খুব সম্মানও করতেন, বলতেন এমন দিলখোলা দিলদরিয়া সায়েব কোথাও পাওয়া যাবে না!"

একটু থেমে হারাধন বললো, "তা দিলদরিয়া সায়েব বটে। জানেন, এই গত মাসে আমার বউকে দু'সপ্তাহ পিজি হাসপাতালে রাখতে হলো। সায়েব বললেন, হারাধন, ফ্রি বেড থেকে সরিয়ে নিয়ে মিসেসকে পেইং বেডে দাও। চুপিচুপি তিন হাজার টাকা আমার হাতে গুঁজে দিলেন না চাইতে। আমার নিতে ভীষণ লজ্জা হচ্ছিল, কিন্তু সায়েব শুনবেন না। বললেন, অত

লজ্জা হলে পরে ফেরত দিয়ে দেবে, এখন আগে বউকে সুস্থ করে বাড়ি ফেরত নিয়ে যাও। তার ভাল পথ্যের ব্যবস্থা করো।"

হল্ অ্যান্ড লাড্‌লোর এই অফিসে বেশিক্ষণ ঘোরাঘুরি করা নিরাপদ নয় বুঝেছে সুখময়। কিন্তু ভয় পেয়ে প্রিয়জনদের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার সময়ও তো নয় এটা।

একজন কেরানি জানতে চাইছেন, রমিতবাবুকে কি ওরা অ্যারেস্ট করেছে?

সবাই শুনছে, কিন্তু কেউ মুখ খুলছে না। এই অবস্থায় ইরাবতী সেনগুপ্তর খবর জিজ্ঞেস করবে কে?

অগতির গতি হারাধান বেয়ারাই এখন একমাত্র ভরসা। সে বললো, "অন্য দিদিমণিরা বলছেন, সায়েবের সঙ্গে সেক্রেটারিও যখন বেপাত্তা হয়েছেন, তখন মিসেস সেনগুপ্ত নিশ্চয়ই স্বামীর সঙ্গে বাইরে যাননি।"

অফিসে দাঁড়িয়ে থেকে আরও একটা নোংরা কথা সুখময়ের কানে এসেছিল। "দুই মহিলা ও এক পুরুষে কখনও মধুচন্দ্রিমা হয় না। তিন জন 'টু মেনি'!"

বোঝা যাচ্ছে রমিত সেনগুপ্তকে অপছন্দ করার লোকও এই অফিসে যথেষ্ট আছে।

হল্ অ্যান্ড লাড্‌লোর সদর দপ্তর থেকে বেরিয়ে কলকাতার রাজপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বেশ ভাবিত হয়ে পড়লো সুখময়।

এখন সুখময়ের কি কর্তব্য? তার মতন সামান্য একজন মানুষের বিনা নোটিশে উপস্থিতি ইরাবতী কি পছন্দ করবে? মানুষ যখন বিপদে পড়ে, অপমানিত হয়, দুঃখ পায় তখন স্বল্পপরিচিত মানুষের ভিড় থাকলে কখনও কখনও কষ্ট বাড়ে। অনেকেই তখন একলা থাকতে চায়, কারণ চেনা মানুষের উপস্থিতি মানে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

কিন্তু কিছুক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার পরে সুখময়ের মধ্যে অন্য ভাবনা আসছে।

এই যে চেনা-জানা কেউ অসুস্থ হলেই ইন্দিরা গান্ধী রোগীকে হাসপাতালে দেখতে যেতেন এর একটা বিশেষ মূল্য আছে। অভাবনীয়

বিপদের মধ্যে বড়জোর ইরাবতী দেখা করবার ফুরসত পাবে না, কিংবা পরে আসতে বলবে। তা বলুক ইরাবতী। কিন্তু সুখময় এখন কিছুতেই বিপদের মধ্যে ইরাবতী কেমন আছে তা খোঁজ না করে বাড়ি ফিরবে না।

অতএব কালবিলম্ব না করে একটা মিনিবাসে চড়ে অফিসপাড়া থেকে হল্ অ্যান্ড লাড্‌লো কোম্পানির বার্ডওয়ান রোড ফ্ল্যাটে হাজির হয়েছে সুখময়।

বাইরের লোক দেখে বার্ডওয়ান রোডের দারোয়ান জিজ্ঞাসা করলো, "আপনি কি কোম্পানির লোক? না পুলিশের লোক?"

সুখময়ের চাপা উত্তর : "আরে বাবা, আমি কারও লোক নই—স্রেফ সেনগুপ্তদের চেনাজানা লোক।"

"তাহলে শুধু শুধু নিজের বিপদ ডেকে আনবেন কেন? সেনগুপ্তদের চেনাজানা শুনলেই তো পুলিশ আপনাকে থানায় তুলে নিয়ে যাবে, জিজ্ঞাসাবাদ করবে।" বিনামূল্যে দারোয়ানের কাছ থেকে পরামর্শ পেয়েছিল সুখময়।

দোতলায় উঠে সুখময় বুঝতে পারলো, ইরাবতীর পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাও সহজবোধ্য কারণে দরজা বন্ধ করে রেখেছেন, ডাকাডাকিতে তাঁরা সাড়া দিচ্ছেন না। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, প্রতিবেশীরা এইসব অপ্রীতিকর খানাতল্লাসির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে উৎসাহী নন।

সুখময়ের চিন্তা বাড়ছে। আসলে ব্যাপারটা কী? রমিত সেনগুপ্ত মানুষটি ভাল আছেন তো? কলকাতার বাইরে ওঁর কোনও দৈহিক বিপদ হয়নি তো? উনি সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন তো? রমিত, ইরাবতী ও সহসা সম্পর্কে হাজার রকম প্রশ্ন সুখময়ের মনে উঁকি মারছে।

বার্ডওয়ান রোডের দোতলার ইরাবতীর ফ্ল্যাটে বেল বাজাতে গিয়েও বাধা পেলো সুখময়। একজন সিকিউরিটির লোক কর্কশভাবে জানিয়ে দিলো ভিতরে যাওয়া চলবে না, ওখানে সার্চ চলছে। ইরাবতীর ল-ইয়ার হলে আপনি যেতে পারেন। আরে বাবা এই পৃথিবীতে সবাই উকিল নয়, মুহুরি নয়, ব্যারিস্টার নয়। প্রতি পরিবারের দু'একজন বন্ধুও থাকে। ইরাবতী কেন বন্ধুবিহীনা হবে?

সার্চ মানে তো সন্ধান। কিন্তু এমন বিপুল আয়োজন করে কীসের সন্ধান?

সুখময় পরে অবশ্য শুনেছে, টেকনিক্যাল কথাটা হলো সার্চ অ্যান্ড সিজার অর্থাৎ প্রথমে অনুসন্ধান ও পরে যথাসময়ে বাজেয়াপ্তকরণ। তল্লাশি চালিয়ে হাতের গোড়ায় সন্দেহজনক যা পাও তা সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করো।

সিকিউরিটি গার্ডদের তোয়াক্কা না করে একটু জোর করেই রমিত সেনগুপ্তর লিভিং রুমে ঢুকে পড়ল সুখময়। ঢুকে দেখলো, ঘরের মধ্যে দক্ষযজ্ঞ এবং লঙ্কাকাণ্ড একই সঙ্গে চলেছে।

এই বাড়িতে এই মুহূর্তে কোনো প্রাইভেসি নেই। রমিত সেনগুপ্তর বেডরুমে উঁকি মেরে সুখময় দেখলো, সেখানে এক কোণে ইবাবতী মাথা নিচু করে বসে অঝোরে কাঁদছে, আর জনাকয়েক জাঁদরেল লোক ও দু'জন মহিলা সেনগুপ্ত পরিবারের বাক্স, আলমারি, টেবিলের ড্রয়ার ইত্যাদি খুলে হাতড়ে হাতড়ে কাগজপত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সুখময়কে দেখে ইরাবতী বেশ অবাক হয়ে গেলো। সুখময়ও এইসময় কী বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। যে জন্যে এখানে আসা সেই কাজটাই এবার সেরে ফেললো সুখময়।

যারা সার্চ করছে তারা সবিস্ময়ে দেখলো নবাগত ভদ্রলোক এই বাড়ির বিপর্যস্ত গৃহিণীকে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং মা সারদামণির ছোট্ট ছবি উপহার দিচ্ছেন। উপহার দেবার সময়ই বটে!

ইরাবতী সেনগুপ্ত যেন বিরাট কোনও আশ্রয় খুঁজে পেলো এই ভাব করে ছবি দুটো বুকে ছুঁইয়ে চোখ বুজে প্রার্থনা শুরু করলো।

সার্চপার্টির কে একজন ব্যঙ্গ করে বললো, "বড়লোকদের কত রকম গুরুদেব, ঠাকুরদেবতা! ওঁরাই তো দেশের চোর জোচ্চোরদের বিপদ থেকে সারাক্ষণ রক্ষে করছেন!"

সুখময় লোকটির কাছে গিয়ে বললো, "এই গদাধর চাটুজ্যেকে চেনেন আপনি? এই ঠাকুর গরিবদের ঠাকুরও ছিলেন। নিজেও তিনি নিতান্ত গরিব ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে চাল-কলা বাঁধা পুরুতঠাকুর, মাসে মাত্র পাঁচটা

টাকা পেতেন। চাঁদা তুলে তাঁর চিকিৎসা হয়েছিল।"

লোকটা একটু ঘাবড়ে গেলো। এবার সুখময় সবাইকে অনুরোধ করলো, "আপনারা এই ঘরে সিগারেট খাবেন না, প্লিজ।"

সুখময়ের বিদ্রোহী মূর্তি দেখে সবাই সিগারেট নিভিয়ে ফেললো। এরা আন্দাজ করলো, শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি থাকলে বিড়ি সিগারেট খাওয়া যায় না। সুখময় ভাবলো, লোকগুলো যা বুঝেছে বুঝুক। বেডরুমে ঢুকে একজন মহিলার সামনে এইভাবে স্মোক করাটা মোটেই ভদ্রতা নয়, যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে হুঁকো খেতে ভালবাসতেন এবং এখনও বেলুড়মঠে তাঁকে প্রতি সন্ধ্যায় হুঁকো ভোগ দেওয়া হয়।

সুখময় জানতে পারলো ইরাবতীর দুপুর থেকে খাওয়া হয়নি। সুখময় এবার লোকগুলোকে বললো, "দয়া করে আমাদের একটু ছুটি দিন। এই মহিলা এখনও কিছু খাননি।"

একতরফা হাঙ্গামা বোধহয় বন্ধ হলো। চাপে পড়ে ওরা এবার পিছু হটলো একটু। সেই সুযোগে রান্নাঘরে ঢুকে ফ্রিজ খুললো সুখময়! ওখানে কিছু পাঁউরুটি আর মাখন রয়েছে। দুটো টমাটোও দেখতে পেলো সুখময়। এবার নিজেই দ্রুত ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ তৈরি করে ফেললো সুখময়।

ইরাবতীকে বললো, "কিছু খেয়ে নাও ইরাবতী। এদের সঙ্গে আমাদের অনেকক্ষণ লড়তে হবে। কিছু না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বে।"

আজ স্বয়ং ঠাকুর এবং সারদা সরস্বতীকে নিজের বাড়িতে অতিথি হিসেবে পেয়েছে ইরাবতী। তাই উপোস করাই উপযুক্ত মনে করেছিল। কিন্তু সুখময় রাজি হলো না। আজ সকাল থেকে বার্ডওয়ান রোডে যে পরিস্থিতি চলছে তাতে ইরাবতী অনাহারে রয়েছে, একে উপবাস বলে না। ঠাকুর যেদিন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এখানে প্রতিষ্ঠিত হবেন সেদিন অবশ্যই উপবাস করতে পারবে ইরাবতী।

ইরাবতী তার নিজের বাড়িতে বসে অনাহূত অতিথির তৈরি করা স্যান্ডউইচ মুখে দিচ্ছে। আর সেই সুযোগে সুখময় ঝটপট দু'কাপ চাও বানিয়ে নিয়েছে। লজ্জা করে মাত্র এক কাপ চা করেনি দেখে ইরাবতী

আশ্বস্ত হলো।

সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত বার্ডওয়ান রোডে সার্চ অথবা অবাধ তছনছ অব্যাহত রইলো। সুখময় বুঝতে পারছে না আরও কতক্ষণ এইভাবে আক্রমণ চলবে।

সার্চপার্টির মুখপাত্র বললেন, সারারাত ধরে তাঁদের কয়েকজন প্রতিনিধি এই ফ্ল্যাট পাহারা দেবেন, তার আগে কিছু আলমারি এবং একটা ঘর সীল হবে।

তারপর প্রয়োজনে আগামী কাল সকালে আবার তল্লাশির কাজ পুরোদস্তুর আরম্ভ হবে।

দলের কর্তা সবিনয়ে জানতে চাইছেন সুখময় এঁদের কে? সুখময় উত্তর দিয়েছে, "জেনে লাভ নেই। পারিবারিক বন্ধু বলতে পারেন।"

ফ্যামিলি ফ্রেন্ড কথাটা ইরাবতীরও খুব ভাল লাগলো। কেউ কেউ হয় ব্যক্তিগত বন্ধু আবার কেউ হয়ে ওঠে গোটা পরিবারের বন্ধু। এমন পারিবারিক বন্ধু যাদের নেই তারা সত্যিই অভাগা।

"আপনারা শুধু শুধু সারারাত ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকবেন কেন?" জিজ্ঞেস করলো সুখময়।

এখানে সমস্ত রাত সকলের বসে থাকবার যে প্রয়োজন নেই তা সার্চ পার্টি বুঝতে পারছে। দু'জনকে রেখে ওরা এখনই বিদায় নেবে। কিন্তু ওদের আশঙ্কা, মিস্টার রমিত সেনগুপ্ত কাছাকাছি কোথাও আত্মগোপন করে আছেন, রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তিনি নিজের বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্যে হঠাৎ হাজির হতে পাবেন। সেইটাই হবে এই দলের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ! স্বয়ং রমিত সেনগুপ্তকে সার্চের জিনিসপত্তর সহ সংগ্রহ করতে পারলে ওদের পক্ষে খুব ভাল হয়।

সার্চ পার্টি দু'জন প্রতিনিধিকে রেখে বিদায় নিল, কিন্তু সুখময়ের দুশ্চিন্তার অবসান হলো না। এবাড়িতে ইরাবতীকে দেখবার কেউ থাকছে না। কাজের লোকটিও ভয়ে অদৃশ্য হয়েছে। যে মেয়েটি প্রতিদিন ঘঁর পরিষ্কার করে, সেও ভয় পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। এই অবস্থায় কী করা যায়?

সহসা

বার্ডওয়ান রোড থেকে সেই রাত্রে পাম অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে ফেরা হলো না সুখময়ের। ইরাবতী ভীষণ ভয় পেয়েছিল। এমন অসহায় অবস্থায় তাকে ফেলে চলে আসার কথাই ওঠে না।

খবরাখবর নিয়ে সুখময় যা বুঝেছে, ইরাবতীর কোনও নিকটআত্মীয় এই শহরে বসবাস করেন না। ইরাবতীর বাবা-মা তো গত বছরে গত হয়েছেন এবং তারপরই সদানন্দ রোডের ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ইরাবতীর একমাত্র ভাই এখন বিদেশে। সেখানেও তো কোনওক্রমে জীবনধারণ। ভাই বর্তমানে স্টুডেন্ট ভিসায় কোনওরকমে ব্যাকডোর জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত রয়েছে, একবার ইন্ডিয়াতে ঘুরে যাবারও উপায় নেই, তা হলে ফিরে যাবার ভিসা হয়তো পাওয়া যাবে না। এদেশে যাঁরা মার্কিন ভিসা বিতরণ করেন তাঁরা নিজেদের আকবর বাদশার সমতুল্য মনে করেন।

বাইরে থেকে যারা সার্চ করতে এসেছিল ঝড়ের মতন তারা দু'জন প্রতিনিধিকে ফেলে রেখে ঘটনাস্থল থেকে বিদায় নেবার পরে সুখময় একবার বার্ডওয়ান রোড ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েছিল কিছু খাবার কিনে আনতে।

ইরাবতী কিছুই খেতে চাইছিল না, কিন্তু শরীর রক্ষার জন্যে খাওয়া তো প্রয়োজন। যা মনে হচ্ছে, ইরাবতীর সামনে রয়েছে দীর্ঘ সময়ের সংগ্রাম এবং এর জন্যে যথেষ্ট ধৈর্য প্রয়োজন হবে।

রাত্রে বার্ডওয়ান রোডের ড্রইং রুমে পাতা কার্পেটেই সুখময় শুয়ে পড়েছে। আর পাশের ঘরে নিজের এসি বেডরুমে কামপোজের দুটো ট্যাবলেট খেয়েও ঘুমকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারেনি ইরাবতী।

পরের দিন ভাগ্যে শনিবার। সুতরাং অফিসে যাওয়ার তাগিদ নেই সুখময়ের।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, পাকেচক্রে এই মুহূর্তে সেনগুপ্ত পরিবারের স্বার্থ দেখার জন্যে সুখময় ছাড়া আর কেউ কাছাকাছি নেই। অথচ সুখময় এইসব সার্চের বিষয় কিংবা কারুর বেপাত্তা হবার বিষয়ে কিছু জানে না।

বার্ডওয়ান রোড থেকে বেরিয়ে, আরও জানবার তাগিদে অগত্যা সুখময় তার এক সাংবাদিক বন্ধুর শরণাপন্ন হয়েছে। ব্যাপারটা ভালভাবে জানা প্রয়োজন।

এই রিপোর্টার বন্ধুর সঙ্গে হল্ অ্যান্ড লাড্‌লোর এম ডি সদাশিব কাঞ্জিলালের ভালই পরিচয় আছে। দু'জনেই কোনও এক মাতাজীর কাছে কয়েক বছর আগে একসঙ্গে যোগাভ্যাসের শিক্ষা নিয়েছেন সুদূর পুণেতে। এখনও দু'জনের মাঝে-মাঝে দেখা হয়ে যায় কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। যদিও সদাশিব কাঞ্জিলাল সম্প্রতি মাতাজীর আশ্রয় ত্যাগ করে অন্য এক গুরুদেবকে অবলম্বন করেছেন।

এই গুরুদেব নাকি এক সময় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলে . তিনি এখন বলেন, একমাত্র ঈশ্বরই মানুষের হিসেবের বাইরে, আর সব কিছুই হিসেবের মধ্যে। হিসেবসংক্রান্ত এই বিশেষ বক্তব্যটা সদাশিব কাঞ্জিলালের মনে খুব ধরেছে। যিনি হিসেবের বাইরে রয়েছেন তাঁকে মানুষ কী করে হৃদয়ঙ্গম করবে, সারাক্ষণ এই প্রশ্নেরই সমাধান খুঁজছেন সন্ধানী সদাশিব কাঞ্জিলাল।

খোঁজখবর নিয়ে সাংবাদিক বন্ধু বললেন, "সুখময়, ব্যাপারটা তেমন ভাল মনে হচ্ছে না। এই রমিত সেনগুপ্ত লোকটি বাঙালি সমাজের এবং বাঙালি অফিসারদের মুখ ডুবিয়েছে মনে হচ্ছে।"

"এসব বোলো না ভাই, এই মানুষটি সাহায্য না করলে আমাকে এতোদিনে কলকাতা ছেড়ে দেশে চলে যেতে হতো। হি হ্যাজ এ হার্ট অব গোল্ড।"

সোনার হৃদয় নিয়ে মানুষ দীর্ঘজীবী হয় না, এই অপ্রিয় কথাটাই সাংবাদিক বন্ধুটি কিছুক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তারপর একসময় বললেন, "রমিত সেনগুপ্তর মঙ্গলকাঙক্ষী হবার যথেষ্ট যুক্তি তোমার নিশ্চয় রয়েছে, সুখময়। কিন্তু তুমি একবার মিস্টার সদাশিব কাঞ্জিলালের কথাটাও ভেবে দেখো! ভদ্রলোক ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং ল-ইয়ারদের ওপর অন্ধবিশ্বাস রেখে এতোদিন কাজ করেছেন। এখন তার ফল ভোগ করতে হবে ওঁকে। সদাশিব কাঞ্জিলাল এখন গুরুদেবের বাণীর পুনরুক্তি করছেন, একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কেউ হিসেবের বাইরে নয়। আবার কখনও বলছেন, না মানুষ ছাড়া আর কেউ হিসেবের শিকলে বাঁধা নয়। পশুপাখিরা তো হিসেব রাখে না। তাই হোয়াইট কলার ক্রাইমে মানুষেরই একচেটিয়া অধিকার।"

রমিত সেনগুপ্তকে নিয়ে ব্যাপারটা কী ঘটেছে সুখময় এখনও তা ঠিক বুঝতে পারছে না।

সাংবাদিক বন্ধু বিশ্বামিত্র বসুরায় পরের দিন সুখময়কে জানালেন, "সন্দেহ করা হচ্ছে, মিস্টার রমিত সেনগুপ্ত কোম্পানির অনেক টাকা ঠকিয়ে বার করে নিয়েছেন। খুবই সিরিয়াস অভিযোগ। এইসব কেসে তো অভিযুক্ত পার্টির বহু বছরের জেল হয়ে যায়। চারটে কাউন্টে হয়তো ফোর ইনটু সেভেন অর্থাৎ আঠাশ বছরেব জেল হয়ে গেলো, সেই সঙ্গে কয়েক লাখ টাকা জরিমানা, যাতে চোরাই করা টাকা আসামির আপনজনরাও ভোগ করতে না পারেন।"

একজন অফিসার নিয়মকানুনের এতো জাল এড়িয়ে কোম্পানিকে এই ভাবে ঠকিয়েছেন তার সুযোগ কোথায়, এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না

সুখময়। রমিত সেনগুপ্ত তো কোম্পানির জন্যে জিনিসপত্তর পারচেজের কাজ করতেন না, যে কম দামের জিনিস বেশি দামে কিনে তিনি কোম্পানিকে ঠকিয়েছেন।

বন্ধু বিশ্বামিত্র বসুরায় বললো, "ফিনানসিয়াল রিপোর্টারদের সঙ্গে গল্প করে দেখো, টাকা সরিয়ে নেবার এই ব্যবসায় পারচেজের সঙ্গে অনেক মালিকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। বহু প্রতিষ্ঠানে গাই বাছুরে আজকাল ভীষণ ভাব! কোম্পানির কাঁচা টাকা নির্দয়ভাবে টেনে নেওয়া ছাড়া ব্যবসার কথা ভাবতে কিছু ইন্ডিয়ান মালিকদের যথেষ্ট মানসিক কষ্ট হয়। দীর্ঘদিন ধরে বাঁধনহীন জোচ্চুরি করেই তো নামকরা কোম্পানিগুলো ইদানিং অসুস্থ হয়ে পড়ছে। যারা পুরোপুরি অসুস্থ হয়নি, তারাও অনেকে মালিকের ইচ্ছায় রেগুলার রক্ত ডোনেট করে করে রক্তশূন্যতারোগে ভুগছে! বিজনেসে অ্যানিমিয়া বড় সর্বনাশা জিনিস সুখময়, আরও পাঁচটা জটিল রোগ ডেকে নিয়ে আসে। জানো তো আশি নব্বুই হাজার কোম্পানি এ দেশে 'সিক' হয়ে ঝাঁপ বন্ধ করে বসে আছে—তাদের শরীরে একফোঁটা রক্ত অবশিষ্ট নেই। মহামূল্যবান রক্ত কোথায় পাচার হয়েছে তাও কেউ জানে না।"

"যারা পারচেজে থাকে না, যারা ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে বসে না, যারা কোটি কোটি টাকার প্রকল্প বানিয়ে বড় বড় কনস্ট্রাকশন কোম্পানিকে বরাত দেয় না, তারাও ইচ্ছে করলে সাধ মিটিয়ে চুরি করতে পারে।" বলেছে বন্ধুবর বিশ্বামিত্র বসুরায়।

সদাশিব কাঞ্জিলাল নাকি কিছুদিন থেকেই সন্দেহ করছিলেন রমিত সেনগুপ্তকে। সন্দেহটা হচ্ছিল উল্টোদিক থেকে। কাগজপত্রে কোনো সন্দেহ জাগেনি, কিন্তু রমিত সেনগুপ্তর ফাইভস্টার লাইফ স্টাইল তাঁকে ভাবিয়ে তুলছিল।

"উপার্জনের তুলনায় উচ্চতর জীবনযাত্রা। বুঝলে সুখময়, বহু বছর ধরে এইটাই এদেশের কর্তাদের নজর কেড়ে নেয়, তখন অনুসন্ধান শুরু হয়ে যায় এবং অনেকক্ষেত্রেই কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ে।"

সুখময়কে বললেন বিশ্বামিত্র বসুরায়।

সমস্ত ব্যাপারটা বিনা বাধায় স্বীকার করে নিতে সুখময় কিন্তু এখনও রাজি নয়। সদাশিব কাঞ্জিলাল নাকি অধস্তন কর্মচারিদের নির্দেশ দিয়েছেন, "রমিত সেনগুপ্তর ব্যাপারে নির্দয়ভাবে ইনভেস্টিগেশন হোক। আমাদের অডিটর, ভিজিল্যান্স এরা খোঁজখবর করে সমস্ত গোপন তথ্য সংগ্রহ করুক। আমি কিছুদিন ধরেই এঁসো গন্ধ পাচ্ছিলাম। যখন ইন্টারন্যাল অডিটকে ফাইনাল সিগন্যাল দিলাম, জাল গোটাও, তখনই বমিত সেনগুপ্ত কলকাতা সদর দপ্তর থেকে কাজের অছিলায় কারও আগাম অনুমতি না নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য, সেক্রেটারি সহসা রায়চৌধুরীও কেন পিছন পিছন হাজির হলো অজ্ঞাতবাসে?"

বিশ্বামিত্র বসুরায় স্বীকার করলেন, "সহসা রায়চৌধুরীর ব্যাপারটা এখনও স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না, সুখময়। জানতে হবে, রমিত সেনগুপ্ত ও সহসার আসল সম্পর্কটা কি? হয় আনুগত্যের চরম উদাহরণ, না-হয় প্রবল অনুরাগ, বুঝলে সুখময়। কথাগুলো তোমার হয়তো ভাল লাগছে না। হাজার হোক, মিসেস ইরাবতী সেনগুপ্ত এবং মিস সহসা রায়চৌধুরী দু'জনেই তোমার বান্ধবী।"

সুখময় মনে করিয়ে দিলো, "বান্ধবী নয় ভাই, স্রেফ সহপাঠিনী। কলেজ লাইফে সর্বসাকুল্যে দেড় ঘণ্টাও ওদের সঙ্গে মেলামেশা হয়নি। তবে ইদানীং সম্পর্কটা আলাদা। ভাগ্যচক্রে আমি দু'জনেরই কাছাকাছি চলে এসেছিলাম। এদের সান্নিধ্যে আমি উপকৃত হয়েছি বিশ্বামিত্র।"

বিশ্বামিত্র এবার দ্বিধা না করে সোজাসুজি জানতে চাইলো, "ব্রাদার, তুমি কি সহসা নামক সুন্দরীর সঙ্গে একটু জড়িয়ে পড়ছিলে? সদাশিব কাঞ্জিলাল ওর ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে একটু জানতে চাইছেন। রমিত সেনগুপ্ত ছাড়া যদি অন্য কোনও সম্পর্ক থাকে তা হলে ওই সন্দেহটা নোংরা। মিস্টার কাঞ্জিলাল মানুষটি ভীষণ ধর্মভীরু। তিনি কোনও মেয়ের নামে অযথা গুজব ছড়িয়ে পাপের ভাগী হতে চান না।"

"বিশ্বামিত্র, তুমি বলতে চাইছো, রমিত সেনগুপ্ত ছাড়া সদাশিব

কাঞ্জিলালের অফিসে সবাই ধোয়া তুলসিপাতা।" সুখময় সব সন্দেহ মেনে নিতে কষ্ট পাচ্ছে।

বিশ্বামিত্রের উত্তর : "বলতে পারবো না ভাই। মিস্টার কাঞ্জিলালতো উঠতে বসতে মাতাজী, গুরুজী অথবা স্বামী বিবেকানন্দ থেকে কোটেশন দেন। বলেন অ্যাকাউন্টিং পলিসি সম্পর্কে বিবেকানন্দর বক্তব্যই আমাদের শেষ কথা হওয়া উচিত। বিবেকানন্দ তো সোজাসুজি ঘোষণা করেছেন, ব্যবসা অবশ্যই বন্ধুত্ব নয়, বিজনেসে চক্ষুলজ্জারও কোনও স্থান নেই। একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ এবং বিস্তারিত অ্যাকাউন্টস রাখতে হবে—এবং কোনওক্রমেই শাকের টাকা মাছে অথবা মাছের টাকা শাকে খরচ করা চলবে না। তাতে যদি অনাহারে মরতে হয় তাও ভাল। এই গুণকেই স্বামী বিবেকানন্দ ব্যবসায়িক বিশুদ্ধতা বা সততা বা ইনটেগ্রিটি আখ্যা দিয়েছিলেন।"

সুখময়ের বন্ধু বিশ্বামিত্র বসুরায় বলেছে, "এ ক'দিন অফিসে রাখা কাগজপত্তর এবং ব্যাংকের কাগজপত্তর থেকে বাঘ বেরিয়েছে! তাই রমিত সেনগুপ্তর বাড়িটা সার্চ করা প্রয়োজন হয়ে পড়লো।"

"বাড়িটাতে একজন অনভিজ্ঞা বধূ ছাড়া আর তো কেউ নেই। মিস্টার কাঞ্জিলালের সদাশিবত্ব তাহলে কোথায় রইলো?" বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করেছে সুখময়।

"শোনো সুখময়, রমিত সেনগুপ্তর অফিস ড্রয়ারেই দু' লাখ টাকা নগদ পাওয়া গিয়েছে। তুমি আমি অফিসের ড্রয়ারে নিশ্চয় দু' লাখ টাকা রেখে দিই না, যদি-না আমরা অফিসের ক্যাশিয়ার হই। শোনা যাচ্ছে, রমিত সেনগুপ্ত এককথায় তাঁর সেক্রেটারি সহসা রায়চৌধুরীকে তিন লাখ টাকা উপঢৌকন অথবা প্রীতি উপহার দিয়েছেন।"

"কী বলছো তুমি! কেন দিয়েছেন?" ব্যাপারটা বিশ্বাস হয়নি সুখময়ের।

"কারণটা এখনও আবিষ্কার করা যায়নি। দু'জনের মধ্যে কী রকম

সম্পর্ক গড়ে উঠলে তিন লাখ টাকা এককথায় একজন মহিলা সহকর্মীকে উপহার দেওয়া যায়? এই টাকা রমিত সেনগুপ্ত পেলেনই বা কোথা থেকে?"

"মিস্টার সদাশিব কাঞ্জিলালের কোম্পানি যে সব প্রাইভেট ডিটেকটিভ অনুসন্ধানের জন্যে লাগিয়েছে তারা অনেক খবর খুঁজে বার করছে। কিন্তু ইতিমধ্যে বিশেষ প্রয়োজন ওই নাটের গুরুটিকে। যিনি ও এক যুবতী মহিলা বিভিন্ন নামে নর্থ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন হোটেলে দিন কাটাচ্ছিলেন। কলকাতা থেকে কোনও গোপন সূত্রে ওঁদের কাছে সংবাদ গিয়েছিল যে একদল দুঁদে ডিটেকটিভ সদলবলে পাটনায় যাচ্ছেন, তখন পাখি আর সেখানে অপেক্ষা করেনি। আর একটা প্রশ্ন, সহসা রায়চৌধুরী হঠাৎ নিজের অফিস এবং বাড়ি ছেড়ে বসের গোপন ডেরায় ছুটে গেলো কেন?"

প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর মিস্টার ব্যতিক্রম দস্তিদার কিছুদিন আগেও কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ প্রধান ছিলেন। ডি সি ডি ডি এবং সি বি আইয়ের নানা লোভনীয় পদ সগৌরবে অলংকৃত করে এবং নিজস্ব সরকারি পেনশন যথাসাধ্য নিশ্চিত করে, মিস্টার ব্যতিক্রম দস্তিদার ইদানিং প্রাইভেট সেক্টরে ভাগ্য পরীক্ষায় নেমেছেন। সরকারি পুলিশের সঙ্গে এখনও ওঁর খুবই জানাশোনা, সুতরাং বনের পাখিকে খাঁচায় পুরতে বেশি সময় লাগবে না।

ইতিমধ্যে ইরাবতীকে টানা জেরা চলেছে। সে বেচারা অফিসে রমিত সেনগুপ্তের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুই জানে না। সে শুধু কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করেছে রমিত ইদানীং খুব চিন্তিত থাকতো। তাকে কোনো প্রশ্ন করলে সে অধৈর্য হয়ে উঠত। রমিত ইদানীং যে ক্লাবে ড্রিংক বেশি করতো তা ইরাবতী বুঝতে পারতো। কিন্তু সাবালক একটা মানুষকে কে ঠেকাবে সে যদি নিজেই মত্ত হতে চায়?

রমিত সেনগুপ্ত যে দিন বার্ডওয়ান রোড ছেড়ে বেরোলেন সেদিন একটু অবাক কাণ্ড ঘটেছিল। সাধারণত অফিসের গাড়ি এসে তাঁকে এয়ারপোর্টে বা স্টেশনে নিয়ে যায়। সেদিন কিন্তু কোনো গাড়ি এলো না।

বার্ডওয়ান ˙রোডের বাড়িতে কয়েকবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রমিত সেনগুপ্ত অবশেষে নিজের মালপত্তর নিয়ে চলে গেলেন মিটার ট্যাক্সি সন্ধান করতে। ইরাবতী সেইসময় জিজ্ঞেস করেছিল, "কবে ফিরছো?"

বিবাহিত জীবনে রমিত সেনগুপ্ত সেই যেন প্রথম থতমত খেলেন। বললেন, "সময় হলেই মানুষকে যেতে এবং ফিরে আসতে হয় ইরাবতী।" এই মন্তব্যের মধ্যে যে প্রচণ্ড দার্শনিকতা আছে তা ইরাবতীর তখন খেয়াল হয়নি।

কথাটার ওপর ইবাবতী তখন বোকার মতন তেমন গুরুত্বও দেয়নি। বমিত কেন যাবার এবং ফিরে আসবার প্রসঙ্গ একসঙ্গে তুললো? ইরাবতী এখন খুঁটিয়ে অতশত ভাবতে পারছে না, আসলে সে কী শুনেছিল তাও এখন বেশ ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

মিস্টার ব্যতিক্রম দস্তিদারের নির্দেশে এবং পরিচালনায় যারা সার্চ করতে এসেছিল তারা রমিতের বার্ডওয়ান রোডের বাড়িতেও কয়েক লাখ টাকা উদ্ধার করেছে।

সংসারের টাকাকড়ি ইরাবতী কখনও নাড়াচাড়া করেনি, সব দায়িত্ব ছিল রমিতের ওপর। ওসব কাজ নিজে করতে রমিত ভালবাসত। ড্রিংকিং, ড্রাইভিং এবং স্পেন্ডিং ওর স্বভাবের মধ্যে ছিল, কিন্তু ইরাবতীর কখনও মনে হয়নি রমিত একদিন সীমার বাইরে চলে যাবে।

কলকাতা থেকে সরে যাবার আগের দিন রাত্রে ইরাবতীকে হঠাৎ রমিত বলেছিল, "বিপদ-আপদের জন্যে প্রত্যেক সংসারে কিছু নগদ টাকা রাখা দরকার। আমাদের বিছানার তলায় ছোট একটা বিল্ট-ইন বাক্স আছে, হঠাৎ প্রয়োজন হলে ওখানে কিছু পেয়ে যাবে।"

রমিতের কথাতেও মন দেয়নি ইরাবতী। অথচ ব্যতিক্রম দস্তিদারেরা যখন সার্চ করতে এলো তখন তারা রবারের গদি তুলে ফেলে দিয়ে সহজেই গহ্বরটা আবিষ্কার করলো এবং প্রত্যাশিত গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে আহ্লাদিত হয়ে উঠলো। কয়েক মিনিটে গোপন গহ্বর থেকে দু' লাখ টাকার কড়কড়ে কারেন্সি নোট ওদের হস্তগত হলো।

সহসা

ইরাবতীকে নিয়ে সুখময় এখন বার্ডওয়ান রোডের ডাইনিং টেবিলের সামনে বসে আছে। ব্যতিক্রম দস্তিদার অ্যান্ড কোং-এর সার্চ অ্যান্ড সিজার অব্যাহত রয়েছে।

ইরাবতী গভীর উদ্বেগের সঙ্গে জানতে চাইছে, "কী হবে বলো তো সুখময়?"

ইরাবতীকে শান্ত করবার জন্যে সুখময় বললো, "কী আর হবে? সংসারে এক এক সময়ে একটা ঝড় আসে, আবার যথাসময়ে চলে যায়।"

এই ঝড় বিদায় নেবার আগে যে বিরাট বিরাট মহীরুহকে চিরতরে ধরাশায়ী করে যায় এ কথা সুখময় তুলতে সাহস পাচ্ছে না।

সুখময় বললো, "যারা ঠাণ্ডা মাথায় ঝড়ের সামনে মাথা নত করে থাকে তারা সময়মতো আবার উঠে দাঁড়ায়, ইরাবতী। প্রাচীনযুগে একে বলতো বেতসীতন্ত্র—এটা বেতগাছের স্বভাব!"

কিন্তু বিপদ থেকে মুক্ত হবার পথ দেখছে না ইরাবতী। সে বলেছে, "এই ঘরসংসারের টেবিল চেয়ার খাট বিছানা চাদর পর্দা কাপ ডিশ কিছুই যে মিস্টার সেনগুপ্তর নিজস্ব নয় এটা আমার খেয়াল ছিল না, সুখময়।"

"কোম্পানির জিনিস, তারা এখন বুঝুক এসব জিনিস নিয়ে কী করবে।" উত্তর দিয়েছিল সুখময়। ব্যাপারটা সত্যিই সে ভালোভাবে বোঝে না।

সায়েবদের সুবিধের জন্যে এইসব ফারনিশড ফ্ল্যাটের আয়োজন করতো কোম্পানি, প্রয়োজনমতো স্রেফ কোম্পানি আবাসনে ঢুকে পড়ে রেডিমেড সংসার যাত্রা শুরু করে দাও। আবার যখন সময় হবে তখন সাজানো সংসার সাজানো রেখেই বেরিয়ে যাও।

সুখময় বললো, 'ইরাবতী, শুধু কোম্পানির সাজানো ফ্ল্যাট কেন? এই বিশ্বসংসারে আমরা সবাই তো সাজানো আবাসনে উঠেছি। পৃথিবী থেকে

যাবার সময় একখানা চামচও সঙ্গে নেওয়া চলবে না, এমন কি নিজের শরীরটাও নয়!”

সার্চের নামে যারা বাড়ি তছনছ করেছিল তারা আশা করেছিল রমিত সেনগুপ্তকে তারা ধরে ফেলবে কোথাও না কোথাও। কিন্তু দুইপক্ষের লুকোচুরি খেলা এখন চলছে উত্তর ভারত এবং পূর্ব ভারতের বড় বড় শহরে। রমিত সেনগুপ্ত এবং তাঁর সঙ্গিনী সহসা রায়চৌধুরীকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে ব্যতিক্রম দস্তিদার অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। মিস্টার সদাশিব কাঞ্জিলালের মনোভাব কী হচ্ছে তা আন্দাজ করাও সুখময়ের পক্ষে কঠিন নয়।

রমিত সেনগুপ্তর হদিশ না মিললেও কোম্পানির হাত গুটিয়ে বসে থাকবার কথা নয়। সেখানে নোট লেখা হয়েছে, গোপন মিটিং হয়েছে এবং সেই মিটিয়ে কোম্পানির এম ডি মিস্টার কাঞ্জিলালকে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে। যথাসময়ে চাকরি থেকে স্যাক করা হলো নিরুদ্দেশ রমিত সেনগুপ্তকে। সব কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো, গুরুতর ফৌজদারি অপরাধে কোম্পানির অফিসার রমিত সেনগুপ্তকে খোঁজা হচ্ছে। অফিসে জোর গুজব, এবার সেনগুপ্তকে খুঁজে দেবার জন্য নগদ পুরস্কার ঘোষণা করা হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপনে কিছুটা অশালীনতা রয়েছে, এসব লড়াই করা যায় না এমন নয়। কিন্তু যিনি এসব হাঙ্গামার স্রষ্টা একমাত্র তিনিই তো জানেন কীভাবে এইসব সমস্যায় মোকাবিলা করতে হয়। কোম্পানির এ ধরনের সমস্যা ইতিপূর্বে তো রমিত সেনগুপ্তই দেখাশোনা করে এসেছেন। এখন সর্ষের মধ্যে ভূত দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন এম ডি সদাশিব কাঞ্জিলাল। অথচ ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের টাকা তছরুপের জন্যে এই রমিত সেনগুপ্তই দু' বছর আগে একজন কর্মীকে প্রথমে হাজতে এবং পরে আদালতের মাধ্যমে জেলে পাঠিয়েছেন। হোয়াইট-কলার ক্রাইমের নানা বৈচিত্র্য রমিত সেনগুপ্তর থেকে ভাল খুব কম লোকই জানেন।

সহসা

সুখময় নিজেও নিঃশব্দে কিছু খোঁজখবর করেছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অভিজ্ঞ উকিল অবশ্যই পাওয়া যায়, তাঁরা নিযুক্ত হলে মাথা ঘামিয়ে এইসব সার্চ রুখে দেন। কিন্তু তাঁদের ফি অনেক। সে টাকা কী ইরাবতীর বাড়িতে আছে?

সত্যি কথাটা হলো, ইরাবতীর কাছে বলতে গেলে কিছুই নেই। বাড়িতে যত ক্যাশ ছিল সব ব্যতিক্রম দস্তিদারের নন্দীভৃঙ্গীরা সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করেছেন। ব্যাংকের পাশবই, চেকবই, লকার সব সিল হয়েছে। লকারে অবশ্য ইরাবতীর তেমন কিছু নেই। গয়নাগাটির দিকে সবে ইরাবতীর একটু নজর যাচ্ছিল। কিন্তু বর্তমানে তার স্বর্ণসংগ্রহে তেমন কিছু নেই।

রমিত সেনগুপ্ত একবার বলেছিলেন, গহনার থেকেও মেয়েদের যা প্রয়োজন তা হলো একটা মাথা গোঁজবার নিজস্ব জায়গা, চাকরি বাকরির সঙ্গে যে ঠিকানার কোনো যোগসূত্র থাকবে না। মাথা গোঁজবার নির্ধারিত জায়গা নেই বলেই কোম্পানির বড় বড় অফিসাররা এমন বেড়াল ছানার মতন উঁচুতলার কর্তাদের পায়ের কাছে কুঁই কুঁই করেন। সাহস করে এবং মুখ ফুটে সত্য কথা কখনও বলতে পারেন না। অপরের অন্যায়কেও অনেক সময় নিজের অন্যায় বলে মাথা পেতে নিতে হয় বিনা প্রতিবাদে।

ইরাবতীর হাতে নগদ টাকার প্রবাহ আরও কম এই জন্যে যে এখন মাসের শেষ। মাসের শেষ তারিখেই রমিত চেক ভাঙিয়ে অফিস থেকে ঝক ঝকে নতুন নোটের তাড়া বাড়িতে নিয়ে আসতো। এতো নতুন নোট যে খরচা করতে মায়া হতো ইরাবতীর। রমিত মৃদু হেসে মজা দেখতো। মানি ব্যাগ থেকে একটা ক্ষতবিক্ষত গলিত দশ টাকার নোট বার করে বলতো একদিন এই যুবতী নোটেরও এই অবস্থা হবে।

দিনের পর দিন এই যে অদ্ভুত বিপদ চলেছে সে সময় সুখময়ের ক্রমশঃ নিঃসঙ্গতা বেড়েছে।

অফিসে ছুটি নেবার উপায় নেই সুখময়ের। তাই কোনওরকমে কাজ সেরে সুখময় সোজা ইরাবতীর কাছে চলে এসেছে। টেলিফোনে ইরাবতীর সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধে ছিল, কিন্তু সম্প্রতি লাইন কেটে দিয়েছে। আইন অনুযায়ী ঘোষণা করা হয়েছে রমিত সেনগুপ্ত ফেরার। ফেরার লোকের স্ত্রীকে কেউ আদর করে বার্ডওয়ান রোডের সাজানো ফ্ল্যাটে রেখে দেয় না। ওখানে প্রথমে জল সরবরাহ বন্ধ হয়েছে। বিশাল বিদ্যুতের বিল না দেওয়ায় সংযোগ ছিন্ন করার রেজিস্টার্ড নোটিশ এসে গিয়েছে।

অর্থাৎ আর উপায় ছিল না। ইরাবতীকে নিজের ফ্ল্যাটে সরিয়ে নিয়ে আসা ছাড়া সুখময়ের অন্য কোনো পথ খোলা নেই। একলা থাকলে হয়তো ইরাবতীর মনে কোনো সময়ে আত্মঘাতিনী হবার বাসনা জাগতে পারে।

সুখময় বলেছে, "আমার পাম অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাট মিস্টার রমিত সেনগুপ্তই রক্ষে করে দিয়েছিলেন ইরাবতী। এখন ক'দিন যদি আমার ঠিকানাটা তোমাদের কাজে লাগে তা হলে তো ভালই।"

সুখময় আরও বলেছে, "পৃথিবীতে কোনো ঝড় এখনও পর্যন্ত চিরস্থায়ী হয়নি; তবে কখনও কখনও ঝড় থামতে সময় লাগে একটু।" যা সুখময় বললো না, "একজন আই সি এস অফিসার বিয়াল্লিশ সালে সাধ্যের তুলনায় অত্যধিক সঞ্চিত সম্পদের অভিযোগ প্রবল রাজরোষে পড়েছিলেন; পঞ্চাশ বছর পরেও সেই পরিবারের হাঙ্গামার সমাপ্তি হয়নি, অথচ এর মধ্যে কত কি ঘটে গিয়েছে। তবে সেখানে কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা ছিল। মানুষটা নিজে উধাও না হয়ে, নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে যথাসাধ্য লড়াই করেছেন। এক আশ্চর্য সংগ্রাম। যদি এই পরিবারের বক্তব্য সত্য হয় তা হলে সরকার এবং সমাজ এঁদের যে অপরাধী করেছিল তার কোনো মার্জনা নেই। কিন্তু রাজশক্তি কবে ভেবেছে হৃদয় দিয়ে? সহানুভূতি দিয়ে!"

একেবারে নিঃস্ব অবস্থায়, যথাসর্বস্ব পিছনে ফেলে রেখে দুটো মাত্র

ব্যাগ এবং একটা ঝোলানো সাইড ব্যাগ নিয়ে এইভাবে যে কোনোদিন অনিশ্চিত অজানা জীবনের অন্ধকারে প্রবেশ করতে হবে তা ইরাবতীর কল্পনাতেও ছিল না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও মায়ের বাঁধানো ছবিটা ইরাবতী ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে নিয়েছে। ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে গিয়েও ধিক্কার দেওয়া হলো না। সুখময়ও তো এইসময় অনুপস্থিত থাকতে পারতো। কত বন্ধু তো কত সন্ধ্যায় এই বার্ডওয়ান রোডের বাড়িতে পদধূলি দিয়েছেন, রমিতের আপ্যায়নে আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছেন। কিন্তু এই বিপদের সময় তাঁরা সামনে এসে দাঁড়ালেন না। সংসারের নিয়মই এই, বহু মানুষের ভিড়ের মধ্যে কখনও কখনও এক-আধটা বন্ধু পাওয়া যায়।

মালপত্তর ট্যাক্সিতে ওঠার সময়ও একটু অবাক কাণ্ড। রমিতের অফিসের পুরনো বেয়ারা হারাধন হঠাৎ বার্ডওয়ান রোডে হাজির হলো। তার চোখে জল।

হারাধন লজ্জিতভাবে একটা খাম ইরাবতীর হাতে গুঁজে দিলো। যে তিন হাজার টাকা সায়েব হারাধনের স্ত্রীর অসুখের সময় দিয়েছিলেন সেটা ফেবত দিতে ব্যগ্র সে। কিন্তু সায়েব হয়তো টাকাটা দান হিসাবে দিয়েছিলেন।

লোকটি শুনলো না, এখনই সে দেনা শোধ দিতে চায়, যদিও সে টাকাটা অন্য জায়গা থেকে ধার নিয়ে এসেছে। গরীবের সংসারে লোকরা কখনও ধার করতে ভয় পায় না।

ইরাবতীর চোখেও জল। তার হাতে একটা পয়সাও ছিল না। এই মুহূর্তে নগদ তিন হাজার টাকা যেন ভগবানের আশীর্বাদ।

হারাধন তার সায়েবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। বললো, "ওঁর নাম হওয়া উচিত ছিল রন্তিদেব।"

"তিনি আবার কে, হারাধন?" জিজ্ঞেস করলো ইরাবতী।

"সেকি! রন্তিদেব জানেন না? পুরাকালের অতিথিবৎসল নরপতি। সবাইকে আপ্যায়ন করতে ভীষণ ভালবাসতেন। তাঁর গৃহে অতিথির স্রোত কী রকম ছিল তা বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে, রন্তিদেবের পাকশালায়

দু'লক্ষ পাচক সারাক্ষণ কর্মব্যস্ত থাকতো যাতে কোনো অতিথি অভুক্ত ফিরে না যান!"

রন্তিদেবের রাজকোষে এর কি প্রভাব পড়েছিল তা খোঁজ করে দেখলে হয়তো একটা সুখপাঠ্য প্রবন্ধ লেখা যাবে, ভাবলো সুখময়।

হারাধন বেয়ারাকে সুখময় অনুরোধ করলো, "খবরাখবর রেখো হারাধন। আমরা হারিয়ে যাচ্ছি না, তবে কিছুদিনের জন্যে চলে যেতে হচ্ছে পাম অ্যাভিনিউতে।"

হারাধন নিশ্চিত যে তার প্রিয় সায়েব ফিরে আসবেন এবং তিনি কাজে যোগ দিলেই সব সমস্যা সঙ্গে সঙ্গে মিটে যাবে। এই বার্ডওয়ান রোডে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধে হবে না।

দীর্ঘ সময় ধরে স্মৃতির জাল বুনে চলেছে সুখময়। পাম অ্যাভিনিউতে দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িতে এই মাত্র পাঁচটা বাজলো। একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। বাইরে অন্ধকারও এবার ফিকে হয়ে আসছে। বিনিদ্র সুখময়ের চোখে এবার যেন গভীর ঘুম নেমে আসছে। এবার একটু ঘুমোতে শুরু করবে সে।

ইতিমধ্যে ঘুম ভেঙেছে ইরাবতীর। সে তার একক বিছানা ছেড়ে পা টিপে টিপে বাথরুমের দিকে গেলো, যাতে কোনোরকম আওয়াজ না হয়।

সুখময়ের এই ফ্ল্যাটে মাত্র একটি কল ঘর। ভাগ্যে সেটা বেডরুমের লাগোয়া নয়, তা হলে গৃহস্বামীর বেশ অসুবিধে হতো। বড় বড় শহরে যারা ফ্ল্যাটের স্থপতি তাঁরা নকশা তৈরির সময় এদেশের মানুষের সামাজিক দায়দায়িত্বের কথা সবসময় মাথায় রাখেন না। লাগোয়া বাথরুম

দেওয়ার আঙ্গিকে তাঁরা ছোট ফ্ল্যাটগুলো এমনভাবে তৈরি করেন যে সেখানে অদৃশ্যভাবে নোটিশ টাঙানো হয়—এখানে অতিথির কোনো স্থান নেই—নো গেস্ট প্লিজ!

অথচ অতিথিবিহীন মধ্যবিত্ত বাঙালি সংসার তো সাহারা মরুভূমির মতন—খরাপীড়িত সংসারে আপনজনরা ক্ষণিকের অতিথি হয়ে আসেন শ্রাবণের বর্ষাধারার মতন। বড় ভাল লাগে সুখময়ের।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘুমন্ত সুখময়ের মুখটা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখল ইরাবতী। সুখময় সত্যিই শিশুর মতোই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

নিজের খাটে ফিরে গিয়ে নিজের ছন্নছাড়া জীবনের কথা আর একবার ভাবতে শুরু করলো ইরাবতী। বাঁধন ছাড়া জীবনের খপ্পরে পড়ে বেচারা সুখময়ও অকারণে জড়িয়ে পড়লো ইরাবতীর পারিবারিক যন্ত্রণায়।

সুখময়ের কৃতজ্ঞতাবোধ অবশ্য গভীরভাবে অভিভূত করেছে ইরাবতীকে। কোথায় সামান্য কি উপকার পেয়েছে তা সুখময় ভুলতে রাজি নয় কিছুতেই। এই কৃতজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবশ্যই ছিল ওই মানুষটা যাকে ইরাবতী একদিন সারাদিন উপোসী থেকে গলায় মালা দিয়েছিল। বিদ্যে দেখে, চাকরি দেখে, মাইনে দেখে সুন্দরী ইরাবতীর সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছিল। বয়সটা একটু বেশি ছিল। দশ বছরের দূরত্ব।

কিন্তু বাবা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কী করবি টুকটুকি? সব তো মেলানো যায় না। আমাদের সময়ে দশ বছরটাই স্বামী স্ত্রীর বয়সের স্বাভাবিক দূরত্ব ছিল বাঙালিদের মধ্যে। বয়সের ফারাকের জন্যে তোর মা আর আমার মধ্যে কখনও কোনো অসুবিধে হয়নি।"

"কেউ কি বলবে, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা?" বাবা অবশ্যই চিন্তা করেছেন। তারপর রমিতের অফিস এবং ফ্ল্যাট দেখে ভাবী শ্বশুরমশাই বেশ মোহিত হয়েছেন।

বাড়ি ফিরে তিনি বলেছিলেন, "টুকটুকি, ওদের ফ্ল্যাটটা অসাধারণ। চায়ের কাপডিশ কেটলি চামচ পর্যন্ত সবকিছু কোম্পানি অতি যত্নে সাজিয়ে দিয়েছে।"

তারপর ইরাবতীকে বাবা বলেছেন, "ছেলেটা, নানা শহরে নানা রাজ্যে ঘুরেছে। তাই স্থিতি হতে হয়তো একটু দেরি হয়ে গিয়েছে। সবাই অবশ্য জানে এখনও বাঙালিঘরের সেরা মেয়েদের বাইশ বছরে এবং সেরা পাত্রদের সাতাশের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়।"

ইরাবতী তখন কোনো প্রশ্ন তোলেনি। তারপর যখন অফিসে সহপাঠিনী সহসাকে স্বামীর সঙ্গে প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত দেখেছে তখনও সে তেমন মাথা ঘামায়নি।

কথাবার্তায় এবং হাবভাবে সহসাকে ইদানীং একটু 'পজেসিভ' মনে হতো ইরাবতীর। ভাবটা এমন যেন আমাদের সুখের কর্মক্ষেত্রে তুমি আবার কেন হাজির হলে? এমন ভাব, ইচ্ছে করলেই বস্‌কে এমন রিপোর্ট দিতে পারতাম যাতে বিয়েটা শেষ পর্যন্ত পাকা না হয়।

অন্যদিকে ইরাবতী নিঃশব্দে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, সহসা তুমি অফিসের একজন জুনিয়র কর্মী হিসাবে থাকো, কর্মক্ষেত্র থেকে সংসারক্ষেত্র যে অনেক ওপরে এবং অনেক দূরে অবস্থিত তা বুঝতে ভুল করলে তোমাকে যথাসময়ে অনেক মূল্য দিতে হবে।

সহসা সম্বন্ধে কখনও কোনো নিন্দা করেনি ইরাবতী তার স্বামীর কাছে। আবার পুরনো সহপাঠিনীর মর্যাদা দিয়ে তাকে বাড়িতেও ডাকেনি।

রমিত বলেছে, "একদিন সহসাকে আপ্যায়ন করতে হবে ইরাবতী। সায়েবরা বছরে একদিন তাঁদের সেক্রেটারিদের আস্কারা দিয়ে থাকেন, বাজারে যার ভদ্র নাম সার্ভেন্টস্ ক্রিসমাস পার্টি।"

ইরাবতী অস্বীকার করছে না যে সে উৎসাহ দেখায়নি। সে বলেছে—

"বাড়িতে নয়। কলকাতা শহরে এতগুলো ক্লাব রয়েছে, আপ্যায়নের কোনো তো অসুবিধে নেই।"

রমিত সেনগুপ্তর অবশ্য দ্বিধা ছিল। নিজের সেক্রেটারিকে নিজের ক্লাবে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়নে কোনো অন্যায় নেই, কিন্তু এতে ভোট নষ্ট হতে পারে—অনেক সেকেলে ধরনের মেম্বার এই ধরণের আচরণ পছন্দ করেন না আদপেই। ওঁদের কাছে এটা কমুনিজমের অন্য রূপ কিংবা একধরনের সামাজিক বিপর্যয়।

ইরাবতী অবশ্য স্বামীর সঙ্গে একমত হয়নি। "সেকেলেদের কথা ছেড়ে দাও। বেঙ্গল ক্লাবে মেম্বারদের বউদেরও তো সায়েবরা একশ বছর ঢুকতে দেননি, কেবল ইন্ডিয়ানরাই ওখানে অপমানিত হয়নি। প্রথম মেয়েরা তাদের স্বামীদের বেঙ্গল ক্লাবে ঢুকতে পেলো ১৯২৬ সালে সেনটেনারি উৎসবের রাত্রে বিশেষ অনুমতি নিয়ে এবং সেক্ষেত্রেও সাবধানী কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিলেন স্ত্রীরা এই বেঙ্গল ক্লাব অঙ্গনে অবশ্যই আবার আসবেন, তবে একশ বছর পরে প্রতিষ্ঠানের দ্বিশতবার্ষিকী উৎসবের সময়!

পাম অ্যাভিনিউতে প্রথম রাত্রিযাপনের কথা মনে পড়ছে ইরাবতীর। ইরাবতীর ব্যাগগুলো বয়ে সুখময় তিন তলার ফ্ল্যাটে তুলে নিয়ে এলো। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে ইরাবতীকে সোজা ঢুকিয়ে দিলো নিজের বেডরুমে। সেখানে অবশ্য দামী খাট, ফোম রবার ম্যাট্রেস অথবা কার্পেট কিছুই নেই।

কার্পেটের কথা অবশ্য তখন কে ভাবছে? বার্ডওয়ান রোডের বাড়িটার

কিছুই যে ইরাবতী সেনগুপ্তর নিজস্ব নয় তা কিছু সময়ের জন্য ভুলে গিয়ে মস্ত অন্যায় করেছিল ইরাবতী।

সুখময়ের বসবার ঘরটা খুব ছোট। বাঙালি মতে দু'কামরা ফ্ল্যাট। কিন্তু আসলে ওয়ান-বেড রুম ফ্ল্যাট বলতে যা বোঝায়। কেউ কেউ এই ধরনের আবাসনকে স্টুডিও বলে থাকে। থাকতে যত কষ্টই হোক, শুনতে বেশ ভাল।

প্রথম রাতে পাঞ্জাবি এবং পাজামা পরে বসবার ঘরে শান্তিনিকেতনী চাদরে ঢাকা তক্তপোষে সুখময় সানন্দে শুয়ে পড়লো। ইরাবতীকে সে অনুরোধ করলো, ভিতর থেকে বেড রুম লক করে দিতে এবং নিশ্চিন্তে নিদ্রাদেবীর সাধনা করতে।

কিন্তু বেডরুমের ভিতর থেকে দরজা লক করা খুব সহজ নয়। আসলে এবাড়িতে এই দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করার কোনো প্রযোজন কখনও হয় নি।

সুখময় বাইরের ঘরের ডিভান থেকে উঠে এসে বললো, "যদি লক করতে অসুবিধে হয় আমি বাইবে থেকে দরজার নবটা টেনে ধরব তুমি ভিতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে নাও।"

আরও কিছু সমস্যা আছে। সেটা এই আবাসনের সবেধন নীলমণি বাথরুম নিয়ে। একমেবাদ্বিতীয়ম কলঘরটি বেডরুমের ভিতরে হলে বেশ অসুবিধা হতো খোদ গৃহস্বামীর। ভাগ্যক্রমে কলঘরের অবস্থান ঘরের বাইরে। সুখময়ের মনে আছে ইরাবতীব বার্ডওয়ান রোডে একটা বেডরুমে দুটো বাথরুম ছিল—বড়টা ইরাবতীর, ছোটটা রমিতের। হিজ অ্যান্ড হার টয়লেট না থাকলে আজকালকার সিনিয়র এগজিকিউটিভদের মহামূল্যবান সময় নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

সুখময় তার অতিথিকে সান্ত্বনা দিয়েছে, "কোনও রকম লজ্জা রেখো না, ইরাবতী। মনে রেখো এই ফ্ল্যাটটা তোমাদের দয়াতেই এখনও আমার আয়ত্তে রয়েছে। এখানে আমি নিমিত্ত মাত্র। ঠাকুর নিশ্চয় এই রকমই চেয়েছিলেন।"

ইরাবতী লক্ষ্য করেছে, নিজের যৎসামান্য জামাকাপড় সংগ্রহ সুখময় বেডরুম থেকে বার করে নিয়ে বাইরের ঘরের দেওয়ালে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে নিয়েছে। "এখানে তো বিশিষ্ট অতিথিদের নিত্য আগমন নেই, ইরাবতী। সুতরাং জামাকাপড় কোথায় ঝুললো তাতে কিছু এসে যায় না, বহু বাড়িতেই আজকাল ড্রয়িং রুম ব্যাপারটাই উঠে গিয়েছে। কখনও লিভিং রুম, কখনও রিডিং রুম, কখনও ডাইনিং রুম, কখনও প্রেয়িং রুম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই ঘরকে একশ'রকম কাজে ব্যবহার করতে বড় বড় শহরের বুদ্ধিমান নাগরিকদের জুড়ি নেই। প্রয়োজনের তাগিদে সব মানুষের বুদ্ধি বহুমুখী হয়ে ওঠে।"

প্রথম রাত্রে ইরাবতীর একটু লজ্জার ব্যাপার হয়েছিল। মাঝরাতে বেডরুম থেকে ঠক ঠক আওয়াজে পাতলা ঘুম ভেঙে গিয়েছে সুখময়ের।

বেডরুমের বন্ধ দরজার কাছে উঠে গিয়ে সুখময় বুঝেছে, ভিতর থেকে ছিটকিনি থাকায় দরজা খুলতে অসুবিধা হচ্ছে ইরাবতীর।

রাতদুপুরে সুখময় আবার পুরনো পরামর্শ দিয়েছে একটু উঁচু গলায়। "আমি বাইরে থেকে নব টেনে ধরছি, তুমি ছিটকিনি নামাও ইরাবতী। কোনো চিন্তা নেই।"

দু'জনের ধস্তাধস্তিতে মধ্যরাতের দরজা কিছুক্ষণের মধ্যে খুললো। বেশ লজ্জা পেয়েছিল ইরাবতী।

কিন্তু সুখময় ব্যাপারটা খুবই সহজ করে দিলো। সে রসিকতা করলো "ব্যাচেলরের বাড়ির ছিটকিনি তো। নবাগতা অতিথি চিনতে একটু সময় নিচ্ছে!"

আসলে ইরাবতী একটা মাথা ধরার ওষুধ খুঁজছে। "অথচ আগে আমি কখনও ওইসব ওষুধ খেতাম না, সুখময়", ইরাবতী বেশ দুঃখের সঙ্গেই বললো। সুখময়ের ওপর সে যে বড় বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠছে তা মেনে নিতে বেশ কষ্ট পাচ্ছে ইরাবতী।

সুখময়ের ফার্স্ট এড বক্সে নানা রকম এমার্জেন্সি ওষুধের মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে। নিজে ব্যবহার না করলেও, এ পাড়ার জানাশোনা গরিবদের

এই ওষুধসংগ্রহ কয়েকবার কাজে লেগেছে। বাতদুপুরে সব সময় ডাক্তারের কাছে ছোটা স্থানীয় গরিবদের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না, সুখময়ের ফার্স্ট এড বক্সই তাদের কাছে ফার্স্ট ক্লাশ চিকিৎসা।

অ্যাসপিরিন ট্যাবলেটটা গুঁড়িয়ে পাউডার করে দিলো সুখময়। সস্নেহে ইরাবতীকে সে বললো, "খেয়ে নাও, আর পুরো এক গেলাশ জল খাও, তারপর আবার শুয়ে পড়। এবার নিশ্চয় এক ঘুমে আজকের রাত কাবার হয়ে যাবে।"

ইরাবতী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "রমিত এখনও নিরুদ্দেশ। ওঁর অপরাধটি কী, তুমি বুঝতে পারো সুখময়?"

মধ্যরাতে অসহায় ইরাবতীর উদ্বেগ অযথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সুখময় সস্নেহে বললো, "ওসব বেশ জটিল ব্যাপার ইরাবতী, তোমার আমার এবং সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগোচর। তবে ক্রমশ সব ঠিক হয়ে যেতে বাধ্য।"

"তবু তো ওর অপরাধটা কি তা জানা দরকার।" ইরাবতী এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

আরও বিস্তারিত খবর নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সুখময়। "তুমি চিন্তা করো না, আমি বিভিন্ন সূত্র থেকে সব খবর কয়েকদিনের মধ্যে জোগাড় করে ফেলবো।"

সুখময় নিজে ওর সাংবাদিক বন্ধু বিশ্বামিত্র বসুরায়ের কাছে কয়েকবার খোঁজ খবর করেছে। সুখময়ের অনুরোধে বিশ্বামিত্র কয়েকবার একান্তে কথা বলেছে সদাশিব কাঞ্জিলালের সঙ্গে।

হল্ অ্যান্ড লাড্‌লো কোম্পানির এম ডি সায়েব পুরো ব্যাপারটা এখনও পুলিশের হাতে তুলে দেননি, ভাবছেন তাতে অফিসের কিছু নিরীহ নিরপরাধ লোক অযথা হয়রানিতে পড়বে। মিস্টার ব্যতিক্রম দস্তিদার ব্যাপারটা মোটামুটি দক্ষভাবে হ্যান্ডেল করছেন।

ষড়যন্ত্রটা ক্রমশ অনুসন্ধানীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অফিসে রমিত সেনগুপ্তর ওপরে যিনি এই হল্ অ্যান্ড লাড্‌লোর কোম্পানি-সেক্রেটারি

ছিলেন তিনি অসময়ে মারা যান। খরচ কমাবার চেষ্টায় তাঁর জায়গায় হল্‌ অ্যান্ড লাড্‌লোতে নতুন কোনো লোক নেওয়া হয়নি, কিন্তু রমিত সেনগুপ্তকেও সেই পদ এখনও দেওয়া হয়নি।

রমিত সেনগুপ্ত অবশ্য কোম্পানি চালানোর আইনকানুন ভালই বোঝেন। কোম্পানির অনেক বিশ্বাসের কাজকর্ম তিনি করেন।

ঐতিহাসিক ভাবে এই বিভাগই কোম্পানির অফিসারদের পেনসন সংক্রান্ত ফান্ডের কাজটা করে এসেছে। হল্‌ অ্যান্ড লাড্‌লো কোম্পানিতে অফিসারদের সংখ্যা তেমন কিছু বেশি নয়। মাসে মাসে গোপনে এঁদের মাইনের পনেরো শতাংশ কোম্পানি একটি ফান্ডকে দিয়েছেন। এই টাকাই বছরের পর বছর ধরে পেনসন ফান্ডে জমে যায়, অথচ এটা প্রভিডেন্ড ফান্ড-এর মতন নয়, যার বাৎসরিক হিসেব সভ্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া বাধ্যতামূলক। পি এফ স্টেটমেন্টে হিসেব প্রত্যেক অফিসারকে দেওয়া হয় কত টাকা মাইনে থেকে কাটা হয়েছে, সমপরিমাণ টাকা কোম্পানি দিয়েছেন কিনা এবং সুদ হিসেব কত টাকা পাওয়া গিয়েছে। পেনসন বা সুপার অ্যানুয়েশন ফান্ড তো বাধ্যতামূলক নয়, ওটা কোম্পানির ইচ্ছে অনুযায়ী একটা বাড়তি সুবিধে। ওই খাতে অফিসারদের মাইনে থেকে কোনো টাকা কাটা হয় না, কিন্তু কোম্পানি নিয়মিত তাঁদের চাঁদা দেন। আলাদা পেনসন ফান্ডে সুদও জমে। তারপর যখন কেউ চাকরি থেকে অবসর নেন তখন তাঁকে মাসমাস পেনসন দেওয়া যেতে পারে এই পেনসন ফান্ডের টাকা থেকে।

ব্যাপারটা খুব সহজ নয়, বিশেষ করে এদেশের ছোট এবং মাঝারি সাইজের কোম্পানির দৃষ্টিকোণ থেকে।

এর সরকারি নাম পেনসন নয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তো রসিকতা করে

নিজেকে বলতেন 'পেনসিলার'। যে-চাকরিতে শেষপর্যন্ত পেনসিলার হওয়া যায় সেই চাকরিতে যেতে উপদেশ দিতেন শরণাগতদের।

এখন বেসরকারী মহলে এর প্রকৃত নাম সুপারঅ্যানুয়েশন ফান্ড। এই ফান্ড কোম্পানির পুরো আয়ত্তে রাখার রেওয়াজ নেই। নিজস্ব কয়েকজন সিনিয়র অফিসারকে ট্রাস্টি বা অছিপরিষদের সভ্য করে দেওয়া হয়। এঁরা কাগজপত্রে সই করেন এবং আলাদা হিসেবপত্র রাখেন। কোনো কোনো অফিসে শুরু থেকেই টাকাটা বীমা কোম্পানিতে দিয়ে দেওয়া হয়, বীমা কোম্পানি টাকাটা খাটান এবং সময়মতো পেনসন দেন। আবার কোথাও কোথাও বীমা কোম্পানির ওপর অত নির্ভরতা নেই।

সুখময় ব্যাপারটা ইরাবতীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। বলেছে, "আমার মাথাতেই তেমন ঢোকে না, তোমাকেই কী বোঝাই। মোদ্দা কথাটা হলো, সুপার অ্যানুয়েশন ফান্ডে এক একজনের অ্যাকাউন্টে যা জমা পড়ে তা অবসর নেওয়ার সময় ঐ টাকায় বীমা কোম্পানি থেকে মাসিক পেনসন কিনে দেওয়া হয়। এর নাম অ্যানুইটি।"

সুখময় বললো, "ধরো এক লাখ টাকার অ্যানুইটি কিনলে বীমা কোম্পানি সারা জীবন মাসে একহাজার টাকা দিয়ে যাবে। বীমা কোম্পানির কাছে যাওয়ার কারণ, কোনো কারণে কোম্পানি উঠে গেলেও পেনসনার আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। যে টাকা দিয়ে এই অ্যানুইটি কেনা হয় তার নাম করপাস ফান্ড। এই শব্দটা সারাজীবনে আমি শুনিনি, ইরাবতী। এবার রমিতবাবুর খোঁজখবর নিতে গিয়ে কানে এলো, যেখানে মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশজন এই রকম পেনসন পাবার জন্যে নির্ধারিত থাকেন প্রতিমাসে তাঁদের টাকাগুলো কোম্পানি জমা দেন একটা কি দুটো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে—সেই টাকা মাঝে মাঝে নিয়োগ করা হয় বিভিন্ন প্রকল্পে বেশি সুদের হারে।"

সুখময় বললো, "এই কাজগুলো করতেন রমিতবাবু। মাঝে মাঝে এসব লেনদেন এবং হিসেব অডিট হবার কথা। কিন্তু অনেকদিন এদিকে কারও তেমন নজর পড়েনি। তবে কারও চিন্তা কিছু হয়নি, কারণ অন্তত দু'জন

ট্রাস্টির সই ছাড়া ব্যাংক থেকে টাকা তোলা যায় না। এখন শোনা যাচ্ছে, এই সব টাকা থাকতো 'নেশন ব্যাংকে' এবং বিদেশী 'কুইনস্ ব্যাংকে'। রমিত সেনগুপ্ত নিজেও কুইনস্ ব্যাংকে নিজের দু'একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। তারপর পেনসন ফান্ডের নিজস্ব টাকা নেশন ব্যাংক থেকে সরিয়ে কুইনস্ ব্যাংকে রাখার জন্যে রমিত সেনগুপ্ত নেশন ব্যাংকের চেক তৈরি করলেন 'পে কুইনস্ ব্যাংক'। রমিত সেনগুপ্তকে তাঁর অফিসের কেউ কখনও সন্দেহ করেনি। একজন অছির কাছে তিনি পাঠালেন চেকটা সই করার জন্যে। তিনি সরল মনে সই করলেন ওঁর অনুরোধে। ভাবলেন, টাকাটা একটা ব্যাংক থেকে আরেকটা ব্যাংকে ট্রানসফার হচ্ছে। এবার সেই চেক বুক রমিত পাঠালেন অন্য ট্রাস্টির কাছে। অন্য একজনের সই আছে দেখে তিনিও নিশ্চিন্তে সই করে দিলেন। সন্দেহ হবার কোনো কারণও নেই, কারণ টাকাটা একটা ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকে যাচ্ছে অ্যাকাউন্টপেয়ি চেকের মাধ্যমে।"

সুখময় যা বুঝেছে, এর পরেই প্রকৃত বুদ্ধির খেলা। দু'জন ট্রাস্টির সই করা চেক যখন রমিতের কাছে ফিরে এসেছে তখন 'পে কুইনস্ ব্যাঙ্কে'র পাশে নিজের একটা অ্যাকাউন্টের নাম বসিয়ে দিয়েছেন সেনগুপ্ত এবং টাকাটা কুইনস্ ব্যাঙ্কে রমিতের ব্যক্তিগত প্রাইভেট অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে। এইভাবে মাঝে মাঝে কোম্পানির চেকের মাধ্যমে কয়েক লক্ষ টাকা নিঃশব্দে সরিয়ে নিয়েছেন রমিত সেনগুপ্ত।

কিন্তু এ তো আত্মনিধনের খেলা, একদিন না একদিন তো অপরাধ ধরা পড়বেই, এতো কারচুপি তো চিরকাল অজানা থাকতে পারে না।

আসলে ঐ টাকায় রমিত সেনগুপ্ত শেয়ার বাজারে বেপরোয়া ফাটকা খেলেছেন। পরিকল্পনা করেছিলেন, লাভ হলে পেনসন ফান্ডের টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবেন। তা ছাড়া কুইনস্ ব্যাংকে বিভিন্ন সময়ে যেসব বেনামী অ্যাকাউন্ট তিনি খুলেছেন এবং এমন ভাবে তার নাম রেখেছেন যে মনে হবে এটা কোম্পানিরই কোনো অ্যাকাউন্ট। এইসব অ্যাকাউন্ট মাঝে মাঝে খোলা হয়েছে এবং হঠাৎ বন্ধ হয়েছে। আবার নতুন করে

অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। কোথাও কোনো ধারাবাহিকতা রাখা হয়নি। সোজা পুলিশের হাতে এই তছরুপের অনুসন্ধান চলে গেলে, যেসব ট্রাস্টি সরল বিশ্বাসে কোম্পানির চেক সই করে দিয়েছেন তাঁরাও পুলিশের জালে জড়িয়ে পড়বেন। রমিত .সেনগুপ্তর সঙ্গে এঁরাও ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন কিনা তা আদালতে বিচার হবে।

আইনজ্ঞদের পরামর্শে ম্যানেজিং ডিরেকটর সদাশিব কাঞ্জিলাল ব্যাপারটা তাই হাল্কাভাবে বেসরকারি পর্যায়ে রাখতে চান। তাঁর বিশ্বাসী ডিটেকটিভ ব্যতিক্রম দস্তিদারের অনুসন্ধানী দল হন্যে হয়ে বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু এখনও তাঁরা খুঁজে পাচ্ছে না রমিত সেনগুপ্তকে।

অবাক কাণ্ড। কয়েক দিন পরে সহসা কলকাতায় ফিরে এসেছে। সে সোজা হল্ অ্যান্ড লাড্লোর সদর দপ্তরে রিপোর্ট করেছে।

উধাও হয়ে সহসা এতোদিন কোথায় ছিল, কেন ছিল তা কাউকে বলতে বাধ্য নয় সে।

জেরার মুখে অবশ্য সে স্বীকার করেছে, রমিত সেনগুপ্তর সঙ্গে তার চমৎকার সম্পর্ক ছিল। রমিত সেনগুপ্ত যে তাকে কাগজ পত্তরে না লিখেই স্বেচ্ছায় বেশ কিছু টাকা দিয়েছিলেন ছোট একটা ওয়ানরুম ফ্ল্যাট কেনবার জন্যে তা সহসা অস্বীকার করেনি। কিছু টাকা সহসা নিজেও সঞ্চয় করেছিল, কিছু হাউসিং ফিনান্স কোম্পানি থেকে ধার নিয়েছে এবং কিছু এসেছে মিস্টার রমিত সেনগুপ্তর কাছ থেকে নগদে।

এই টাকা অবশ্যই প্রীতি উপহার নয়, যৌথ চোরাই-এর অংশও নয়, সহসা অবশ্যই এক সময় কড়ায় গণ্ডায় এই অর্থ মিস্টার সেনগুপ্তকে ফিরিয়ে দিতো।

সহসা নিশ্চয় ভেবেছে, রমিত সেনগুপ্ত তাঁর ব্যক্তিগত টাকা থেকেই ব্যক্তিগত ধার দিয়েছেন তাকে। এই টাকা ঠিক সময়ে না পেলে ফ্ল্যাট কেনার নগদ অংশটা সহসা জোগাড় করতে পারতো না—সবাই জানে শুধু চেক বইতে বড় শহরে মাথা গুঁজবার জায়গা কেনার মতন ক্ষমতা সহসার মতন ওয়ার্কিং গার্ল-এর নেই।

সহসা

ইরাবতী ও সুখময়ের সময় অবিশ্বাস্য দ্রুত বেগে বয়ে চলেছে। মামলা মোকদ্দমা, তহবিল তছরুপের অভিযোগ এবং পুলিশ ও প্রাইভেট এনকোয়ারি থাকলে এদেশে এইভাবেই সময় বয়ে যায়। যারা এসব ধাক্কা সহ্য করতে পারে ধৈর্য ধরে তারা টিকে যায়। ওই যে বলে না, যে সয় সে রয়! যে অধৈর্য হয়ে ওঠে তার বিনাশও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ইরাবতী ইদানীং অবশ্য অন্য কথা বলে। তার ধারণা হয়েছে, "এ সংসারে যে রয় তাকেই কেবল সইতে হয়!"

গোপনে গোপনে সহসার সঙ্গে কত কিছু ষডযন্ত্র করে ইরাবতীর স্বামীদেবতা রমিত সেনগুপ্ত উধাও হয়ে গেলেন, আর সেই অপরাধের বিষে প্রতি মুহূর্তে জর্জরিত হতে হচ্ছে অসহায় ইরাবতীকে। শুধু জেরা নয়, যেকোনো সময়ে পুলিশে গ্রেপ্তার হবার আশঙ্কা রয়েছে সেই সঙ্গে অপমান এবং কলঙ্ক।

ইরাবতী জানে, তাকেও জেলে পোরার পরিকল্পনা ছিল। কোম্পানির হয়ে যিনি অনুসন্ধান করছেন সেই ব্যতিক্রম দস্তিদার একজন ঝানু প্রাক্তন ডিসি-ডিডি। কিন্তু ইরাবতীর ভাগ্য ভাল। রমিতের কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জয়েন্ট নাম ছিল না ইরাবতীর।

একসময় সুখময়ও অবাক হয়ে গিয়েছিল, এই রকম তো সাধারণত হয় না। খুব খেয়ালি এবং অসাবধানী মানুষ ছাড়া নিজস্ব একটা নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রাখে না। বউকে বিনা প্রশ্নে সবাই জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে স্থান দেয়, কিন্তু রমিত সেনগুপ্ত তো আনাড়ি ছিলেন না, দেশের আইন-কানুন তো তাঁর নখাগ্রে থাকার কথা। কী ভেবে রমিত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর সহধর্মিণী ইরাবতীকে বাদ রেখেছিলেন?

আজকাল ইরাবতীর অন্ধ রাগ গিয়ে পড়ছে স্বামীর সেক্রেটারি সহসা

রায়চৌধুরীর ওপর।

সুখময়কে ইরাবতী অনুরোধ করেছে, "তোমার সাংবাদিক বন্ধুকে বলো সহসা সম্বন্ধে একটু গোপন খোঁজখবর করতে। আমার স্বামী তো এই রকম জালিয়াত মানুষ ছিলেন না। দক্ষিণেশ্বর থেকে আনা মায়ের ছবিতে তিনি রোজ প্রণাম করতেন।"

অসহায় সুখময় উত্তর দিয়েছে, "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিত কালেই একদল ঘুষখোর লোক দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসেছিলেন নিজেদের বুকের জ্বালা মেটাতে। কয়েকজন পরে অন্যায় স্বীকার করে সৎপথে ফিরে যাবার চেষ্টাও করেছেন। তাছাড়া, অনেক মাতাল ও দুশ্চরিত্রও রামকৃষ্ণের প্রসন্ন আশ্রয় ভিক্ষা করেছেন।"

"অর্থাৎ কালী এবং শ্রীরামকৃষ্ণর ছবিতে যাঁরা নিত্য প্রণাম করছেন তাঁরা সবাই সোজাপথের মানুষ নাও হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা যে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসতে চাইছেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।"

ইরাবতী ইদানীং মাঝে মাঝে বিরক্তি এবং দুঃখে জ্বলে ওঠে। "জলজ্যান্ত মানুষটা কোথায উধাও হলো! কোনো খবরও নেই! আর এনকোয়ারির নাম করে ব্যতিক্রম দস্তিদারের চেলারা মাঝে-মাঝেই ইরাবতীর কাছে খবর নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষটা কোথায় গা ঢাকা দিলো?"

কেউ কেউ বলছে, রমিত সেনগুপ্ত বিদেশে পালিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পাসপোর্টখানা তো সহসা রায়চৌধুরী নিজেই এবার অফিসকে ফেরত দিয়েছে। সহসা এই পাসপোর্ট কোথা থেকে পেলো তা জিজ্ঞেস করেনি ইরাবতী। সহসা নিজের জন্যেও যে পাসপোর্ট করিয়েছে সে খবরও ইরাবতীর কানে এসেছে।

সুখময় বুঝতে পারে ইরাবতী ক্রমশই অধৈর্য হয়ে উঠছে, তার দুশ্চিন্তাও ক্রমশই বাড়ছে। চারদিকে রমিত সেনগুপ্ত সম্বন্ধে অভিযোগেব শেষ নেই। চুরি হয়ে যাওয়া অর্থের পরিমাণও ক্রমশ বেড়ে চ ছে।

সুখময় ভেবেছিল, সহসার সঙ্গে সে একান্তে দেখা করবে। কিন্তু সহসার নাগাল পাওয়া ভার। সে নাকি সর্বদা উকিল এবং ডিটেকটিভ বাহিনী

পরিবেষ্টিত অবস্থায় প্রায় বন্দিনী হয়ে আছে। সময়ে অসময়ে দফায় দফায় জেরা চলেছে তার। প্রাক্তন ডি-সি ডি-ডি সব খুঁটিয়ে দেখছেন। অনুসন্ধানের প্রয়োজনে এঁরা কখনও কড়া, কখনও মিষ্টি—জেরার সময় সত্যিই এঁরা দশাবতার।

আর ইরাবতী সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভেবে চলেছে কেবল রমিতের কথা। মানুষটা সেই যে উধাও হলো, একবার স্ত্রীর খোঁজখবর করলো না।

সুখময় মাঝে মাঝে ইরাবতীকে বুঝিয়েছে, "রমিতেরও তো সমস্যা রয়েছে। যে মানুষকে লুকিয়ে থাকতে হয় সে কেমন করে অন্যের খোঁজখবর করবে।"

"এমন কাজ আদৌ করা কেন যার জন্যে ঘরদোর অফিস ছেড়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে?" ইরাবতীর এই চাঁচাছোলা প্রশ্নের কী উত্তর দেবে সুখময়?

সুখময়ের বন্ধু সেবার বলেছে, "একদিন ধরা পড়া অনিবার্য হবে জেনেও বহু মানুষ বোকার মতন তাৎক্ষণিক কিছু সুখের জন্য আঁকাবাঁকা অন্ধকার পথ ধরে এগিয়ে যায়। ম্যানেজিং ডিরেকটর সদাশিব কাঞ্জিলাল অবশ্য ইদানীং নিজের মহলে নতুন থিওরি দিয়েছেন। রমিত সেনগুপ্ত যখন বুঝতে পেরেছেন যে এবার ইন্টারন্যাল অডিট শুরু হলো বলে তখনই তিনি বেপরোয়া হয়ে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন, মনের সাধ মিটিয়ে লাইফকে শেষবারের মতন এনজয় করতে।"

সুখময়ের বন্ধু বলেছে, "কাম অন সুখময়। সহসা ও রমিতের লাস্ট রাইড টুগেদার নিয়ে তুমি চমৎকার একটা গল্প ফাঁদতে পারো উইদাউট হার্টিং ইরাবতী সেনগুপ্ত।"

এ-কথা ইরাবতীকে বলেনি সুখময়। এইসব মানুষ কী অবস্থায় কী করতে চায় তা বোঝবার মতন পার্থিব অভিজ্ঞতা এখনও নেই তার।

ম্যানেজিং ডিরেকটর মিস্টার সদাশিব কাঞ্জিলাল অবশ্য ব্যস্ত হলেও অধৈর্য হননি। কতদিন আর রমিত সেনগুপ্তর লুকিয়ে বেড়ানো সম্ভব?

যখন তিনি পুলিশ অথবা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির হাতে ধরা পড়বেন তখন অ্যাকাউন্টসের সমস্ত খুঁটিনাটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। নাটের গুরু যিনি তিনি ধরা পড়লেন না আর পুলিশ এসে নিরীহ তিনজন ট্রাস্ট্রিকে নিয়ে টানাটানি করবে এটা মিস্টার সদাশিব কাঞ্জিলালের মনঃপূত নয়। নাম কা ওয়াস্তে থানায় একটা ডায়েরি অবশ্য করে রাখা হয়েছে কোম্পানির প্রতিনিধি প্রাক্তন ডিসি-ডিডি মিস্টার ব্যতিক্রম দস্তিদারের মাধ্যমে, কিন্তু তিনিই পুলিশের পরবর্তী পদক্ষেপটা সামলে রেখেছেন। পুলিশ এই ক্রাইমের মধ্যে তেমন নাক গলায়নি এখনও। যে কয়েক লাখ টাকা পেনসন ফান্ড থেকে উধাও হয়েছে তাও হল্ অ্যান্ড লাড্‌লো কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেকটরস্ আস্তে আস্তে পূরণ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একজন সহকর্মীর দোষে কোম্পানির অনুগত অফিসাররা কেন ক্ষতিগ্রস্ত হবেন?

ক্লান্ত ও হতাশ ইরাবতী জিজ্ঞেস করেছে, "আর কতদিন আমাকে এইভাবে তোমার বাড়িতে রাখবে সুখময়?"

"যতদিন প্রয়োজন হবে—ব্যাপারটা ফয়সালা তো করতেই হবে ইরাবতী।" শান্তভাবে বুঝিয়েছে সুখময়, তার উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে ওর মনোবল ফিরিয়ে আনা।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভীষণ সঙ্কোচ বোধ করে ইরাবতী।

"সঙ্কোচের কী আছে? তোমরা না-থাকলে এই পাম অ্যাভিনিউ ফ্ল্যাট তো আমার থাকতো না, ইরাবতী" সুখময়ের সেই পুরনো উত্তর। "তুমি যতদিন এখানে থাকবে আমি ততো ঋণী হবো তোমাদের কাছে।"

সুখময় ভালভাবে জানে ইরাবতী এখন টাকা দিলেও মনের মতন ঘরভাড়া পাবে না কলকাতায়। যাদের বাড়ি আছে তারা কাউকে ভাড়া দেবার আগে ভাবী ভাড়াটিয়া সম্পর্কে বহু রকম খোঁজখবর নেয়।

সুখময় আরও বলেছে, "তাছাড়া, ইরাবতী, ওরা যখন রমিতবাবুকে খুঁজে বার করবে তখন তোমার এবং আমার ছোটাছুটি অনেক বেড়ে যাবে। সেইসময় একটা ভদ্রস্থ ঠিকানা আমাদের খুব কাজে লাগবে।"

এতো মাস পরে আর এই ধরনের স্তোকবাক্য শোনার মানসিকতা ইদানীং থাকছে না ইরাবতীর।

তার অধৈর্য সমালোচনা : "কেন আমাদের কাজ বেড়ে যাবে? যারা জেনেশুনে এই সব গোলমালে জড়িয়েছে তারা তো নিজেরাই নিজেদের সামলাবে।"

ইরাবতী তো কখনও স্বামীর ওপর অন্যায় চাপ দেয়নি, আমার এই চাই, ওই চাই। আমাকে ফরেনে বেড়াতে নিয়ে চলো, জুয়েলারি কিনে দাও মনের মতন। "যা তিনি সংসারে সহজভাবে এনেছেন আমি তো তাতেই চিরদিন সন্তুষ্ট ছিলাম সুখময়।" কান্নায় ভেঙে পড়েছে ইরাবতী।

ইরাবতীকে সারাক্ষণ এইভাবে ভাবতে বারণ করেছে সুখময়। "আমার নিজের কেউ এমন বিপদে পড়ে গেলে আমি কী করতাম, ইরাবতী? আমি বুঝি এখানে তোমার অনেক অসুবিধে। এই ছোট্ট পায়রার খোপরে তোমাকে দিনরাত বন্দি থাকতে হচ্ছে। অফিসে আমি কত সামান্য মাইনে পাই তা তোমার অজানা নয়। এই পায়রার খোপ পাল্টানো অসম্ভব, ধাপে ধাপে যেভাবে ভাড়ার পরিমাণ বাড়ছে এই শহরে।"

একটু থেমে সুখময় বলেছে, "জানো ইরাবতী, আমার সাংবাদিক বন্ধু বিশ্বামিত্র বসুরায় বলছিল, সবাই বলে বেড়াচ্ছে কলকাতা ডেড সিটি, শহরটা মরে গিয়েছে, শুধু এর সৎকার বাকি। অথচ লোকে এখান থেকে নড়তে চায় না। শহরের জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! মরে যাবার পরেও গ্রোথ। যারা এই শহরে আশ্রয় এবং অন্ন সন্ধানে আসছে তাদের তো মাথার ওপর ছাদ চাই, সেইসঙ্গে চাই পায়ের

তলায় একটু সিমেন্টের মেঝে। আজকালকার বাড়ি বলতে কেবল ছাদ এবং মেঝে, আর সব সম্ভারের দিকে তাকানো যায় না, দেখছো না নতুন কাঠের দরজাগুলো দু'তিন বছরে বেঁকে যাচ্ছে। জানলা একবার বন্ধ হলে খুলতে চায় না এবং খুললে বন্ধ করতে হিমশিম খেতে হয়!"

এর পরেও সময় এগিয়েছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। রমিত সেনগুপ্ত সম্পর্কে সব রকম খোঁজখবর সংগ্রহ পূর্ণ উদ্যমে চলমান রয়েছে কিন্তু কোথাও তেমন ফল হয়নি।

হল্ অ্যান্ড লাড্লোর নিপুণ ম্যানেজিং ডিরেকটর সদাশিব কাঞ্জিলালও যে শেষপর্যন্ত এবিষয়ে কী করবেন তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। মধ্যিখানে গুজব রটেছিল, ইরাবতীকে জড়িয়েই কোম্পানি একপ্রস্থ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল মামলা শুরু করে দেবে।

আরও যা গুজব রটেছিল তা ইরাবতীকে বলতে ইচ্ছা করেনি সুখময়ের। এই মামলায় নাকি রাজসাক্ষী হতে পারে সহসা। সহসা সাসপেন্ডেড্ হলেও সেইজন্য এখনও সম্পূর্ণ বরখাস্ত হয়নি। নিয়মিত মাসোহারা দিয়ে হাতের পাখিকে বনের পাখি হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

এবার ধৈর্য হারাবার সময় আসছে ইরাবতীর। অকারণে সদাশিব কাঞ্জিলালের অফিসে হত্যে দিয়ে পড়ে না থেকে ইরাবতী নিজেও বিভিন্ন মহলে ঘোরাঘুরি আরম্ভ করেছে।

সুখময়কে না জানিয়েই ইরাবতী নিজের পায়ে দাঁড়াবার পথ খুঁজছে, যাতে সুখময়কে অনন্তকাল ধরে বাড়তি বোঝা বইতে না হয়। দীর্ঘ সময় ধরে সুখময় যা করছে তার কোনও তুলনা জানা নেই ইরাবতীর, যদিও

সে বোঝে মানুষটা নিতান্তই সহজ ও সরল—ওর মধ্যে অত হিসেবনিকেশের তাড়াহুড়ো নেই। পরিচিত একজন মানুষ বিপদে পড়েছে, তার কাছে কৃতজ্ঞতার কারণ আছে, অতএব যা করবার তা অবশ্যই প্রাণ দিয়ে করো। তার জন্যে বিশ্বসংসারে কোথায় কি কথা উঠলো, কি মন্তব্য হলো, তা নিয়ে একটুও ব্যাকুলতা নেই সুখময়ের। কিন্তু তাই বলে বেচারা সুখময়কে অনন্ত কাল ধরে তার নিজের বাড়ির বৈঠকখানাতে এক ফালি সরু বেঞ্চির ওপর পড়ে থাকতে হবে এবং নিশ্চিন্তে পাশ ফেরা যাবে না, এটা কী কথা? ইরাবতী এসব বিষয়ে অনেক ভাবে, কিন্তু বেশি ভাবলেই সে কেমন দিশাহারা হয়ে যায়।

তাই ইবাবতী খোঁজ করছে, কোথাও কিছু কাজকর্ম পাওয়া যায় কি না। উঁচু মহলের পরিচিতরা এখন ইরাবতীকে চিনতে পারলেই এড়িয়ে যান। হয় তাঁরা দেখা কবেন না, না-হয় বলেন মিটিংয়ে রয়েছেন পরে কথা হবে। কিংবা এক মুহূর্তের জন্যে দায়সারা সাক্ষাৎ করেই জিজ্ঞেস করেন, মিস্টার সেনগুপ্তর এই সব দুর্মতি হলো কেন? যাইহোক, সেনগুপ্ত নিশ্চয় পর্যাপ্ত ফিনান্সের ব্যবস্থা করে গেছেন, যাতে সারা জীবন আপনার কোনও অসুবিধে না হয়। ওই সব লুকানো নগদ টাকা সাবধানে খাটাবেন মিসেস সেনগুপ্তা, কলকাতা শহরে কেউ টাকার রঙ সাদা না কালো সে নিয়ে মাথা ঘামায় না। আপনার কোনও কাজকর্মের হাঙ্গামায় যাওয়ার দরকার কী? এনজয় লাইফ।

পরিচিতরা ভয় পেয়ে যতই দূরে সরে যান এবং ইরাবতীর দিকে সহানুভূতি অথবা সাহায্যের হাত এগিয়ে দিতে দ্বিধা করুন, এ সংসারে সবাই সমান নয়।

ঘুরতে ঘুরতে মিসেস চারুলতা চট্টরাজের সঙ্গে অনেক দিন পরে ইরাবতীর দেখা হয়ে গিয়েছে। স্বামীর সঙ্গে মিসেস চট্টরাজ একসময় নিয়মিত টলিতে যেতেন সুইমিং করতে। পরে ওখানে তাঁর যাওয়া বন্ধ হলো, স্বামী নির্দ্বিধায় ডাইভোর্স করলেন এক ধনী বিধবাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার বৃহত্তর ও লোভনীয় আকর্ষণে।

মিসেস চারুলতা চট্টরাজ প্রাণধারণ ও সংসারপালনের জন্যে ছোট্ট এক এজেন্সি খুলেছেন বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ দুইয়ের জন্যেই। ছোট সংস্থা, বেশ কিছুদিন স্ট্রাগ্‌ল করার পরে এখন আই-এন-এস স্বীকৃতি পেয়েছেন, না হলে পনেরো পার্সেন্ট কমিশনের পাঁচ পার্সেন্ট মিড্‌লম্যানকে দিয়ে দিতে হচ্ছিল।

মিসেস চট্টরাজের কাছে কোনো কিছুই ব্যাখ্যা করতে হলো না। কলকাতার সোসাইটি মহলে যাঁরা মাঝেমাঝে ঘুরে বেড়ান তাঁদের কাছে রমিত সেনগুপ্তর ব্যাপারটা এখন পুরোপুরি জানা।

মিসেস চট্টরাজ সহানুভূতির স্বরে ইরাবতীকে বললেন, "বুঝি আপনার অবস্থা। আমার স্বামী যখন হঠাৎ আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে ফরেনে চলে গেলেন তাঁর বিধবা বান্ধবীকে নিয়ে তখন আমিও অথৈ জলে পড়েছিলাম। মিসেস সেনগুপ্ত, দুঃখকষ্ট ভুলে আপনি আমার কোম্পানিতে জয়েন করুন। একলা কোম্পানিটা ভাল চালাতে পারি না, আপনি মদত দিয়ে যদি কিছু করতে পারেন। সামান্য কিছু মাইনে পাবেন, বেশি দেবার ক্ষমতা আমার যে নেই তা বিজনেসের হিসাবপত্তর দেখলে নিজেই বুঝবেন।"

মিসেস চট্টরাজ আরও বললেন, "ধর্মের কল বাতাসে নড়ে কথাটা শুধু গীতা এবং বাইবেলে লেখা নেই, জীবনেও ঘটে। আমার স্বামীর বান্ধবী সেই মহিলা অসুখে ভুগে ভুগে ছ'মাস আগে চলে গিয়েছেন। এখন আমার স্বামীদেবতা আবার বাড়ি ফিরতে চান। মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করছেন। কিন্তু আমার কোনো উৎসাহ নেই, তাড়া তো নেই-ই। কোন্ ব্যাংকে স্বামীদেবতার কত টাকা জমা আছে সেসব গল্পও মাঝেমাঝে রসিয়ে রসিয়ে আমাকে শোনাচ্ছেন, কিন্তু আমার ওসবে ঘেন্না ধরে গিয়েছে, ভাই। মনে রাখবে, যে টাকা নিজে রোজগার করতে পারবে সেইটুকুই মেয়েদের জেনুইন, এটা কখনও ভুলো না। এদেশটা এবং দেশের পুরুষমানুষগুলো কেমন যেন স্বার্থসর্বস্ব হয়ে যাচ্ছে, এদের বিশ্বাস করে কোনো শান্তি পাবে না।"

প্রথমে একটু মনোকষ্ট হয়েছিল সুখময়ের। কিন্তু পরে আর রাগ হলো না। ইরাবতী যদি দুপুরবেলায় চুপচাপ বাড়িতে বসে না থেকে কোথাও কাজেকর্মে

একটু ব্যস্ত থাকে তবে মন্দ কি?

মাইনে যদিও নাম কা ওয়াস্তে, কোনরকমে প্রতিদিন মিসেস চট্টরাজের অফিস যাওয়াআসার খরচটা উঠবে, কিন্তু তবু তো একটা ব্রেক পাওয়া গেলো। ইরাবতী নিশ্চয় খানিকটা মানসিক বল পাবে।

"তুমি যা ভাল বুঝবে তা অবশ্যই করবে।" ইরাবতীকে সোজাসুজি এবং স্পষ্টভাষায় আশ্বাস দিয়েছে সুখময়।

"উঁহু। তোমার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে তা একবার বলতে হবে। সুখময়, তুমি তো জানো, পৃথিবীতে আর কারও কাছে যাবার নেই আমার।"

সুখময় আর কথা বাড়ায়নি। এই ইরাবতী যাতে সুখী হবে তাতেই তার সম্পূর্ণ এবং শর্তবিহীন সমর্থন থাকবে। এরপর সুখময় বলেছে, "ইরাবতী, অফিসে আমার দুশো টাকা মাইনে বেড়েছে। কিন্তু পুরোটা লাভ হবে না। বাড়িওয়ালাকে এই মাস থেকে একশ টাকা বেশি দিতে হবে, আগাম সেই রকমই লেখা ছিল চুক্তিপত্রে, আমার খেয়াল ছিল না।"

সময়ের কাঁটা যেন আরও দ্রুত ঘুরছে। ওই যে সুখময় একদিন ইরাবতী সেনগুপ্তকে সান্ত্বনা দিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত কোথাও কোন কষ্ট থাকবে না। তাই বোধ হয় হতে চলেছে ইরাবতীর জীবনে।

কথাটা সুখময় প্রথম যখন শুনেছিল তখন তেমন বিশ্বাস হয়নি। সেই পুরনো গল্প মনে পড়েছিল, রোগীকে পরীক্ষা করে বৈদ্য বলেছিলেন, ছ'টা মাস কষ্ট থাকবে। রোগী প্রশ্ন করেছিল, তারপর ভাল হয়ে যাবে তো? বৈদ্য একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন, বললেন, ছমাস পরে সব সহ্য হয়ে যাবে।

নিজের জীবনের সমস্ত হিসেব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ইরাবতীর। সব সমস্যার যে সমাধান হয় না এই পৃথিবীতে তা শেখবার মতো দৃষ্টিভঙ্গি

এতদিনে ইরাবতীর মধ্যে সৃষ্টি হতে চলেছে। যখন হঠাৎ সমস্ত আকাশ কালো করে ঘন মেঘ এলো, ঝড় উঠলো, বার্ডওয়ান রোডে সার্চ অ্যান্ড সিজার পার্টির বেয়াদপ লোকগুলোর দাপাদাপি শুরু হলো তখন ইরাবতীর মনে হয়েছিল পৃথিবী সত্যিই শেষ হতে চলেছে।

সেই সময় ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতন কোথা থেকে হাজির হলো সুখময়। অন্য অনেকের মতন মিষ্টি কথা বলে সুখময় অবশ্যই চলে যেতে পারতো, কিন্তু সে যায়নি। সুখময়ের হয়তো সাধ্য তেমন কিছু নেই তবু ধৈর্য ধরে, সাহস করে সারাক্ষণ পাশে দাঁড়িয়েছে তো।

তারপর গোয়েন্দাদের যত অনুসন্ধান চলেছে তত ভুল ভেঙেছে ইরাবতীর, রমিত এখনও এদের হাতে ধরা পড়েনি। এদের হাতে বন্দি হলে মানুষটার যে কি দুর্গতি হবে, শরীরের ওপর কি প্রবল ধকল পড়বে তা কল্পনা করে শিউরে উঠেছে ইরাবতী।

তখন প্রতিটা কাগজপত্তর নিয়ে হয়তো অনেকেরই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে, ইরাবতী যে কিছুই জানে না, তা এরা নিশ্চয় বিশ্বাস করবে না। এছাড়া রয়েছে রমিতকে রক্ষা করার পালা। ইরাবতী শুনেছে, জেল হাজতে মানুষকে আস্ত রাখে না পুলিশ। তারপর তো মামলা-মোকদ্দমার ঢেউ। এসব সমস্যা একটা মামলায় শেষ হয় না, কয়েক ডজন মামলা চলতে পারে একের পর এক। যাঁরা মামলা করেন তাঁরা অভিযোগের সংখ্যা অত্যধিক বাড়িয়ে দিয়ে ব্যাপারটা নিশ্ছিদ্র রাখতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

কিন্তু এসব লড়াই তো এখনও শুরুই হলো না। মানুষটা যে কোথায় গা ঢাকা দিয়ে বসে রইলো তা কে জানে? ইরাবতীর কখনও দুঃখ হয়, কখনও রাগ হয়। টাকা নিয়ে অন্যায় করলে, বিশ্বাসের অমর্যাদা করলে এবং সাধ্যের অতীত সুখ উপভোগ করলে পৃথিবীতে কি ধরনের শাস্তি হয় তা তো রমিতের অজানা থাকার কথা নয়।

আবার ইরাবতীর দুঃখ হয়, লোকটা বড্ড নরম ছিল, নিজে যত না ভোগ করেছে, তার থেকে বেশি অপরকে বিলিয়েছে,' কিংবা রমিত মহারাজ রন্তিদেব হতে চেয়েছে সকলকে সীমাহীন আপ্যায়ন করে। এসবের যে

শেষপর্যন্ত কোনো মানে হয় না তা মানুষটা অতো বুদ্ধিমান হয়েও বুঝলো না কেন?

আর ইরাবতীর নিজের জীবন? কত অল্পে যে দৈনন্দিন জীবন যাত্রা এখনও সম্ভব তা সুখময়ের ক্ষুদ্রসংসারে পদার্পণ না করলে বোঝা যেতো না।

সুখময়ের নিজের কোনো শখ নেই বললেই চলে—মাঝে-মাঝে শুধু পত্রপত্রিকা কিংবা রামকৃষ্ণ সংক্রান্ত বই নিজের সংগ্রহে রাখতে চায়। এসব বইতে সুখময় শুধু দাগ দেয় না, মার্জিনে অনেক মন্তব্য লিখে রাখে। ঠাকুর-স্বামীজীকে নিয়ে নতুন কিছু লেখা আজকাল খুব কঠিন কাজ। কোথা থেকে খবর পেয়েছ তা আগাম জানিয়ে দাও, লেখা পড়ে আচমকা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ঘাড়ের ওপর নেকড়ের মতন ঝাঁপিয়ে পড়বার মতন লোক ইদানীং অনেক বেড়ে গিয়েছে। অথচ মানুষ এখনও রামকৃষ্ণের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে জানতে চায়, বিশেষ করে তাঁর অপ্রচলিত অস্বস্তিকর কথাগুলো লোককে বিস্মিত করে।

ইরাবতী নিজেও অবাক হয়ে যায়। সোফারচালিত গাড়ি ছাড়া বিবাহিত জীবনে যে দশফুট রাস্তাও যাতায়াত করেনি, সে কেমন ধৈর্য ধরে তিরিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে দে'জ মেডিক্যালের মিনিবাসের সন্ধানে। আবার কখনও অপেক্ষা শুরু হয় তপসিয়াগামী বড় বাসের জন্যে, বড় বাসে যে ভাড়া কম তা ইরাবতী আজকাল মনে মনে হিসেব করে।

সেদিন সন্ধ্যায় সুখময় একটু দেরিতেই পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে ফিরল।

রমিত সেনগুপ্তর অন্তর্ধান সম্বন্ধে শেষ খবরগুলো সাংবাদিক বন্ধু বিশ্বামিত্রর মাধ্যমে সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। মানুষটা সম্বন্ধে নতুন কিছু জানা যাচ্ছে না।

সুখময় দেখল, ইরাবতী আগেই আবাসনে ফিরে এসেছে। স্নান সেরে নিয়ে গম্ভীর হয়ে সে বসে আছে। সুখময় এই সময় নিজেই চা তৈরি করে। আজ ইরাবতী তাকে রান্নাঘরে ঢুকতেই দিল না। গরম চা উপভোগ করতে করতে সুখময় দেখলো ইরাবতী আজ খুবই চিন্তিত।

ইরাবতীর কানে নতুন কিছু খবর এসেছে না কি? সুখময় এখনই জানতে চায়।

খবর কিছু এসেছে, একটু ঘুরে। মিসেস চারুলতা চট্টরাজ বিশ্বস্ত সূত্র থেকে শুনেছেন সহসার ব্যাপারটা। সহসা যে রমিতের সঙ্গে গোপন অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল সে সম্বন্ধে এই ভদ্রমহিলার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মিসেস চট্টরাজের কাছে এবিষয়ে অকাট্য রিপোর্ট আছে। সহসা এবং রমিত কয়েকটা হোটেলে একই সঙ্গে একই ঘরে বসবাস করেছে। "জাস্ট থিংক অফ ইট!" মিসেস চট্টরাজ বলেছেন ইরাবতীকে। "লেডি সেক্রেটারি এবং সায়েব একই হোটেলের একই বিছানা শেয়ার করেছে, দেশটার কী হলো ভাই! বিয়ে জিনিসটার কোনো মূল্য রইলো না।"

আসলে রমিত সেনগুপ্ত যখন বুঝতে পেরেছিল যে সদাশিব কাঞ্জিলাল এবার জাল গুটোচ্ছেন তখনই মানুষটার মধ্যে একটা বেপরোয়াভাব এসে গেলো। কয়েকটা দিন যা প্রাণ চায় তাই করা যাক এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন কামনা এই অবস্থায় অনেকসময় মানুষের মধ্যে জেঁকে বসে।

একই সময়ে সহসার মাথাতেও নিশ্চয় পাগলামো ঢুকেছিল। রমিতের সাময়িক দুর্বলতায় সুযোগটা সে পুরোপুরি গ্রহণ করলো। মানুষটার সর্বনাশ আসন্ন জেনেও রমিতকে জয় করে তার সান্নিধ্য চাইলো সে। সাহস কম নয় এক এক জায়গায় এক এক দাম্পত্য নামে থেকেছে এরা দু'জনে।

কলকাতায় ফিরে সহসা অবশ্য মিস্টার ব্যতিক্রম দস্তিদারকে বুঝিয়েছে, সে রমিতকে বোঝাতে গিয়েছিল, পালিয়ে না বেড়িয়ে সময় থাকতে কোম্পানির কাছে আত্মসমর্পণ করো। মিস্টার সদাশিব কাঞ্জিলাল ষড়যন্ত্রটা পুরোপুরি বুঝবার আগে নিজেই তাঁর কাছে সব বলে ফেলো। হয়তো বাঁচবার একটা পথ বেরিয়ে আসবে।

সহসা ও রমিত যে একই হোটেলে একই ঘরে থেকেছে সে প্রমাণ মিস্টার ব্যতিক্রম দস্তিদারের অনুসন্ধানীরাও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। সহসা নিজেও কলকাতায় আচমকা ফিরে এসে সে খবর চেপে রাখেনি।

ওই ব্যাপারে কোনো লজ্জাবোধ নেই। সহসা সগর্বে বলেছে, "ওই

ক'দিনই আমার জীবনের সেরা দিন। মনে রাখার মতো দিন। আমি কখনও ওঁকে এই ভাবে নিজের কাছে পাবো তা স্বপ্নেও ভাবিনি।"

সহসার বিস্তৃত কাহিনী শুনে ইরাবতীর মাথায় আগুন চেপেছে। রাতে বেডরুমে ঢোকবার আগে বাইরের ঘরে সে অনেকক্ষণ পাথরের মতন বসে রইল। তারপর ঘরের ভিতরে ঢুকে গিয়ে ব্যাগ খুলে একটা স্ট্রাইপড্ পাজামা বার করে আনল। আচমকা সেই পাজামা আজ সুখময়কে পরতে প্রায় বাধ্য করল ইরাবতী—নীল স্ট্রাইপের রাতের নাইট ড্রেস ; সুখময় তো অন্যদিন পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে শুয়ে পড়ে।

সুখময় মন্ত্রমুগ্ধের মতন আজ ইরাবতীর খেয়ালটা মেনে নিল। এই স্ট্রাইপড্ পাজামা এখন আর সুখময়ের অচেনা নয়।

তারপর রাত অনেক। হঠাৎ সুখময়ের ঘুম ভেঙে গেলো, মনে হলো বেডরুমের ভিতর থেকে ইরাবতী যেন টোকা দিচ্ছে। দরজার ছিটকিনি কি তাহলে আবার আটকেছে? সুখময় বাইরের ঘরের ডিভান থেকে উঠে পড়ে আবার বাইরে থেকে বেডরুমের দরজার নব টেনে ধরলো, একটু জোর গলায় সুখময় পরামর্শ দিল, এবার ছিটকিনিটা নড়াও ইরাবতী। তোমার কোনো চিন্তা নেই।

রুদ্ধ অর্গল মুক্ত করে সুদেহিনী ইরাবতী এবার সশরীরে বেরিয়ে এসেছে। এ তো ইরাবতীর ঘুমোবার সাজ নয়। সে আজ নীল শাড়িতে শরীরটাকে সযত্নে জড়িয়ে নিয়েছে।

ইরাবতী খুব কাছে এসে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "ছিটকিনিটা এমন করে কেন বল তো?" সুখময় বলল, "নতুন ছিটকিনি, সড়গড় হতে সময় নেয়।" ইরাবতী জানালো, "আমার ভীষণ ভয় লেগে গিয়েছিল। আচমকা ঘুম ভেঙে গেলো। মনে হলো যে সিংগল খাটটায় আমি একলা শুয়ে আছি সেটা কেউ আমাকে না জানিয়েই হুড়মুড় করে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে রেডি হয়ে আছে। আর একটু দেরি হলে ওরা খাটটা টানতে আরম্ভ করতো সুখময়। তুমি বিশ্বাস

করো।”

“ইরাবতী, তুমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছিলে,” ওকে আশ্বাস দিতে চেষ্টা করছে সুখময়।

ইরাবতী অসহায়ভাবে বললো, “আমি ওই অবস্থায় তোমাকে কতবার ডাকলাম, কিন্তু তুমি কাছে এলে না। কেন সুখময়? আমি ডাকলেও তুমি আমার কাছে আসবে না?”

“কোনো ভয় নেই। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে যাও ইরাবতী। ভাল করে ভেবে দেখো, তোমার সিংগল খাটে চাকা পর্যন্ত নেই, কেউ ওটা নাড়াবে না। তুমি ভিতর থেকে ভাল করে ছিটকিনি বন্ধ করে দাও।”

এবার হঠাৎ ইরাবতী সাহস করে এগিয়ে এসে প্রায় উন্মাদের মতন সুখময়ের ডান হাতটা নিজের উষ্ণ হাতের মধ্যে তুলে নিল। “আমি শোধ তুলবোই। আমাকে তুমি আর ইরাবতী বলবে না, টুকটুকি বলে ডাকবে। কিংবা মিষ্টি সোনা।”

এরপর দু'জনেরই বাঁধ ভেঙেছে। ইরাবতীর পাগলামি সেরাত্রে নিয়মের, নীতির, সৌজন্যের কোনো বাধা মানে নি।

সুখময়কে আলিঙ্গনে আবদ্ধ রেখে তার প্রেয়সী শুইয়ে দিয়েছে ওই ঘরের দ্বিতীয় খাটে। মেয়েরা প্রতিশোধ নেবার জন্যে এইভাবে পাগল হয়ে উঠতে পারে তা সুখময়ের ঠিক জানা ছিল না।

উন্মাদিনী ইরাবতী লজ্জা ভয় বিসর্জন দিয়ে আদর করছে সুখময়কে, বলছে “তুমিই আমার সব মিঠু।”

যতদিন ইরাবতী তার বন্ধু সুখময়ের বোঝা হয়ে ছিল ততদিন এই ধরণের কোনো কথা সে বলেনি, এখন ইরাবতী নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, তার পরনির্ভরতা বিলুপ্ত হয়েছে, এখনই তো নিজেকে সুখময়ের কাছে উপহার দেবার সময়।

সুখময় তখন মনে মনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ করছে। “ঠাকুর আমি কি করছি! আমাকে সংযত করো, পথ দেখাও।”

ইরাবতী পাগলের মতো আজ যেভাবে প্রবল আবেগে সুখময়কে

আলিঙ্গন করছে, আদর করেছে, তা কি কেবল প্রতিহিংসার আগুনে? সহসা বলে একটা মেয়ের ওপর বোধহয় শেষ প্রতিশোধ নিচ্ছে ইরাবতী।

রমিত চুরি করেছে, লোক ঠকিয়েছে, বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে বলে তত দুঃখ নেই ইরাবতীর, যত দুঃখ যত যন্ত্রণা এই সহসার সঙ্গে সে একই ঘরে একই বিছানায় রাত্রিবাস করেছে বলে। শরীর দিয়ে প্রতিশোধ না নিয়ে শরীরের আগুন নেভাবার সাধ্য এই মুহূর্তে ইরাবতীর নেই।

রমিত তোমার সাহস থাকে তো ঐ সহসাকে এখানে নিয়ে এসে এক সঙ্গে দেখো ইরাবতী এই মুহূর্তে পাম অ্যাভিনিউর রাত্রিকে অবজ্ঞা করে সমস্ত লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে কী করে তার অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছে।

রমিত সেনগুপ্তর গুপ্তপ্রণয়ের খবরটা বিভিন্ন মহলে ক্রমশ বিস্তারিতভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ইরাবতী বড়াই করে তার নেওয়া অভিনব প্রতিশোধের বিবরণ মিসেস চট্টরাজকে নিবেদন করেছে। মিসেস চট্টরাজ এই গল্পটা কাকে কীভাবে কি বলেছেন কে পরিবেশন করেছেন তা কে জানে।

বিবাহিত না হয়েও এমন যুগল জীবন যাপনের পর্ব অনিচ্ছাকৃতভাবে তার জীবনে এসেছে একথা সুখময় বোধহয় জোর করে বলতে পারবে না।

যে দিন নিরালায় এবং বিপন্না ইরাবতীকে বার্ডওয়ান রোডের সার্চ পার্টির হাত থেকে উদ্ধার করে সুখময় নিজের বাড়িতে এনে তুলেছিল সেদিন এসব সম্ভাবনা অবশ্যই মাথাতে আসেনি। তখন ছিল গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ এবং দায়িত্বপালনের অন্ধ আবেগ। যারা তার জন্যে এতো করেছে, যারা না থাকলে সুখময়ের চাকরিটা কিছুতেই হতো না, তাদের বিপদের সময় আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে না পড়াটাই তো অন্যায় হতো সুখময়ের।

এই উপকারের পিছনে অবশ্য একজন মানুষ নেই। সহসা রায়চৌধুরী,

রমিত সেনগুপ্ত, ইরাবতী তিনজনেই ছিলেন। ভাগ্যের এক বিচিত্র খেয়ালে এই তিনজনেই সর্বনাশা আবর্তে জড়িয়ে পড়েছে। সহসা যে কোথায় লুকিয়েছে, পুরো নাটকে তার ভূমিকা কতটুকু তা পুরোপুরি এখনও জানা হয়নি।

আর ইরাবতী। ধীরে ধীরে সে সুখময়ের ওপর বোধ হয় তার প্রসন্ন প্রভাব নিশ্চিতভাবে বিস্তার করেছে।

সুখময় বুঝেছে, ইরাবতীকে দীর্ঘদিন ধরে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। যদি রমিত সেনগুপ্ত অজ্ঞাতবাসে না গিয়ে কোম্পানির অভিযোগগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াতেন, তা হলে মন্দ হতো না। এক এক সময় এমন স্বপ্নও দেখেছে সুখময় যে রমিত সেনগুপ্ত বিনা নোটিশে কলকাতায় ফিরে এসে হৈ চৈ বাধিয়ে দিয়েছেন, শত্রুদের তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, "আমাকে নিয়ে আপনাদের এত মাথাব্যথা কেন? এই নিন কোম্পানির হিসেব। কে বলেছে তহবিল তছরূপ হয়েছে?"

এখন কিন্তু ব্যাপারটা ভীষণ জটিল হয়ে দাঁড়ালো। সুখময়, তুমি তো এখন আর সেবক অথবা দর্শকের ভূমিকায় রইলে না! নাটক দেখতে এসে নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে তুমি স্বেচ্ছায় মঞ্চে প্রবেশ করেছো নিজেরই দায়িত্বে।

টুকটুকির শারীরিক ও মানসিক সান্নিধ্যে এই যে বসবাস এর নাম কী? বিবাহ বন্ধন নেই, অথচ এক সঙ্গে থাকা।

বাংলায় এর কোনো এমন সম্পর্কের জন্য কোনো শব্দ নেই, ইংরিজি একটা কথা অবশ্য বাংলায় চুপিচুপি ঢুকে পড়েছে—লিভ টুগেদার। একত্রে বসবাসের তো অনেক সুবিধা। শরীরের অপ্রাপ্তি নেই, আইনের ঝামেলা নেই, দু'জনেরই মত পরিবর্তন হলে বিচ্ছিন্ন হবার বাধা নেই, সম্পত্তির ভাগাভাগি নেই, উকিল এবং আদালতের কোনো ভূমিকা নেই। অথচ দুরন্ত যুগল জীবন। সমস্ত বন্ধন থেকে তুমি আশ্চর্যভাবে মুক্ত অথচ বিবাহিত বন্ধনের যা সুখ ও সুবিধা তা পরিপূর্ণভাবেই তোমার করায়ত্ত। সেই জন্যেই পশ্চিমে আজ লিভ টুগেদারের প্রতি এতো আকর্ষণ। কবিরা একেই বন্ধনহীন গ্রন্থি বলতে শুরু করেছেন।

• বিয়ে করতে গেলে দশবার ভাবতে হয়। বিয়ে ভাঙলে কী অবস্থা হবে তার হিসেবনিকেস আগাম কষতে গিয়ে দু'পক্ষের মাথা গোলমাল হয়ে যায়। আচমকা বিয়ে করে এবং পরে বিয়ে ভেঙে কত স্বামী যে বিপন্ন অবস্থায় দেশবিদেশে বিচরণ করছে তার হিসেব নেই।

বিচ্ছেদের এই পর্বের একটা সাংকেতিক নাম হয়েছে—তিনি "কঠিন সময়ের" মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ ডাইভোর্সের সমস্ত প্রক্রিয়া অথবা আঘাত এখনও শেষ হয়নি। খুব কৃতী, খুব ধনবান ছাড়া এই ঘা সামলানো প্রায় অসম্ভব, কারণ যা কিছু সঞ্চয় এবং সম্পদ তা চোখের সামনে দুটো ভাগ হয়ে যায়। বিবাহের এই বৈষয়িক দিকটাই বিবাহের পবিত্রতাকে যেন কলুষিত করছে।

আর লিভ টুগেদার? সে তো মুক্ত মানব-মানবীর উদার উন্মত্ত আলিঙ্গন। যে বন্ধনহীন বন্ধন শরীরকে স্বীকৃতি দেয়, ভালবাসাকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু আইনকে অবমাননা করে।

এদেশে এখনও পশ্চিমের অবস্থা হয়নি। আনুষ্ঠানিক বিবাহকে এখনও সম্পূর্ণ সন্দেহের চোখে দেখার রেওয়াজ তেমন শুরু হয়নি। তবু বিয়ে না করে একত্র বসবাস একেবারে অপ্রচলিত থাকছে না। তবে সামাজিক স্বীকৃতি অবশ্যই নেই।

শোনা যায়, এক ভদ্রলোক তার লিভ টুগেদারের বান্ধবীকে নিয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। ভাবী বাড়িওয়ালা যেমন শুনলেন দু'জনের বিয়ে হয়নি, অমনি পিছিয়ে গেলেন। তাঁর আশঙ্কা রক্ষিতার বাড়ি হিসাবে চিহ্নিত হলে তাঁর ফ্ল্যাটের স্থায়ী বদনাম হবে, ভবিষ্যতে হয়তো আর গৃহস্থ ভাড়াটে জুটবে না। বাড়িটা করা হয়েছে ভদ্রভাবে বসবাসের জন্যে, বেয়াড়া অপব্যবহারের জন্যে নয়।

ভাগ্য ভাল সুখময়ের। এই বাড়িটা এসব সমস্যার জন্মের আগেই ভাড়া নেওয়া হয়েছে। এখন এসে বাড়িওয়ালা মাতব্বরি করতে পারবেন না, কোন রমণী এখানে সুখময়ের সঙ্গে একত্রে বসবাস করছে, সুখময়ের সঙ্গে কী তার সম্পর্ক।

আর এই কদিনে পাম অ্যাভিনিউ আবাসনের ভোল পাল্টে দিয়েছে ইরাবতী। এতদিন সে যেন ছিল অতিথি, কোথায় কী থাকবে আর কী থাকবে না, সে ব্যাপারে ইরাবতী দেখেও দেখেনি। তারপর সে রাতের আত্মনিবেদনের পরে ইরাবতী আর অতিথির ভূমিকায় নেই। শক্ত হাতেই সে সংসারের হাল ধরেছে, সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে ব্যাচেলরের ঘর দুটোর ভোল সে পাল্টে দিয়েছে।

শুধু যে-মেয়েটা এ বাড়িতে ঠিকে কাজ করতো তাকে সহ্য হয়নি ইরাবতীর। যে দাদাবাবু এতদিন বাইরের ঘরে রাত কাটাতো তাকে নতুন দিদিমণি একই ঘরে টেনে নিয়েছেন দেখে সে নাকি সোজাসুজি ইরাবতীকে জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমাদের কবে বে হলো?"

প্রশ্নটা মোটেই ভাল লাগেনি ইরাবতীর। কাজের লোকটিকে যেতে হয়েছে। নতুন যে কাজের মেয়ে এসেছে, সে এসবের খোঁজ রাখে না, দাদা বউদিকে শুরু থেকেই সে এক ঘরে শুতে দেখছে। যদিও খাট দুটোর মধ্যে কেন কিছুটা দূরত্ব থাকে তা সে বুঝতে পারে না।

এখন রাত অনেক। ইরাবতী অনেকক্ষণ সুখময়ের সিংগল বেডে প্রিয় বন্ধুর খুব কাছে শুয়েছিল।

সুখময় বোঝে, ইরাবতীর এই ফুটন্ত আলিঙ্গনের পিছনে যত অভিমান আছে, ঠিক তত প্রতিশোধের আগুন আছে।

অফিসে কে যেন সহসাকে বেশ ভালভাবে চেনে। তাকে সহসা নাকি

একান্তে তাদের ছবি দেখিয়েছে—যুগল ছবি—যেখানে রমিত সেনগুপ্ত ও সহসা রায়চৌধুরী একত্রে হাসছে প্রাণভরে।

ইরাবতী নিতান্ত অসহায় হয়েই যেন অনেকক্ষণ নিবিড় আলিঙ্গনের এক তরফা শৃঙ্খলে বন্দী করে রেখেছে তার দুর্লভ সম্পদ সুখময়কে।

তারপর ইরাবতী কেঁদেছে, কাঁদতে কাঁদতে সে সুখময়কে জিজ্ঞেস করেছে, "তুমি আমায় ছেড়ে চলে যাবে না তো?" ইরাবতীর সমস্ত শরীর যেন উন্মাদের মতন এই প্রশ্নে অংশ গ্রহণ করেছে।

অন্য দেহটি থেকে সবরকম স্বীকৃতি অনেকক্ষণ ধরে আদায় করে অবশেষে ক্লান্ত ইরাবতী ওরফে টুকটুকি কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সুখময়ের সিংগল বিছানাতেই। অন্য সময়ে ক্লান্ত হলেও ইরাবতী নিজের বিছানায় ফিরে যায়।

সুখময় এই মুহূর্তে যেন ভেসে চলেছে। এমন পরিস্থিতি সে যে নিজে চেয়ে নিয়েছে তা বলা যায় না। আবার সে যে চূড়ান্ত মুহূর্তে অনিবার্য স্রোতধারায় গা এলিয়ে দেয়নি একথাও বলা যায় না। যে ইরাবতীকে সে কল্লেজে দূর থেকে দেখেছে সে যে একদিন এইভাবে রাতের গভীরে তার এতো কাছে এইভাবে নিবিড় আলিঙ্গনে স্বেচ্ছা-আবদ্ধ হয়ে এইভাবে পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকবে তা যে স্বপ্নেরও অতীত।

যত গোলমাল মধ্যিখানের ঐ ক'বছর নিয়ে। রমিত সেনগুপ্ত নিজেই তো তাঁর দাম্পত্য সম্পর্কটা তছনছ করে মিষ্টি মেয়ে ইরাবতীকে পিছনে ফেলে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সুখময় স্বপ্ন দেখলো, ডলপুতুল ইরাবতীর ঘুমন্ত দেহটা কাঁধে নিয়ে সে যেন ত্রিশঙ্কুর মতন শূন্যে ঝুলছে। ন যযৌ ন তস্থৌ কথাটা আগে কতবার সুখময় শুনেছে, কিন্তু কখনও তার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। এখন ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝছে সুখময়। স্বামী না বন্ধু, স্ত্রী না বান্ধবী, দেহসর্বস্ব প্রেম, না প্রেমসর্বস্ব দেহ? এসবের উত্তর যে তাঁর সীমিত আয়ত্তের বাইরে তা বুঝছে সুখময়।

সুখময় জানে, ঘরে সামান্য আলো জ্বালা না থাকলে ইরাবতী ঘুমের

মধ্যেও ভয় পায়। এই আলোতেই সিংগল খাটের একদিকে সাবধানে বসে থেকে অতি যত্নে সে ইরাবতী ওরফে টুকটুকির মুখটা দেখছে প্রাণভরে। ইরাবতীকে পেয়েছে সে, অনেকটা আচমকা লটারির মতন পাওয়া। বিশ্বসংসারের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এই ইরাবতী কখনও তার ভাগ্যে জুটতো না।

সুখময়ের মতো সাধারণ মানুষের কিন্তু এমন মহামূল্যবান উপহার আচমকা পেয়েও তো ঠিক পাওয়া হয়নি। ঘুমে অচেতন ইরাবতীর দেহটাকে দেখলে সুখময় আজকাল অদ্ভুত একধরনের আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু আবার আশঙ্কাও হয়। দেহমন পরিতৃপ্ত, ওর শরীরের কোনো রহস্যই অনাবিষ্কৃত নেই, তবু অদ্ভুত এক আশঙ্কা জড়ো হয় সুখময়ের বুকের কাছে। ইরাবতীকে এই পাওয়া কি সত্যিই পাওয়া? ইরাবতীর প্রতি মায়া বাড়ানোর বিপদ কত রকম?

শোনো ইরাবতী, তুমি ও আমি মজবুত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ নই, যদিও একই ঘবে একই শয্যায় এই মুহূর্তে আমরা যুগলে যামিনীযাপন করছি। তোমাকে কিন্তু আমি কারও কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে আনিনি। আমি সাধারণ মানুষের মতো সাধারণ জীবনযাপনের বেশি কখনও ভাবিনি। আমি সন্ন্যাসী নই, কিন্তু অকারণ বিবাহচিন্তাতেও নিজেকে কখনও তেমন ব্যতিব্যস্ত করিনি। আমি শুধু ভেবেছি, দুঃখের দিনে যে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, যে আমার চরম উপকার করেছে, তার প্রয়োজনের সময় আমি তার পাশে অবশ্যই দাঁড়াবো, তাতে যা হয় হোক।

একটু বোধহয় ঘুমের ঘোর এসেছিল। সেই সময় আচমকা একটা লোক যেন চুপি চুপি শয়নমন্দিরে ঢুকে পড়ে খুব কাছে এসে সুখময়কে জিজ্ঞেস করলো, "বৎস সুখময়, এই উদ্ভিন্নযৌবনা রমণীটি কে তোমার?"

উত্তর দিতে গিয়ে একটু দোটানায় পড়ে যাচ্ছে সুখময়। এই নিদ্রিতাসুন্দরী কেউ নয় আমার, একথা বলবার তো উপায় নেই।

কেউ না হলে তো রাতের বেলায় একই ঘরের বিছানায় দু'জনকে একইসঙ্গে খুঁজে পাওয়া গেলো কেমন করে? ইরাবতী কেমন নিশ্চিন্তে একটা

সরু সিংগল বেডের প্রধান অংশ আলো করে শুয়ে আছে। তার একটা হাত যেভাবে তোমার শরীরকে এতোক্ষণ বেষ্টন করেছিল তাতে প্রমাণিত হয় সে তোমাকে বিশ্বাস করে, তোমার ওপর নির্ভর করেই সে এমনভাবে ঘুমোতে পেরেছে।

সুখময় জানে তার নিজস্ব একটা বক্তব্য আছে, ভীষণ জোরালো একটা বক্তব্য সে বুকের কাছে জমা রেখেছে। সোজাপথের যাত্রী সে, এই সুখময় লম্পট নয়, এই ঘরেই তো ইরাবতী সেদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর জীবনসঙ্গিনীর ছবি প্রতিষ্ঠিত করেছে, দিনের আলোয় এবং রাতের অন্ধকারে তাঁদের অগোচরে তো কিছুই ঘটছে না।

সোজাসুজি কথা বলতে যাচ্ছে সুখময়, কিন্তু ঠিকমতন কথা জোগাচ্ছে না মনের প্রকৃত ভাব প্রকাশের জন্যে। আর অনুপ্রবেশকারী লোকটা শয়নমন্দিরের আলো-আঁধারিতে একবার যেন সুখময়-ইরাবতী আব একবার ঠাকুর-শ্রীমাকে দেখছে আর হাসছে। লোকটা বলছে, "সুখময় আর হাসিও না, ওঁদের ছবি দুটো তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরিয়ে ফেলো এবং তোমাদের জীবন থেকেও। বিবাহ করেও তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী, আর বিবাহ না করেই তোমরা রাতের শয্যাসঙ্গী।"

"ইরাবতী কে তোমার?" লোকটা যেন আবার দুষ্টু হেসে জিজ্ঞেস করছে সুখময়কে।

সুখময় স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে, "ইরাবতী কোনো অর্থেই আমার বউ নয়। ইরাবতী কেবল আমার বান্ধবী।"

"ইরাবতীর স্বামী নিরুদ্দেশ। সেই সুযোগ তো তুমি ভালই ব্যবহার করেছ, সুখময়।"

অপরের স্ত্রী, তার সঙ্গে নিষিদ্ধ বন্ধুত্ব! স্রেফ লিভ টুগেদার, তার বেশি কিছু নয়।

সহসা

এই ভাবে, এমন নিষিদ্ধভাবে পরস্পরের দেহকে ঘুষ দিয়ে কতদিন চলতে পারে? সুখময় এবার ব্যাপারটাকে মিটিয়ে নিতে চায়, গুটিয়ে নিতে চায়। এই লিভ টুগেদারের গ্লানি কাটিয়ে উঠতে সে সত্যিই ব্যাকুল।

আসলে ওদের ব্যাপারটা বোধ হয় লিভ টুগেদার থেকেও নিকৃষ্ট। লিভ টুগেদারে তো দু'জন স্বাধীন মানবমানবীর একত্র বসবাসের সদিচ্ছা এবং স্বপ্ন প্রতিফলিত হয়।

কিন্তু ইরাবতীর কী সেই স্বপ্ন দেখার স্বাধীনতা আছে? রমিত সেনগুপ্ত উপস্থিত না থেকেও সারাক্ষণ উপস্থিত রয়েছেন এই মিলনমন্দিরে অশরীরে।

ইরাবতী নিয়মিত মিসেস চারুলতা চট্টরাজের অফিসে যায়, মন দিয়ে কাজ করে, এবং বাড়ি ফিরে আসে। মাঝে মাঝে ইরাবতী খোঁজ খবর করে হল্ অ্যান্ড ল্যাড্লোর অফিসে পুরনো তহবিল তছরূপ মামলাটা নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নিলো।

ম্যানেজিং ডিরেকটর মিস্টার সদাশিব কাঞ্জিলাল এখনও অপেক্ষা করে আছেন। ভুলে যাবার, ক্ষমা করবার, আইনের বেড়াজাল তুলে দেবার কোনো প্রশ্নই নাকি ওঠে না। ওই রিটায়ার্ড ডিসি-ডিডি মিস্টার ব্যতিক্রম দস্তিদার, তিনি এখনও বহাল তবিয়তে রয়েছেন, নিয়মিত কোম্পানি থেকে টাকা নিচ্ছেন, রমিত সেনগুপ্ত পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাক, তাকে একদিন হাতে হাতকড়া এবং কোমরে দড়ি পরিয়ে নিয়ে আসবেন এই কলকাতায়।

ইরাবতীর প্রশ্ন, ভাল কথা, আইন যা অনুমতি দেয় অবশ্যই তা করবেন। কিন্তু কতদিন ধরে এই দৌড় চলবে? নড়েচড়ে বসুন আপনারা, যা করার তা তাড়াতাড়ি করুন।

হল্ অ্যান্ড লাড্লোর কর্তারা অবশ্য জানেন, তাড়াতাড়ি করবো বললেই এদেশে সব কিছু তাড়াতাড়ি করা যায় না। দেরি তো যা করাবার তা রমিত

সেনগুপ্তই করাচ্ছেন।

রমিত সেনগুপ্তর শুভানুধ্যায়ীরা যদি ভেবে থাকেন বিলম্ব একদিন সমস্ত রোগের ওপর প্রলেপ হয়ে সব জ্বালাযন্ত্রণার অবসান ঘটাবে তা হলে ভুল করেছেন।

রমিত সেনগুপ্তকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে মিস্টার সদাশিব কাঞ্জিলাল অবশ্যই এই কোম্পানির কর্ণধার হননি। বোর্ডকে তিনি বলেছেন, যতদিন ঐ লোকটা জেলে না যাচ্ছে, বাকি জীবন জেলের ঘানি টানবার আদালতের অর্ডার হচ্ছে, ততক্ষণ আমার ছুটি নেই। এই ষড়যন্ত্রের সব কথা একদিন প্রকাশিত হবে।

অতই যদি রাগ, অতই যদি সুবিচারের জন্যে ব্যস্ততা তা হলে ওই নাগিনীকে তোমরা এখনই শাস্তি দিচ্ছ না কেন? সহসা রায়চৌধুরী কেমন করে মনের সুখে এই শহরে নিজের দাপটে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

সহসাকে নিযে একসময় প্রাক্তন ডি-ডি মিস্টার ব্যতিক্রম দস্তিদার অনেক সময় অযথা অপব্যয় করেছেন। অনেক স্টেটমেন্ট তিনি লিপিবদ্ধ করিয়েছেন সহসাকে দিয়ে। কিন্তু তাকে এখনই আদালতে তুলে নাটের গুরুকে ছেড়ে দিতে রাজি নন।

আসলে মিস্টার দস্তিদারের ধারণা সহসার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি অভিযোগ এনে তা আদালতে প্রমাণ করা বেশ শক্ত।

সহসা নিজে কোনো চেকের সই জাল করেনি। চেকবুকগুলো রমিত সেনগুপ্ত তার কাছে গচ্ছিত রাখতেন না। বড় জোর মাঝে মাঝে চেকগুলো জমা দেবার জন্যে সেনগুপ্তর অ্যামবাসাডর গাড়িতে চড়ে সহসা কুইনস ব্যাংকের কাউন্টারে গিয়েছে। তার মধ্যে তো কোনো অপরাধ নেই। অপরাধ

একটাই। রমিত সেনগুপ্তর কাছ থেকে সহসা কিছু নগদ টাকা সাহায্য নিয়েছে। এই টাকাও কাগজপত্তর সই করে নেওয়া নয়। সহসা তবু ঋণ অস্বীকার করছে না, নিজস্ব ছোট ফ্ল্যাটে উঠে যাওয়ার সময় টাকাটা কাজে লেগেছে তার। রমিত সেনগুপ্তর কাছে তার জন্যে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই সহসার।

কিন্তু সহসা কেন আচমকা ছুটলো প্রবাসে? রমিত সেনগুপ্তর সন্ধানে? সে কি কোনো জরুরি খবর তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল?

কারও পরিচিত কোনো মহিলা যদি কোনো পুরুষের আকর্ষণে প্রবাসের হোটেলে হাজির হয়, তাহলে অফিস কী করতে পারে? হোটেলের কর্তৃপক্ষই বা কী করতে পারেন যদি দু'জন বয়োপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা বিবাহিত না হয়েও হোটেলের একই ঘরে রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে? ডবল অকুপেন্সির ভাড়া আদায় করা ছাড়া আর কোনো কর্তব্য তো থাকে না হোটেলের। যারা ডবল বেডে রাত্রিযাপন করছে তাদের দু'জনেব সম্পর্ক কি, তাদের সঙ্গে ম্যারেজ সার্টিফিকেট আছে কিনা এসব তথ্য তো কেউ কোথাও জানতে চায় না।

আগে ডবল বেডরুমে স্পাউস-এর নাম জানানোর রেওয়াজ ছিল। ইংরিজি 'স্পাউস' কথাটার পিকুলিয়র অর্থ—পতির ক্ষেত্রে পত্নী। পত্নীর ক্ষেত্রে পতি।

বাংলায় এধরনের ডবল বেনিফিট শব্দ বিশেষ নেই। কিন্তু স্পাউস কথাটা এখন হোটেলে, মিটিং-এ, কনফারেন্সে, কনভেনশনে প্রায় অচল হয়েছে। এখনকার চালু শব্দটি হলো, 'অ্যাকমপ্যানিয়িং' পার্সন—অর্থাৎ সঙ্গে যিনি রয়েছেন! এর সরল বাংলা করা খুব শক্ত।

'সঙ্গের উনি'! বড়জোর ভদ্রতা করে 'সহযাত্রী'। যাত্রী শব্দটা পুংলিঙ্গ না স্ত্রীলিঙ্গ সে নিয়ে বাংলাতেও তেমন মাথাব্যথা নেই আজকাল। কে যেন সেদিন লিখেছেন লিঙ্গের লিমিটেশন থেকে শব্দকে আমরা ক্রমশই মুক্তি দিচ্ছি—ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল ইংরিজিতে, এখন বাংলাতেও এই স্বাধীনতা বেশ দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

ইরাবতী অতশত তত্ত্বকথা বোঝে না। তোমরা কতশত বিষয়ে মাথা

ঘামাচ্ছ, আর সেক্রেটারি সহসা রায়চৌধুরী কেন রমিত সেনগুপ্তর সঙ্গে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে একত্র অজ্ঞাতবাস করলো বিভিন্ন পান্থশালায় তা জিজ্ঞেস করবে না? এইভাবে কয়েক সপ্তাহ ধরে ওরা দু'জনে কোথায় কীভাবে কাটালো তাও জানার প্রয়োজন মনে করলে না? কয়েকটা চেক কোথায় জমা না পড়ে কোথায় জমা হলো তা নিয়েই তোমাদের যত মাথাব্যথা? তার বাইরে কেন তোমাদের কোনো চিন্তা নেই? দুষ্টু সহসাকে সবাই ভেবেছিল তোমরা হাজতে পাঠাবে। কিন্তু কিছুই করলে না কেন? তোমরা একসময় নিঃশব্দে তার সাময়িক কর্মচ্যুতি অথবা সাসপেনশন তুলে নিলে। আইনের চোখে সহসা যেন চাকরিতে পুনর্বহাল হলো। তারপর সে নিজের ইচ্ছায় যেন ইস্তফা দিল। একালের অফিসে যে কতরকমের অভিনয় চলে।

আবার চাকরি পাওয়া? এইটাই সুবিধে যারা ভাল সেক্রেটারিয়াল কাজ জানে। সহসা অবশ্য প্রথমে কলকাতার বাইরে কোথাও চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল। তারপর আবার সে কলকাতায় ফিরে এসেছিল। কাজের লোককে লুফে নেবার জন্যে কত প্রতিষ্ঠান সারাক্ষণ প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। সহসা বোধ হয় আবার কলকাতা থেকে সম্প্রতি অদৃশ্য হয়েছে।

সময় কারও জন্যে অপেক্ষা না করে নিজের খেয়ালে এগিয়ে চলেছে। খোদ হল অ্যান্ড লাডলো অফিসের লোকরাই রমিত সেনগুপ্তর ব্যাপারটা ভুলতে বসেছে। রমিত সেনগুপ্তর চেক সাফাই নিয়ে কী কাণ্ড ঘটেছিল সে নিয়ে এখন অফিসে যেন কারো তেমন মাথাব্যথা নেই।

রমিত সেনগুপ্ত কি রন্তিদেব হয়েছিলেন বলেই বিপদ ডেকে এনেছিলেন? অথবা সহসা রায়চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর কোনো গোপন প্রণয়ের অ্যাডভেঞ্চার ছিল? বিষয়টা অবশ্য ভোলার উপায় নেই কয়েকজন মানুষের।

এই দলের প্রথমেই রয়েছেন রিটায়ার্ড ডিসি-ডিডি মিস্টার ব্যতিক্রম দস্তিদার। তিনি এই কেসটার নিষ্পত্তির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে অবশিষ্ট জীবনটা হয়তো হল অ্যান্ড লাডলোর মাসিক রিটেনার নিয়েই কাটিয়ে

দেবেন।

এদিকে পাম অ্যাভিনিউতে ইরাবতী কিন্তু এখনও বুঝতে পারছে না, শেষপর্যন্ত কী হবে?

সুখময় এই অচল অবস্থার কোনো স্বাভাবিক পরিণতি দেখতে পাচ্ছে না। তার এক বন্ধু আছে ইস্কুলের। পল্টু মিটার এখন খ্যাতিমান উকিল হয়েছে।

পল্টু মিটারের সঙ্গে দেখা করেছে সুখময়। বন্ধু মিটারের ধারণা সুখময় এখন গল্প লেখায় বিশেষ মন দিয়েছে।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখা আর কতদিন চলবে? ওঁর সম্বন্ধে সব ভাল কথা একবার নয়, শত শতবার লেখা হয়ে গিয়েছে, সুখময়। এখন বরং গল্প উপন্যাসের দিকে একটু স্পেশাল নজর দাও। তোমার চরিত্রদের কোনো লিগ্যাল অ্যাডভাইজ দরকার হলে আমরা তো আছি।"

"ধরো আমার একটা প্রধান চরিত্র অফিসের বেশ কিছু টাকা তছরূপ করে উধাও হয়েছে। কতদিন পরে ফিরে এলে অভিযোগ তামাদি হয়ে যাবে ভাই পল্টু?" জিজ্ঞেস করে সুখময়।

একটু ভেবে পল্টু উত্তর দিলেন, "স্যরি, সুখময়। অপরপক্ষে যদি কোনো ঘাগি অনুসন্ধানী থাকেন তা হলে সময়ের ব্যবধান তোমাব ক্যারাকটারকে কোনো রিলিফ দিতে পারবে না। যখনই সে অজ্ঞাতবাস থেকে এই শহরে ফিরবে তখনই আইনের সাঁড়াসি অভিযান অনায়াসে শুরু হয়ে যেতে পারে।"

"তা হলে, পলাতক হয়ে এবং অজ্ঞাতবাস করে রিলিফ পাবার কোনো উপায় নেই?"

"আছে সুখময়। মনে করো, অপকর্মের প্রধান প্রধান সাক্ষীগুলো সময়ের স্রোতে ভেসে গেলেন। তখন সাক্ষীর অভাবে মামলাটা দুর্বল হয়ে যাবে।

সাক্ষ্যপ্রমাণ যাচাই না করে আদালত তো কিছু করবেন না। এই যে এ দেশে বিচারে দেরি করিয়ে দেওয়া হয়, সাক্ষীসাবুদ আস্তে আস্তে খুন হয় বা তারা উল্টো কথা বলতে শুরু করে, তার কারণটা বুঝতে পারছো? এই তো দিল্লির একটা রাজনৈতিক এনকোয়ারিতে দেখলাম সাত জন সাক্ষী এখনও পর্যন্ত রহস্যময়ভাবে খুন হয়েছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এইসব মৃত্যু ঘটেছে—কেউ মরেছেন লরির ধাক্কায়, কেউ গাড়ি চাপা পড়ে, কেউ আততায়ীর গুলিতে। ব্যাপারটা ঘটে যাচ্ছে ঠিক অঙ্কের মতন।"

"আর আমরা মহাত্মা গান্ধীর ব্রোঞ্জ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর পদপ্রান্তে সময়ে অসময়ে ফুল চড়িয়ে যাচ্ছি!"

পল্টু মিত্র ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ক্রাইম নভেল লিখছো, সুখময়? তাহলে শুধু শুধু একটা নিরামিষ অ্যাকাউন্টিং অপরাধে হিরোকে জড়াচ্ছ কেন সুখময়? থ্রিলিং কিছু সিচুয়েশন তৈরি করে নাও, যেমন ধরো বোমা মেরে কোনো অফিস উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে অনুসন্ধানিদের সমস্ত কাগজপত্তর নষ্ট হয়ে যায়।"

সুখময়ের চিন্তা অবশ্য আলাদা। সে বললো "আমি একটা সোজা সিম্পল ঘটনা চেয়েছিলাম, পল্টু। একটা সহজ জটিলতাহীন প্লট। একটা মানুষ ভাগ্যসন্ধানে কলকাতায় এসে ভীষণ আর্থিক বিপদে পড়েছে। একজন দিলদরিয়া মানুষ তাকে অযাচিতভাবে সাহায্য করলেন, যার একটা কারণ বিপদগ্রস্ত মানুষটি কলেজে তাঁর স্ত্রীর সহপাঠী ছিল। তারপর গল্পটার আমি একটা ভেরি হ্যাপি এন্ডিং চেয়েছিলাম, পল্টু।"

অ্যাডভোকেট পল্টু মিটার হাসলেন। তিনি বললেন, "এরপরে মিষ্টি .পরিণতি চাইলে তো উকিলের কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না, সুখময়। কায়দা করে দেখিয়ে দাও, ওই ভদ্রলোকের একটা মিষ্টি ছোট বোন আছে? তার সঙ্গেই নায়কের বিয়ে ঠিক হয়ে গেলো, সম্পর্কের বনিয়াদটা কংক্রিটের মতন শক্ত হয়ে যাবে—কোথাও কোনো বেমক্কা ঝাঁকুনি, জার্ক বা ছন্দপতন থাকবে না। আগেকার গল্প লেখকদের এসব ব্যাপারে পাকা হাত ছিল। শরৎচন্দ্র, শরদিন্দু বা তারাশঙ্কর ঘটনার শুরু থেকেই অনূঢ়া একটি

বোনকে প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে দিতেন যে যথাসময়ে হৃদয়বান পাঠকদের ইচ্ছাপূরণ হতো।"

"পাঠক নয় পল্টু, হৃদয়বতী পাঠিকারা এই রকম চাইতেন। নিয়মের মধ্যে থেকেই একটু নিয়মবহির্ভূত অভিজ্ঞতা তাঁদের ভাল লাগতো। বেনিয়মের মধ্যেও আমাদের দেশের মেয়েরা নিয়মকে সারাক্ষণ হাতড়ে বেড়ায়, পল্টু।"

"উঃ সুখময়, তোমার গল্পের চরিত্রদের সমস্যা তো দেখছি আমার রিয়াল লাইফ মক্কেলদের মতনই জটিল। এখন বুঝছি, আজকাল ছোটগল্পে কেন ছোট ছোট ঘটনার মিষ্টি মধুর মিলনাত্মক পরিণতি হচ্ছে না। পাঠিকারা নিশ্চয় অনেক ম্যাচিওর এবং অনেক পরিণত হয়ে উঠেছেন।'

সুখময় কিন্তু এখনও তার প্রশ্নগুলোর উত্তর পায়নি। সে বললো, "পল্টু, ধরে নাও ভদ্রলোকের বিবাহযোগ্যা কোনো বোন নেই। তা হলে কি বাংলায় মিলনাত্মক লেখা বন্ধ হয়ে যাবে?"

পল্টু উত্তর দিলেন, "অবশ্যই নয়। জীবন নিয়েই তো গল্প—আর এই জীবন থেকে সারাক্ষণ কত রকমের শিকড় গজাচ্ছে। বড় সাইজের আদা দেখলে খানিকটা বোঝা যায়। একটা ঘটনা থেকে যেন অনেকগুলো ঘটনার উৎপত্তি।"

সুখময় বললো, "পল্টু, মনে করো, কোনো কারণে নিখোঁজ এই মানুষটি আমাদের গল্পের একটা ইম্পর্টান্ট চরিত্র। তার স্ত্রীকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আশ্রয় দিতে গিয়ে নায়ক একদিন আবিষ্কার করলো, যাকে সে আশ্রয় দিয়েছে সেই মহিলা স্বামীর ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে। এবং তারপর পরিপার্শ্বের ষড়যন্ত্রে যা হবার তা হয়েছে, নায়কের সঙ্গে একই ঘরে বসবাস শুরু হয়েছে। কিন্তু এর পিছনে তো আইনের সমর্থন নেই?"

পল্টুর ব্যাখ্যা : "আইনের দুটো দিক আছে সুখময়। এক আইন বলে, কোনো রমণীকে বিবাহিতা এবং পরস্ত্রী জেনেও যে পুরুষ অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে এগিয়ে যায় আদালতে তার কঠিন শাস্তি হতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তির একটা সংসার তছনছ করে দেওয়ার জন্যে। কোনো কোনো স্বামী অন্য

পুরুষের বিরুদ্ধে এই ধরনের ফৌজদারি মামলা করেছেন। আইন এ ক্ষেত্রে মেয়েদের দিকেই ঝুঁকে রয়েছে। পেনাল কোড অনুযায়ী কোনো স্ত্রী এই মামলা আনতে পারবেন না কোনো মহিলার বিরুদ্ধে তাঁর সংসার ভাঙার অভিযোগে। তাই বিবাহিত মহিলার সঙ্গে প্রণয়ে একটা ক্রিমিন্যাল রিস্ক থেকেই যায়।"

সুখময় বললো, "তুমি বলছো, পরস্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করছো এটা প্রমাণ হলে জেলে যেতে হতে পারে।"

"পুলিশ এই নতুন নায়কের পিছনে ছুটবে না। একটা অভিযোগ চাই, যে পুরুষের সংসার ভাঙছে তার কাছে থেকে।"

"পল্টু, ধরো তাঁকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। এই খুঁজে না পাওয়া এবং অজ্ঞাতবাস পরে অবৈধ প্রণয় থেকেই যত সমস্যার উৎপত্তি। অভিমান থেকে, প্রতিশোধের আকাঙক্ষা থেকে এই রকম প্রণয় সহসা ঘটে যায় অনেক গল্পে।"

পল্টু জানতে চাইলেন, "তোমার প্রধান চরিত্রটা এখন তোমার কাছ থেকে কী কী চাইছেন?"

"যে মানুষের কোনো খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না আইনের চোখে সে মানুষ কতদিন বেঁচে থাকেন?" সুখময় প্রশ্ন করলো।

পল্টু বললেন, "ভাল প্রশ্ন করেছো। আমার মক্কেল এক সরকারি কোম্পানিব কর্মচারী অনেকদিন নিখোঁজ। সাত বছর আমাদের অপেক্ষা করতে হলো, তারপর কাগজে নোটিশ দিয়ে চাকরির অবসান ঘটলো।"

"স্ত্রীকে নিখোঁজ স্বামীর জন্যে এদেশে কতদিন অপেক্ষা করতে হয়, পল্টু?"

"বেশ ড্রামাটিক সিচুয়েশন বুঝে এগচ্ছো তুমি, সুখময়। তোমাকে আমি এ এন সাহার ম্যারেজ অ্যান্ড ডাইভোর্সের নতুন সংস্করণটা দিয়ে দিচ্ছি, অসাধারণ বই, বিবাহবিষয়ক সব প্রশ্নের উত্তর দু'খানা মলাটের মধ্যে তুমি পেয়ে যাবে। তার সঙ্গে ফুটনোটে পাবে হাজার হাজার গল্প—গত সেঞ্চুরির শেষ দিকে সহবাস সম্মতি সংক্রান্ত ক্রিমিনাল মামলার বিবরণ পর্যন্ত। বিয়ে

করলেই যে সহবাস করা যায় না, তার জন্যে যে স্ত্রীর সম্মতি লাগে তা বুঝতেই সুসভ্য ইন্ডিয়ানদের পুরো একটা শতাব্দী লেগে গিয়েছে, মিস্টার সাহার বই পড়ে দেখো। এর জন্যে বিলিতি পার্লামেন্টে আইন করাতে হয়েছে। আর এই আন্দোলনের সময় রামকৃষ্ণদেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কত বছরের মেয়ের কবে বিবাহ হয়েছিল সব লেখা হয়েছিল।”

“তার মানে সাত বছর স্বামী বেপাত্তা হলে বা সন্ন্যাসী হলে স্ত্রী আবার কাউকে বিয়ে করতে পারেন?”

পল্টু জানালেন, “অনেক ফাঁকফোকর আছে সুখময়। তুমি সাহার বইটার কয়েকটা চ্যাপ্টার, বিশেষ করে চ্যাপ্টার ফোর্টিনটা মন দিয়ে পড়ে নিও। যেমন ভিরুলেন্ট লেপ্রসি হলে বিয়ে ভেঙে যেতে পারে। কিংবা গুরুতর মানসিক ব্যাধি হলে। তারপর ধরো সন্ন্যাস। তোমার নায়কের বান্ধবীর স্বামীকে নাগা সন্ন্যাসী করে দিলেও দায়িত্ব চুকে যায়। হিন্দু শাস্ত্রে সন্ন্যাস মানেই মৃত্যু এবং পুনর্জীবন। নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করে পুরনো জীবনের সব পাট চুকিয়ে সন্ন্যাসীকে পুনর্জন্মে প্রবেশ করতে হয়। তবে অনেক সাধ্বী স্ত্রী তাঁর স্বামী সন্ন্যাসী হয়েছে জেনেও সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে তাঁর মঙ্গল কামনা করতে করতে হাসিমুখে জীবনটা কাটিয়ে দেন।”

পল্টু মিত্র ঝটপট সাহার বইয়ের দুশো চুয়াত্তর পাতা খুলে ফেললেন। “সুখময়, এই নিরুদ্দেশ এবং নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা বেশ জটিল। সাতটা বছর ধৈর্য দেখাবার নির্দেশ রয়েছে আইনে। রামরতি কুয়ের ভার্সাস দ্বারকাপ্রসাদের কেসে সুপ্রিম কোর্টের রায়টা মন দিয়ে পড়ে দেখতে পারো। যদি কোনো লোক সম্বন্ধে সাত বছর কোনো খোঁজখবর পাওয়া না গিয়ে থাকে তা হলে আইন ধরে নেবে লোকটি মৃত। এরপর কেউ যে বেঁচে রয়েছে তা প্রমাণ করার দায়িত্ব অন্য পক্ষের ঘাড়ে চলে গেলো। যদিও পুরনো হিন্দু আইনে দ্বাদশ বর্ষ অপেক্ষার নির্দেশ ছিল বিবাহিতদের ক্ষেত্রে। হারিয়ে যাওয়া কারুর জন্যে তোমার গল্পের নায়িকাদের এখন পুরো বার বছর হা-পিত্যেশ করে বসে থাকবার কোনো প্রয়োজন নেই। সাতটা বছরই বেশ লম্বা সময়। সাত বছর নিষ্ফল অপেক্ষা করে কেউ আবার বিয়ে করলে আইনের কিছু বলবার নেই।”

একটু থামলেন পল্টু। "কী অতো ভাবছো, সুখময়? তোমার ওই নায়ক তো ঠিক বিরহসাগরে ডুবে নেই? যাকে সে কাছে চায় সে তো কাছেই রয়েছে, শুধু মনের মধ্যে একটু খচখচে ভাব, একটু অন্যায়বোধ। এই তো?"

"তুমি বলছো, সাতটা বছর বিবাহ না করে, স্রেফ লিভ টুগেদার।" সুখময় জিজ্ঞেস করলো।

"একত্র বসবাস, এই পর্যন্ত। তোমাকে তো বলেছি, লিভ টুগেদারের কোনো আইনী স্বীকৃতি নেই এ দেশে। একত্র বসবাসের যখন স্বীকৃতি নেই, তখন সন্তানদেরও স্বীকৃতি থাকবে না, সুখময়।"

এরপরের মন্তব্যগুলিও পড়ে দেখতে পরামর্শ দিচ্ছেন পল্টু মিত্র অ্যাডভোকেট। "বিয়েটা কি স্রেফ হিন্দু মতে হয়েছিল, না রেজিস্ট্রি বিবাহ ছিল?" তিনি জানতে চাইছেন বন্ধুর কাছ থেকে।

"উকিল যে রকম চাইবে গল্পে সেই রকম করে দেবে? না ইতিমধ্যেই যা কল্পনায় প্রবেশ করেছে তার পরিবর্তন হবে না? শোনো সুখময়, স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী যদি কোনো পক্ষের সাত বছর জেল হয়, তা হলেও বিয়ে ভেঙে যেতে পারে। তবে সেখানেও তিন বছরের মিনিমাম অপেক্ষা রয়েছে। তারপর বিচ্ছেদের মামলা, তারপর তো নতুন দাম্পত্যজীবনের গোড়াপত্তন।"

তবে কিছু কিছু অদ্ভুত ব্যাপারও যে এদেশে ঘটে যায় তা পল্টু মিত্রের কাছেই জানা গেলো। "এক ভদ্রলোক নিজের দেশের প্রতিরক্ষার গোপন কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়লেন পাকিস্তানে। সেখানে শেষ পর্যন্ত কী হলো তা জানবার কোনো উপায় ছিল না। পঁচিশ বছর পরে হঠাৎ আশ্চর্য কাণ্ড, পাকিস্তানীরা এই লোকটিকে জেল থেকে ছেড়ে তার দেশে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু ফিরে এসে মানুষটি দেখলেন, অনেকদিন আগে তার স্ত্রী আবার বিবাহ করে অন্যত্র ঘরসংসার করছেন। ছেলেমেয়ে স্বামী নিয়ে তার সুখের সংসার, সেই সময় স্বশরীরে প্রথম স্বামীর প্রত্যাবর্তন! স্ত্রী তাকে চিনতেই চাইছেন না, ভরসা কেবল ভদ্রলোকের কন্যা যাকে পাঁচ বছরের রেখে ভদ্রলোক গোপন কর্তব্য পালনে চলে গিয়েছিলেন।"

পল্টু অবশ্য নিজেই বললেন, "এটা একটা অদ্ভুত ঘটনা। এমন ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে ভেবে পৃথিবীর সব স্ত্রী অথবা সব স্বামীকে সারাজীবন বেঁধে রাখার মানে হয় না সুখময়।"

সাহার বইটা হাতে নিয়েছে সুখময়। পল্টু বলেছেন, "ভেবে দেখো, কী করবে তোমার নায়ক-নায়িকা। তারা ইচ্ছে করলে সমাজকে তোয়াক্কা না করে লিভ টুগেদার চালাতে পারে, যদি কিছু রিস্ক থাকে তা কেবল নায়কের, স্বামী যদি হঠাৎ ফিরে আসেন।"

পল্টু মিত্র বললেন, "বইটা উল্টোলে গল্প লেখকদের প্লটের অভাব হবে না, সুখময়। এই ব্যাভিচার অর্থাৎ অ্যাডালটরি নিয়ে আমাদের রক্ষণশীল সমাজ গত একশ বছর ধরে কতভাবে কত মাথা ঘামিয়েছে এবং কত পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছে তার আন্দাজ পাওয়া যাবে।"

অ্যাডালটারেটর শব্দটা বইতে দেখতে পাচ্ছে সুখময়। পল্টু বললেন, "এর বাংলা একটু কঠিন। অগম্যাগামী পুরুষ বলতে পারো। এই গুরুতর অভিযোগ এড়াবার জন্যে উকিলরা আদালতে কত রকম যুক্তি দেন। কয়েক বছর আগে অভিযোগের উত্তরে এক স্বামী বললেন, তাঁর প্রথমা স্ত্রীই সন্তানবতী হতে না পারায় স্বামীকে উৎসাহ দিয়েছিলেন আর একটি পাত্রীর সন্ধান করতে। কোর্ট অবশ্য তা বিশ্বাস করলেন না। বিশ্বাস করলে মুশকিল হতো, কারণ নিজেই কোনো দোষ করে সেই সুযোগে আইনের কোনো সুবিধা ভোগ করার পথ উন্মুক্ত করাটা এ দেশের আইন আজও পছন্দ করে না।"

ভার্যা কথাটাও আলোচনার সময় উঠলো। পল্টু মিত্র বললেন, "ইংরিজিতে একটিমাত্র শব্দ—ওয়াইফ। আমাদের প্রাচীন ভারতে নানা ধরনের শব্দ ছিল, প্রতিটির আলাদা তাৎপর্য! সাহা মশায়ের বইতে নেই, কিন্তু আনন্দমূর্তি প্রভাতরঞ্জন সরকার মশায় তাঁর একটা বইতে দেখিয়েছেন, পত্নী, জায়া, ভার্যা এবং কলত্র এক নয়। যে বিবাহে রমণী স্বামীর সঙ্গে সমান ধর্মীয়, সামাজিক অধিকার এবং ভাবী সন্তানদের স্বীকৃতি লাভ করে সেখানে তিনি স্ত্রী। জায়া কথাটার কিন্তু অত জোর নেই— এখানে স্ত্রীর ধর্মীয় অধিকারও নেই, কেবল রয়েছে সামাজিক স্বীকৃতি। আর ওই যে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা কথাটা শোনা

যায় তার তাৎপর্য অন্য। এই মিলনে ভার্যার ধর্মীয় ও সামাজিক স্বীকৃতি নেই, কেবল সন্তানের স্বীকৃতি আছে। তারা অবৈধ নয়। আর 'কলত্র' সে তো বেশ গোলমেলে ব্যাপার—ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার তো দূরে থাক, সন্তানেরও স্বীকৃতি নেই। শোনা যায়, এই অঞ্চলের সামাজিক পরিস্থিতিতে সেকালে সন্তানরা মাতার গোত্র ব্যবহার করতেন।"

সুখময় তখনও ভাবছে, কন্যা-জায়া-জননী কথাটা সে ইতিপূর্বে অত সাবধান না হয়েই ব্যবহার করেছে। আর ওই যে কিছুদিন আগেও কায়স্থ মহিলারা ঘোষজায়া বা বসুজায়া লিখতেন, এটাও তো অস্বস্তিকর।

পল্টু মিত্র বললেন, "ওটার উদ্দেশ্য বোধহয় ছিল অন্য রকম। মিসেস ঘোষ না লিখে মহিলারা লিখতেন ঘোষজায়া। আবার মিস অথবা কুমারীদেবও একটা স্টাইল ছিল, তাঁরা লিখতেন 'বসুদুহিতা'। যিনি 'বসুদুহিতা' তিনি বিয়েব পর হয়তো হলেন 'ঘোষজায়া'। প্রভাতরঞ্জন সরকার মশাযের লেখায় খোঁজ করো। হয়তো সামাজিক ইতিহাসটা পেয়ে যাবে।"

পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে এ এন সাহার বিরাট আইন বই নিয়ে যাওয়ার সুবিধেও আছে, অসুবিধাও আছে।

হাতের গোড়ায় বই থাকলে ইরাবতী কোনো সময়ে তা পড়ে ফেলবে এটাই স্বাভাবিক। ফলে সব কিছু মুখোমুখি বিশ্লেষণ করাব প্রয়োজন থাকবে না, অস্বস্তিকর সন্দেহগুলো এমনিতেই কেটে যাবে। অসুবিধা, কতকগুলো অপ্রিয় সত্য উলঙ্গ হয়ে বেচারা ইরাবতীর চোখের সামনে নৃত্য শুরু করবে যার কোনো আশু সমধান নেই।

ইরাবতী সেদিন সাহার নতুন বইটা পাশে নিয়েই ড্রয়িং রুমে চুপচাপ বসে

আছে। দুটো মানুষ কারও কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা না করেই একসঙ্গে বসবাস করবে, অথচ তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবার জন্যে শাস্ত্রকারদের, আইনপ্রণেতাদের, সরকারের, পুলিশের ন্যায়াধীশদের কত রকম মাথাব্যথা! লাইসেন্সরাজ শুধু শিল্পবাণিজ্য নয়, মানুষের দাম্পত্য জীবনকেও বেড়ি পরাতে চাইছে।

বিয়ে নামক লাইসেন্স তোমার এবং তোমার সঙ্গিনীর সমস্ত ইচ্ছাকে কর্তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। লাইসেন্সের জোরে কেউ বান্ধবী না হলেও স্ত্রী ; আবার প্রকৃত বান্ধবী হয়েও কেউ কেউ রক্ষিতা।

মানব-মানবীর সম্পর্কের বৈষয়িক হিসেবটা দেখভালের জন্যেই যেন পৃথিবীর যত বিবাহমন্ত্র। যুগলজীবনের অন্য অ্যাডভেঞ্চারগুলো নিয়ে বিবাহবিদদের কোনো মাথাব্যথা নেই। এই যারা বিদেশে কারুর কথায় কান না দিয়ে, হিসেবওয়ালাদের তুড়ি মেরে স্রেফ একত্র বসবাস বা লিভ টুগেদার করছে তাদের ব্যাভিচারী আখ্যা দেওয়াটা বোধহয় যুক্তিযুক্ত নয়। মানুষ অনেক সাধনা করে বহু যুগ পরে এই মুক্তির পথ বার করেছে— বিচ্ছেদভয় থেকেই তো যত জ্বালা যন্ত্রণা। কিন্তু যে সম্পর্কে বিবাহবন্ধনই নেই সেখানে বিচ্ছেদের প্রশ্ন উঠবে না। মুক্তিটা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাধীন এবং তাৎক্ষণিক হয়ে উঠলে বন্ধনহীন বন্ধনটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে।

পাম অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে ইরাবতীর একটু দূরেই সুখময় উদাসভাবে বসে আছে। ইরাবতী ওর দিকে তাকিয়ে দেখছে। কলেজে ছাত্রীজীবনে মানুষটাকে সে কত বার দেখেছে, কিন্তু সুখময়কে কখনও এতো সুন্দর মনে হয়নি।

ওর চোখে মোটা শেল ফ্রেমের চশমা। ঈষৎ ব্রাউন রঙের লম্বা লম্বা চুলে সুখময়কে ভীষণ ভাল লাগছে।

সুখময় ভাবলো, ইরাবতী ওর চুলের অযত্ন লক্ষ্য করছে। মাথায় আঙুল চালিয়ে দিয়ে সুখময়ের মনে পড়লো, ইরাবতী একবার বলেছিল, মাঝে মাঝে সেলুনে না গেলে ছেলেদের মাথায় আগাছা জন্মে যায়। তার ঘাড়ের কাছে বন গজিয়েছে মনে হয়।

সুখময় দোষ স্বীকার করেই বলেছিল, "যাবো যাবো মনে করেও শেষপর্যন্ত সেলুনে যাওয়া হয় না। আর ছুটির দিনে দুনিয়ার যত লোকে যেন বউয়ের ভয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেলুনে চুল কাটাবার জন্যে।"

সুখময়ের মনে পড়লো, যখন স্রেফ অতিথি হিসেবে ইরাবতী মাসের পর মাস এই ফ্ল্যাটের বেডরুমটা একচেটিয়া অধিকার করে রেখেছিল তখন সুখময়ের সাজসজ্জা এবং চুলছাঁটা সম্পর্কে সে একটা কথাও বলেনি।

আজ ইরাবতী কিন্তু অন্য সুর ধরলো। সে বললো। "সেলুনে ইচ্ছে হলে যেও, কিন্তু চুল খুব ছোট কোরো না, একটু বড় চুল না থাকলে কাউকে কবি বা কথাসাহিত্যিক বলে মনে হয় না।"

সুখময় উত্তর দিল না। ইরাবতী নিশ্চয় ভাবছে, কবি বা লেখকদের পক্ষেই সামাজিক বিদ্রোহী হয়ে ওঠা সহজ। একজন বাঙালি লেখক তো কিছুদিন আগেও গর্ব করে বলতেন, বিয়ের অনেক আগেই তিনি ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে সংসারযাত্রা শুরু করেছিলেন। শুধু কাজের সুবিধের জন্যে পরবর্তীকালে সংসারটা রেগুলারাইজ করে নেওয়া হয়েছে। বিয়েটা এক টুকরো কাগজ ছাড়া আর কিছু নয়। একত্র বসবাসের মূল নাটকটাই মিইয়ে যায় বিয়েটা হয়ে গেলে।

ইরাবতী এখনও তাকাচ্ছে সুখময়ের দিকে। এবার কি মোটা ফ্রেমের চশমা সম্বন্ধে কিছু বলবে ইরাবতী? সুখময়কে যতখানি সম্ভব সংস্কার করে নিজের মনের মতন মর্ডানাইজ করে নিতে চায় ইরাবতী। সুখময়কে একটা খুব সরু মেটাল ফ্রেমের চশমা কিনে দেবে ইরাবতী।

"সুখময়, তোমার চোখদুটো বেশ লাল লাল মনে হচ্ছে!" ইরাবতীর সাবধানী নজর এড়ায়নি।

"দেখি!" কাছে এগিয়ে এসে সুখময়ের চশমা খুলে ইরাবতী তার চোখদুটো দেখলো।

"কাকে আর চোখ রাঙাবো বলো?" রসিকতা করলো সুখময়।

"কেন? আমাকে?" এরপর ইরাবতী ওর গায়ে হাত দিয়ে ওর শরীরের উষ্ণতা নিজের হাতে অনুভব করলো। "তোমার তো জ্বর এসেছে! বলোনি তো!"

"কখনো তো কথা শুনলে না," জোর করে সুখময়কে নিয়ে এসে ইরাবতী বিছানায় শুইয়ে দিলো। মাথা ধরেছে শুনে, অম্রুতাঞ্জনের শিশিটা নিজের হ্যান্ডব্যাগ থেকে বার করে সুখময়ের কপালে নিপুণভাবে প্রলেপ দিল।

সুখময় দেখছে আর ভাবছে, এই ইরাবতী ওরফে টুকটুকির সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? পত্নী? জায়া? ভার্যা? কলত্র? বান্ধবী? চুক্তিবিহীনা পার্টনার?

অ্যাডভোকেট পল্টু মিটার বলেছিলেন, "সুখময়, তোমার নায়ক যে জীবনযাপন করতে চাইছে সেখানে সঙ্গিনীকে কোনো স্ট্যাটাসই দেওয়া যাচ্ছে না। এই অন্তর্বর্তী সময়ে তোমার নায়ককে ও বান্ধবীকে অবশ্যই একটু সাবধানী হতে হবে। হঠাৎ গর্ভে ছেলেপুলে এসে গেলে ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে উঠবে।"

কী আশ্চর্য! এরই মধ্যে পাম অ্যাভিনিউয়ের আবাসনে ইরাবতী শিবরাত্রি পালনের ব্যবস্থা করেছে। এ নিয়ে কিন্তু কোনো রসিকতা করবে না সুখময়, আচমকা মনে আঘাত পাবে ইরাবতী।

এই শিবরাত্রিটা এদেশের মেয়েদের একটা অভ্যাস, একটা খেয়াল, একটা রিচুয়াল। এর গভীরে প্রবেশ করে এর কোনো অর্থ আবিষ্কার করতে পারেনি কেউ।

অনেকদিন আগে রমিত সেনগুপ্ত একবার সুখময়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি তো অনুসন্ধানী মানুষ। মেয়েরা, ইনক্লুডিং মাই ওয়াইফ এবং মাই সেক্রেটারি সহসা—দু' জনেই আপনার বান্ধবী—এরা কেন শিবরাত্রি করে বলুন তো?"

সুখময় জানতো উত্তরটা। সে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, "মানুষের ইতিহাসে শিবই প্রথম বিবাহিত পুরুষ, মিস্টার সেনগুপ্ত!"

"আই সি, আপনার ধারণা, বিবাহ সিস্টেমের প্রতি মেয়েদের এইটাই

সাইলেন্ট ট্রিবিউট—নীরব নমস্কার!”

ব্যাপারটা মাথায় ঠিক এই ভাবে কখনও ঢোকেনি সুখময়ের। রমিত সেনগুপ্ত অবশ্য বলেছিলেন, “আচ্ছা মশাই, আদিকালে মেয়েরা কি একটু বেশি বয়সের স্বামী পছন্দ করতো? এই যে কথাটা শুনি—বুড়োশিব— অথচ তরুণী বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা মহলে ভদ্রলোক ভীষণ জনপ্রিয় ফিগার।”

হেসে ফেলেছিল সুখময়। “আমি একবার তিলজলায় এক সভায় শুনেছিলাম, এই শিব আদৌ ‘বুড়ো’ নন তিনি ‘ব্যূঢ়’—যার অর্থ বিবাহিত। বাংলায় আইবুড়ো কথাটা শুনেছেন তো মিস্টার সেনগুপ্ত?”

রমিত বলেছিলেন, “বাঙালি মেয়েদের বোঝা দায়, যাঁকে পছন্দ হলো তাঁর জন্য শুধু উপবাস নয়—শিবঠাকুরের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্যা দান!”

সুখময় বলেছিল, “গোলমেলে প্রশ্ন, রমিতবাবু। তিন রমণীকে আমরা শিবের অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে দেখে আসছি—পার্বতী, কালী এবং গঙ্গা।”

রমিত খুব এনজয় করেছিলেন, বলেছিলেন, “তার মানে তিনটে পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণে মেয়েদের তেমন প্রবল আপত্তি ছিল না?”

সুখময় বলেছিল, “কোথায় যেন ব্যাখ্যা রয়েছে—পার্বতী আর্যকন্যা, কালী দ্রাবিড় কন্যা এবং গঙ্গা অবশ্যই মঙ্গোলীয় কন্যা।”

এই শিবের নামে আজ যে উপোস করে রয়েছে সেই মেয়েটি উদ্বিগ্ন, সুখময়কে সে জিজ্ঞেস করলো, “কেন আবার তোমার জ্বর হলো?”

“এক আধবার জ্বর হবে না? শরীরকে কী করে ব্যাধিমন্দিরম বলা হবে?” সুখময় ব্যাপারটা হাল্কা করে দিতে ব্যগ্র।

একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বড়ি এবার বেরিয়ে এলো ইরাবতীর .হ্যান্ডব্যাগ থেকে। পরম যত্নে একটা ডোজ সে সুখময়কে খাইয়ে দিল। একবার ইচ্ছে হলো, ইরাবতীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলে, তুমি মিষ্টি সোনা। কিন্তু শিবরাত্রির ভয়ে এগলো না সুখময় ' পুজো-আচ্চার সময় ইরাবতী বেজায় নিষ্ঠাবতী হয়ে যায়, ঠাকুরের সামান্য বিরক্তি উৎপাদনের ঝুঁকি কোনো পূজারিণীই নিতে চায় না। কত রকম আচারের অদৃশ্য বন্ধন আমাদের জড়িয়ে রেখেছে, মানুষ স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে আছে, প্রিয়জনের মঙ্গলের আশায় অথবা

অমঙ্গলের আশঙ্কায়।

পরে একসময় সুখময় তার আচমকা চুম্বনেচ্ছার কথাটা জানিয়েছিল ইরাবতীকে। ইরাবতী সমালোচনা করেছিল—"ভালবাসতে গিয়ে এতো ভাবো কেন, সুখময়? যা ইচ্ছে হবে তা দুম করে করে বসতে হবে তো!"

ব্যাপারটা হালকা করবার জন্যে সুখময়ের উত্তর, "ডাক্তারির কথা ভেবে?"

"হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রয়োগের আধঘণ্টার মধ্যে কিছু খেতে নেই, তুমি তো সেবার সাবধান করে দিয়েছিলে।"

"আমি ওসব জানি না! আজ শিবরাত্তির নিশিজাগরণের সময়ে অসুখ নিয়ে শুয়ে থাকা চলবে না।" ইরাবতী যে অন্তর থেকেই কথা বলছে তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি সুখময়ের।

সুখময়কে ভালভাবে খাইয়েদাইয়ে শিবরাত্রির উপবাসিনী ইরাবতী ওর দিকে গভীর আকর্ষণে তাকিয়ে আছে।

মানুষটা সামনে একটু ঝুঁকে পড়ে স্বামী সারদানন্দ রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ পড়ছে। মঠে-মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে এই লীলাপ্রসঙ্গই শেষ কথা। এমন বই একটা নিরীহ পাঠককে কীসের খেয়ালে, কীসের টানে জীবনের জটিল আবর্তে টেনে আনলো? ইরাবতী অনেকগুলো ছবির রিল চোখেব সামনে দেখতে পাচ্ছে। একসময় সুখময়কে সে শুধু দেখেছে, কোনো টান অথবা অনুভবের অবকাশ ঘটেনি। তারপর মানুষটার প্রসন্ন কৃতজ্ঞতাবোধ এবং মূল্যবোধ খুব ভাল লেগেছে। তারপর বিপদের সময় তো মনে হয়েছে, স্বয়ং ঈশ্বর মানুষটাকে পরিত্রাতার ভূমিকায় পাঠিয়েছেন। তারপর দীর্ঘদিন যা ছিল তা হলো শ্রদ্ধার এবং কৃতজ্ঞতার মিশ্রণ। তারপর কী যে হলো।

সহসাকে নিয়ে রমিত যে লীলাখেলায় মত্ত হয়েছিল তার খবর পেয়ে প্রতিহিংসার রক্ত ইরাবতীর মাথায় উঠে গিয়েছিল। রমিতের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার নেশায় অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে সে ঝাঁপ দিয়েছে অজানা সাগরে। প্রশ্রয়ের বদলে ওদিক থেকে প্রত্যাখ্যান এলে কী সর্বনাশ হতো, তা হিসেবের মধ্যে নেয়নি ইরাবতী।

কার্যকারণ, অতীত এবং সুখময়ের মানসলোক এসব অনুসন্ধানের পিচ্ছিল

পথে আর যেতে চায়নি ইরাবতী। কী হবে ওসব দেখে? কবে সুখময়ের বুকের মধ্যে ইরাবতীর ছায়া পড়েছে, অথবা ছায়া পড়েনি তা জেনে কী হবে? ঝোড়ো হাওয়ায় যা উড়ে যাবার তা তো উধাও হয়েছে।

সুখময় বেশি কথা বলে না, যা উচিত নয় তা করার জন্যে কোনো ব্যগ্রতা থাকে না তার মধ্যে। ব্যাপারটা না-ঘটলে পৃথিবীর ভীষণ ক্ষতি হয়ে যেতো, এ কথা ইরাবতী তার আচরণে প্রকাশ করেছে ; আর এই মানুষটা তা যে শান্তভাবেই স্বীকার করে নিয়েছে, তা তার আচরণেই সারাক্ষণ প্রকশিত হচ্ছে।

এক একবার লোভ হয় ইরাবতীর, জিজ্ঞেস করে, মানুষটার ক্ষতি হলো কিনা? একটু একটু করে সিঁড়ি ভেঙে প্রায় দেবত্বের পথে পৌঁছে যাচ্ছিল সুখময়। যখন মোকাবিলার মুহূর্ত এলো তখন সুখময় যদি দেবতা সাজার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠতো তা হলে কী ভীষণ সর্বনাশ হতো! মানুষ সমস্ত ব্যাপাবগুলো না-বুঝে খেয়ালের বশে, সুখের আশায় কত সব অদ্ভুত এবং বেপবোয়া কাণ্ড করে বসে। এই সব সামলাতে অনেক সময় লেগে যায়।

লীলাপ্রসঙ্গ পড়তে পড়তে মানুষটা বোধহয় ঘুমিযে পড়েছে। মাঝপথে হঠাৎ হোঁচট খেলেও কামনা-বাসনার ভিতরের কথাগুলো খুঁজে বার করবার অ'কাঙক্ষা দূরীভূত হয়নি ; ওর আচরণ দেখেই ইরাবতী স্পষ্ট বুঝতে পারে কোনো অন্যায় সে করেনি।

প্রতিশোধ থেকেও যে আত্মনিবেদন আসতে পারে তা ঠাকুর কি কোথাও স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন? ঠাকুরের ছবির সামনে ইরাবতী তার শরীরকে যথাসাধ্য গ্লানিমুক্ত করে, চুপি চুপি প্রশ্ন করেছে। ঠাকুরের যা স্বভাব! মুখ খুলে উত্তর দেন না। তবে তিনি যে ইরাবতীকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, আশ্রয় দিচ্ছেন তা বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না।

আব ঐ সহজ সরল মানুষটা? লীলাপ্রসঙ্গ হাতে যে ঘুমিয়ে পড়েছে রোগতপ্ত শরীরে? কামনাবাসনা নিয়ে ও যে রক্তমাংসের মানুষ তা ইরাবতী অবশ্যই জানতে পেরেছে। কিন্তু পতিতের দেবতা থেকে সে নিজেই কি এখন পতিত?

ইরাবতী সাবধানে বইটা সরিয়ে নিলো ঘুমন্ত সুখময়ের বালিশ থেকে।

বইটা নিজের বুকের কাছে এনে বললো, 'লীলাময় কত রূপে তব লীলা হেরি, অশেষ করুণাময় শোকতাপহারী। ঠাকুর আমরা দুর্বল, আমরা পথশ্রান্ত, লক্ষ্যহারা, তুমি পথ দেখাও, তুমি আমাদের ক্লেদমুক্ত করো।'

ঘুমন্ত মানুষটাকে বারবার দেখছে ইরাবতী। ভাগ্যের স্রোতে অসহায় মানুষ কোথা থেকে কোথায় ভেসে যায়। পাম অ্যাভিনিউয়ের এই একচিলতে ফ্ল্যাটে এইভাবে যৌথ বসবাসের কথা কি ভাবা যেতো যখন প্রথম কলেজে দেখা হলো ইরাবতী ও সুখময়ের? সুখময়কে তখন বরং একটু 'বোকা' মনে হয়েছিল ইরাবতীর, বরং সহসা ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল, সুখময়ের মধ্যে কেমন একটা স্নিগ্ধ গ্রাম্য সরলতা ছড়িয়ে আছে, মুখটি সারাক্ষণ মিষ্টি হাসিতে আলোকিত হয়ে আছে, যে হাসি আলো দেয় কিন্তু উত্তাপ দেয় না।

এই মানুষটিকে নিজের স্বার্থে চরম বিপদের মধ্যে টেনে এনেছে ইরাবতী। প্রথমে ছিল কেবল রমিতের অর্থ-সংক্রান্ত হাঙ্গামা, সুখময়কেও মামলায় জড়িয়ে দেওয়াটা কোম্পানির পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না।

পাম অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতেও যে রমিতের গোপন ধনের সন্ধানে সার্চ হতে পারে তা ইরাবতী সুখময়কে জানিয়েও দিয়েছিল। যে কেউ ভয় পেয়ে যেতো, কিন্তু সুখময় মাথা ঘামায়নি। সে সাহস করে বলেছে "আসুক না! দেখুক খুঁজে। অনেক খোঁজাখুজির পরে বিফল হয়ে শুকনো মুখে চলে যেতে হবে।"

সুরসিক সুখময় বলেছিল, "আমি রমিত সেনগুপ্তর মতন অতিথি সেবাপরায়ণ নই, আমার বাড়িতে মাত্র চারটে কাপডিশ, আমি ওদের চা পর্যন্ত অফার করতে পারবো না!"

সার্চ হলে, কিছু না বেরুলেও বদনাম ছড়াবে। "তা ছড়ায় ছড়াক! গোড়ায় বদনাম না হলে পরে সুনাম হবে কী করে? একথা নরেন দত্ত বলতেন, বুঝেছো ইরাবতী।"

সেই সব সমস্যার সমাধান হয়নি, মূল ব্যাপারটা পুরোপুরি ঝুলে আছে। হল অ্যান্ড লাডলো কোম্পানিকে কয়েক লক্ষ টাকা ডবল গচ্চা দিতে হয়েছে পেনসন ট্রাস্টে যাতে অন্য মামলা শুরু না হয়ে যায়। ইনটারন্যাল অডিটে লোক

বেড়েছে, এখন এই অফিসে কেউ কাউকে আর্থিক ব্যাপারে বিশ্বাস করে না।

প্রাক্তন ডিসি-ডিডি মিস্টার ব্যতিক্রম দস্তিদার এখনও বলছেন, "লোকটার নবাবী মেজাজ দেখুন! আমাদের হাতে ধরা পড়া অবধারিত বুঝে অন্য মানুষরা ভেঙে পড়ে, আর এই লোকটা সেই সময়ে আনন্দভ্রমণে বেরুলো, শরীর ও মনের সব সাধ আহ্লাদ মিটিয়ে নিতে। একা পালানোরও প্রয়োজন হলো না! সঙ্গে রইলেন একান্ত সহকারিণী! আনন্দভ্রমণের থেকে সহকারিণী নিজের খেয়ালে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে এলেন আর তিনি চলে গেলেন অজ্ঞাতবাসে!"

কিন্তু ধর্মের কল এক সময় বাতাসে নড়বেই, তখনই শুরু হবে আইনের খেলা।

যখন রমিত সেনগুপ্ত কলকাতায় ফিরে আসবে তখন শুধু নিজের বিপদ নয় সুখময়েরও বিপদ আসবে।

এই সুখময়কে নিয়ে পুলিশে টানাটানি করবে এই অভিযোগে যে পরস্ত্রী জেনেও ইরাবতীর সঙ্গে স্বামীস্ত্রী হিসাবে বসবাস করছে। অথচ সুখময় কোনো অপরাধ করেনি। কিন্তু সে কথা তখন সমাজে কে বিশ্বাস করবে? ইরাবতী কিছু কিছু খোঁজ নিয়েছে। যদি সে নিজে কোর্টকে বলে, শাস্তি দিতে হলে আমাকে দিন, আমিই ওকে বাইরের ঘরের ডিভান থেকে বেডরুমে নিয়ে গিয়েছি সাদর আমন্ত্রণ করে। বিচারকরা নাকি নিরুপায়। তাঁরা আইন তৈরি করেন না, কেবল আইনের বিশ্লেষণ করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং প্রয়োগ করেন। দেশের আইন বলে, জেনে শুনে কোনো পুরুষমানুষ অপরের বিবাহিতাকে নিয়ে খেলা করতে পারবে না!

শিবরাত্রির রাত যেন শেষ হতে চায় না। যামিনী জাগরণের পরিকল্পনা প্রাচীন ভারতে কোন্ উদ্দেশ্যে এসেছিল কে জানে?

শিবঠাকুর তুমিও সোজা দেবতা নও, বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর নদেয় এলো বান, শিবঠাকুরের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্যে দান! সুখময় চেয়েছিল যামিনী জাগরণের সঙ্গী হতে, ইরাবতী বললো, জ্বর কমেছে বটে, কিন্তু তোমার এখন ঘুমনো প্রয়োজন।

ঘুম ঠিক আসে না। একটু পরেই চোখ খুলে সুখময় দেখলো তিরিশ

পাওয়ারে একটা আলো জ্বেলে ইরাবতী উদাসভাবে পাম অ্যাভিনিউয়ের দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার মাথায় যেন পৃথিবীর সমস্ত ভাবনা জমা হয়ে রয়েছে। সুখময় অস্পষ্ট আলোয় ছায়াশরীর দেখতে পাচ্ছে—ইরাবতী কি পূজা করছে, না আকাশপাতাল ভাবছে, না কেবল অপেক্ষা করছে রাত্রি অবসানের জন্য তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সাতটা বছরের প্রতীক্ষা তার কাছে বোধহয় দুর্লঙ্ঘ্য মনে হচ্ছে।

পল্টু মিটার অ্যাডভোকেট আগেই টেলিফোনে খবর পেয়ে বাল্যবন্ধুর জন্যে অপেক্ষা কবছিলেন।

"এসো ব্রাদার। তুমি যে সাহস করে মাঝে-মাঝে ঠাকুর-স্বামীজী-মাঠাকরুণের আওতার বাইরে চলে যেতে চাইছো এতে আমি খুশী। তোমার ঐ সব লেখায় অপ্রচলিত কিছু সত্য থাকে, কিন্তু কোনো সংশয় থাকে না। সমস্ত রামকৃষ্ণ আন্দোলনটাই দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ওপর ; ভক্তির ওপর। কিন্তু ভায়া বিজ্ঞজনের কাছে সংশয় হলো নুনের মতন, একটু সোডিয়াম সল্ট ছড়িয়ে না-দিলে নাটক নভেল জীবনী আজকালকার জিভে বিস্বাদ লাগে। উপন্যাসে তোমার চরিত্রগুলো যতো ক্রাইসিসে পড়বে ততো পাঠক-পাঠিকারা নড়ে চড়ে বসবেন। এই তো এতোদিন ওকালতি করছি, দেখছি সংশয় থেকে সংকট, সংকট থেকে সংঘাত, সংঘাত থেকে প্রতিঘাত, প্রতিশোধ এবং প্রতিহিংসা। সেখানে ভায়া নির্ভরতাও নেই, নিবেদনও নেই, প্রেমও নেই, বিশ্বাসও নেই। ঠাকুর যে কেন উকিলের অন্ন খেতেন না এবং উকিলদের সঙ্গে তেমন মিশতেন না, তা ঠিক বুঝতে পারি না।"

হাসলো সুখময়। "তুমি যা বলছো তা ঠিকও বটে, বেঠিকও বটে, পল্টু।

তাঁর এক নম্বর চেলাটির তো উকিলের বংশ, নরেন দত্ত তো নিজেও উকিল।"

"ঠিক বলেছো, সুখময়। ঠাকুর যেখানে উকিলের ওপর বিশ্বাস রাখলেন সেখানে কী কাণ্ড হয়ে গেলো, নরেন দত্তর মতন উকিল পাওয়া তো সোজা কথা নয়।"

সুখময় বললো, "বিবেকানন্দর সমস্ত সম্পত্তির আইনগত পরামর্শদাতা ছিলেন এটর্নি পল্টু কর, আর আমার নায়ক-নায়িকাদের একমাত্র ভরসা পল্টু মিটার!"

"লেখক হিসেবে যখন নাম করবে তুমি তখন কত বাঘা বাঘা আইনজ্ঞ জুটবে তোমার নায়িকাদের!"

"শোনো পল্টু। বড়ই বেদনাদায়ক দৃশ্য একখানা। শিবরাত্রির শেষ প্রহর। সমস্ত দিন উপবাস করে, সমস্ত রাত একা জেগে থেকে ঘরের মধ্যে আমার নায়িকা চোখের জল ফেলছে। স্বামী কোনোরকম ব্যবস্থা না করে উধাও। উধাও হয়েও সে শান্তি দেয়নি, একান্ত সহকারিণীর সঙ্গে গোপন অভিসারের বিশ্বাসযোগ্য খবর রয়েছে। যথাসর্বস্ব হারিয়ে নায়িকা আশ্রয় পেয়েছে এমন একজনের কাছে যে একদিন অনেক উপকার পেয়েছে।"

"কারা তার উপকার করেছে, সুখময়?" প্রশ্ন করেছেন আইনজ্ঞ পল্টু মিটার।

"ভাগ্যের পরিহাসে বা নিয়তির রসিকতায় স্বামীর একান্ত সহকারিণী, স্বামী এবং নায়িকা তিনজনেই সেই উপকার প্রচেষ্টায় জড়িত। তারপর দূরত্ব ঘুচেছে, আশ্রয় মিলেছে এবং অবশেষে প্রতিশোধের নেশায় অঘটন একটা ঘটে গিয়েছে। মনে হয় নায়ক বা নায়িকা কেউই এমন একটা পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না, হয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা—একেবারেই সহসা। অথচ আইন এই যৌথ বসবাসের ধারে কাছে নেই।"

পল্টু বললেন, "তোমার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি, সুখময়। সাত বছর প্রতীক্ষার ঐ বৃত্তটা বড়ই বৃহৎ—কোনোক্রমে মাত্র দুটো বছর অতিবাহিত হয়েছে।"

"জানো পল্টু, নায়িকারা তো সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়—তাই

সেখানে ভুল বোঝাবুঝি, হাসাহাসি, ব্যঙ্গ। স্বামী নিরুদ্দেশ এবং সেই সুযোগে একজন পছন্দসই পরপুরুষের সঙ্গে নির্লজ্জ বসবাস এবং দেহসুখের ভাগাভাগি। যারা ব্যাপারটা বোঝে তারাও লিভ টুগেদারের সামাজিক মর্যাদা দিতে উৎসাহী নয়—লিভ টুগেদার সেখানেই স্বাভাবিক যেখানে দু'পক্ষ ইচ্ছে করলেই বিবাহিত হতে পারে।"

পল্টু মিটার ভাবছেন। "সুখময়, তুমি আমাকে বড্ড বিপদে ফেলে দিচ্ছো। তুমি গল্পটা সত্যিই শেষ করতে চাও।"

"অবশ্যই চাই। সাতটা বছর এই সাসপেন্স টেনে রেখে কী লাভ লেখকের?"

পল্টুর বক্তব্য : "সুখময়, তুমি যদি আদ্যিকালের বধূদের পাঠিকা হিসেবে সাপোর্ট চাও, তা হলে গল্পটাকে বিচ্ছেদময় করতে হবে। আচমকা ফিরে আসুক তোমার নায়িকার স্বামী। সে পুলিশে ডায়েরি করে জেলে পাঠাক তোমার নায়ককে, সে বুঝুক অপরের বধূকে বুকে নিয়ে সংসারপাতার স্বপ্ন দেখে ভাল কাজ করেনি।"

চুপ করে বসে আছে সুখময়। পল্টু মিত্র জিজ্ঞেস করলেন, "পছন্দ হচ্ছে না? তা হলে ওয়েট করো, সাতবছর পরে বিবাহিত জীবনেব আইনগত অবসান হোক! এর মধ্যে যদি তহবিল তছরুপের অভিযোগে স্বামীর সাত বছরের বেশি জেল হয়, তাহলে তৃতীয় বছর থেকে আদালতে আবেদন পড়ুক। চিন্তা কি? নায়ক এবং নায়িকা শয্যাসঙ্গী রয়েছে, তারা তো বিরহ বা বিচ্ছেদের আগুনে পুড়ছে না।"

এটাও পছন্দ হচ্ছে না সুখময়ের, বুঝতে পারেন পল্টু মিত্র। "যা এক একটা জ!টিল প্লট ফেঁদে বসে আজকালকার লেখকরা! শরীরকে উপভোগ করবে, করো; কিন্তু দেহের সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে আইনের, আইনের সঙ্গে নৈতিকতার এতো জট পাকিয়ে থাকলে চলবে কেন?"

এদিক থেকে কোনো মন্তব্য নেই। পল্টু বললেন, "আমার মনে হয়, তোমার পছন্দসই নায়ককে একটু দুর্বল ভাবে এই গল্পে-আঁকা হচ্ছে।"

"পল্টু, তুমি দেখো, একালের বড় বড় উপন্যাসের নায়কগুলো ভীষণ দুর্বল। তারা কঠিন সব প্রশ্ন তোলে, সমাধান খোঁজে, কিন্তু দুড়ুম করে কিছু করে

বসে না। ধরো, সাহেব বিবি গোলামের ভূতনাথ, কিংবা কড়ি দিয়ে কিনলামের দীপঙ্কর, কিংবা দৃষ্টিপাতের ওই মারাঠী ভদ্রলোক চারুদত্ত আগারকার।"

পল্টু বললেন, "বোধ হয় তুমি ভুল করোনি। দুর্বল চরিত্র না হলে এমন একটা পরিস্থিতিতে মানুষ জড়িয়ে পড়বে কেন? নায়কের মধ্যে ষাট পার্সেন্ট কৃতজ্ঞতার মহত্ত্ব আছে, মানুষের ভাল করবার বাসনা আছে, আর চল্লিশ পার্সেন্ট রয়েছে ইনডিসিশন—কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর অক্ষমতা। এই রকম লোককে তুমি কোনো বড় কোম্পানির কর্ণধার করতে পারবে না, এরা ভাল এগজিকিউটিভ হবে না। তুমি অবশ্য নায়ককে সাধারণ একটা চাকরিতে রেখেছো, ঘাড়ে একটা রূপবতী দেহবতী মহিলা চেপেছে বলে সে ঝপাঝপ কর্মোন্নতির নেশায় মেতে ওঠেনি।"

অবাক হয়ে যায় সুখময়। "পল্টু, আদালতে মামলা করো বলে তোমরা কত কী ভাবতে পারো। তুমি চমৎকার বিশ্লেষণ করছো নায়কের চরিত্রটা। রামকৃষ্ণ, প্রণবানন্দ, যোগানন্দ ইত্যাদি পরমপুরুষদেব খুঁজে কোনো স্পিরিচুয়াল পথও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ মানুষটা খারাপ নয়, সে চায় সবার ভাল হোক, সবাই সুখে থাকুক, নিজের অজান্তে সে উপকারীর স্ত্রীর দেহসংসর্গ করছে, তার জন্যে যে নিরন্তর জ্বলছেও বটে, অথচ সমস্যা থেকে সরে আসার, নায়িকাকে দূরে সরিয়ে দেবার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে।"

পল্টু বললেন, "আজকালকার মেয়েরা বোধহয় এই ধরনের পুরুষ পছন্দ করে না। যে পুরুষ শরীব দেখে সন্তুষ্ট হয়েছে সে সাহস করে তা স্বীকার করুক, তার জন্যে মূল্য দিক, এই চায় পাঠিকারা। মনে করো, তোমার নায়ক ঐ নায়িকাকে কলেজজীবন থেকেই প্রবলভাবে চেয়ে এসেছে ; তারপর সুযোগ এসেছে, সে সুযোগটার পূর্ণ ব্যবহার করেছে, তারপর যদি পলাতক স্বামী ফিরে এসে কিছু করে তো করুক। সো হোয়াট? নবনীতিসুধা পড়বার জন্যে আজকাল কেউ উপন্যাস কেনে না। হরেকরকম সমস্যা চাই, ড্রামা চাই, ক্ষেত্র চাই, মানুষের আদিম চাহিদাগুলোর একটা রিলিজ চাই, তারপর সবকটা জিনিস ঘূর্ণিপাকে ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণিপাকটাই মডার্ন লাইফ। এইটাই জীবনে অহরহ যা ঘটছে তার প্রতিচ্ছবি।"

সহসা

একটা জিনিস ক্রমশ দিনের আলোর মতন সুখময়ের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সবাইকে ডোন্টকেয়ার করে যারা লিভ টুগেদার করছে তারা শেষপর্যন্ত সামাজিক বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্যে হাঁপিয়ে উঠছে। যে মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, প্রতিদিন কাজে বেরুচ্ছে, বুক ফুলিয়ে জানাশোনা একজন পুরুষের সঙ্গে বসবাস করছে, সেও কিছুদিন পরে সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে মন্দিরে এবং পূজাপার্বণে যাবার জন্যে এবং দুর্গাপূজায় বিজয়াদশমীর সকালে সিঁদুর খেলায় অংশ নেবার জন্যে যে ব্যাকুল হয়ে উঠছে।

ইরাবতী আজকাল প্রায়ই বিমনা হয়ে যায়। সার্চ পার্টি, ইনকামট্যাক্স ইনসপেকটর, এদের সংকট নাকের গোড়ায় নেই। একসময় এদের দেখলেই ভীষণ দুশ্চিন্তা হতো, আরও কতো প্রশ্নের জবাব দিতে হবে ভেবে মন হতাশায় পূর্ণ হয়ে উঠতো। তারপর ব্যাপারটা সহজ হয়ে গিয়েছে, যার কিছুই নেই তার বাটপাড়ের ভয়ও নেই।

ইরাবতী সোজাসুজি বলে দিয়েছে, "রমিত সেনগুপ্ত সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না, তাঁর বিষয়সম্পত্তির একটা নয়াপয়সাও আমার কাছে নেই। যেখানে আমাদের যা সম্পত্তি পাবেন তা আপনারা সীজ করতে পারেন, বাজেয়াপ্ত করতে পারেন, আমার কিছু এসে যায় না। রমিত সেনগুপ্তর সঙ্গে আমার একটা যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্টও নেই।" একথা বলতে পেরে খুব স্বস্তি অনুভব করে ইরাবতী।

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, যারা অফিসের টাকা সুপরিকল্পিতভাবে তছনছ করে, তারা ফিরে এসে লড়াই করবে কীসের জোরে এবং ভরসায়? নিশ্চয় গুপ্তধন কোথাও সুরক্ষিত আছে।

ইরাবতীর সাহস অনেক বেড়ে যাওয়ায় কিছুটা সুফল হয়েছে। লোকগুলো

আর তেমনভাবে ফলো আপ করে না। মহিলা বলেই দিয়েছেন, "আপনাদের যত প্রশ্ন সব রমিত সেনগুপ্তকেই করবেন, আমি ছোট একটা চাকরি করে গ্রাসাচ্ছাদন করি, পরের বাড়িতে বিনা ভাড়ায় থাকি, আমার প্রত্যাশা করার কিছু নেই, লুকোবারও কিছু নেই।" এমন কী অফিসের বেয়ারাটা বিপদের দিনে যে তিন হাজার টাকা ধার শোধ দিয়ে গেলো সে টাকাটাও যত্ন করে রেখে দিয়েছে ইরাবতী। যে ধার দিয়েছিল তাকেই ফেরৎ দিয়ে দেবে। যথেষ্ট হয়েছে।

"ঠাকুর অনেক শাস্তি দিয়েছো। এখন আমি একটু স্থিতি চাই, সেই সঙ্গে একটু শান্তি। আর কিছু চাই না আমি।"

আসলে ইরাবতী এখন নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চায়। একটা খাতায় অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা কাহিনী লেখা হচ্ছিল, সেটা মাঝপথে রুদ্ধ হয়েছে, এই পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে আবার নতুন ভাবে শুরু করতে হবে সেই একই খাতায়।

নতুনভাবে লেখার ব্যাপারটায় সুখময়েরও ভীষণ লোভ লাগে। পুরনো গল্পের পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে একেবারে নতুন ভাবে শুরু করা। ইরাবতী আধুনিক অফিসে কাজ করে, সে নিশ্চয় জানে অনেক খাতা বিশেষভাবে তৈরি—'লুজলিফ'। খেয়ালখুশি এবং প্রয়োজন মতো স্পাইরাল রিং খুলে পুরনো পাতা খুলে নাও, কোথাও দাগ থাকবে না ; তারপর আবার নতুন পাতা ঢুকিয়ে নাও। খুলে নেওয়া এবং ঢোকানো, আবার খুলে নেওয়া এইভাবেই তো অনেকের জীবন পরিকল্পিত—ফলে কোথাও দাগ পড়ে না, কোনো ক্ষতিও হয় না।

সহসা

'ইরাবতী, অফিস থেকে ফিরে এসে কী ভাবছো? অফিসে কোনো অসুবিধে নেই তো?" জিজ্ঞেস করলো সুখময়।

সুখময়ের দিকে তাকালো ইরাবতী। তারপর বললো "চিন্তা থাকে, কিন্তু দুশ্চিন্তা নেই। মিসেস চারুলতা চট্টরাজ বিজনেসটা ভালই সামলান। আমাকেও কিছু দায়িত্ব দিচ্ছেন। বলছেন, এই পি-আর এজেন্সির বিজনেসটা কলকাতাতেও ক্রমশ জমে উঠবে।"

"তুমি ওখানে কী করো ইরাবতী?"

"সুখময়, আমি শুধু কাগজের রিপোর্টারদের রিকোয়েস্ট করি আমাদের পাঠানো বিভিন্ন কোম্পানির খবরগুলো যেন ভালভাবে ছাপানো হয়। খবরের কাগজে যা বেরোয় মানুষ তাই বিশ্বাস করে, মিসেস চট্টরাজ এসব ভালোভাবে জানেন। অনেক খারাপ লোক সম্বন্ধে আমরা ভাল খবর পাঠাই, জানাশোনা থাকলে, ধরাধরি করলে সেসব বেরিয়ে যায়।"

একটু থামলো ইরাবতী। "মিসেস চট্টরাজ বলেন, পুরুষদের ব্যাপারটাই আলাদা। তাদের সব কিছু কলঙ্ক কত সহজে মুছে যায় প্রচারের প্রলেপে। মেয়েদের কিন্তু তা হয় না; যত প্রচার হয় দুর্নাম তত ছড়িয়ে পড়ে, মুখে মুখে।"

ইরাবতীরও তাই হয়েছে। মানুষটা কোন্ অবস্থায় যথাসর্বস্ব হারিয়ে বার্ডওয়ান রোডের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং স্বামী অজ্ঞাতবাসে গিয়েও কী ব্যাভিচার চালিয়েছিলেন কোথাও তার কোনো উল্লেখ নেই, কিন্তু সবাই জানে ইরাবতী এখন পরপুরুষের সঙ্গে লিভ টুগেদার করে। একজন মহিলা সাংবাদিক তো সোজাসুজি ইরাবতীকে জিজ্ঞেস করলেন, অপরের সঙ্গে বসবাস করলেও সেনগুপ্ত পদবীটি এখনও ছাড়েন নি কেন? বিয়ে না করে বসবাসে নিরাপত্তার অভাব বোধ করে কি না ইরাবতী। লিভ টুগেদারকে আইনের স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন কি না? ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইরাবতী অস্বস্তি বোধ করেছে। আইনকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যেই তো বিয়ের মন্ত্র না পড়ে প্রিয় মানুষের সঙ্গে লিভ টুগেদার। এই সামান্য ব্যাপারটা কে বোঝাবে সমাজকে?

খবরের কাগজের মহিলা ইরাবতীকে প্রশ্ন করেছেন, "লিভ টুগেদার করতে গিয়ে পুরুষ মানুষ যদি মেয়েদের ঠকায়?"

ইরাবতী উত্তর দিতে চায়নি। "মেয়েরাও তো ঠকাতে পারে পুরুষদের। আর ঠকানোর প্রশ্নই বা ওঠে কেন? গাঁটছড়া না বেঁধে, দায়দায়িত্বে জড়িয়ে না পড়ে, যুগল জীবনযাপনের জন্যই তো বিবাহহীন বসবাস।"

মহিলা রিপোর্টার আরও একপা এগিয়ে গিয়েছেন। "আমি যদি রবিবারের কাগজে এ-বিষয়ে প্রবন্ধ লিখি, আপনি কথা বলবেন তো?"

অবশ্যই নয়। কারও সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলবার মানসিকতা নেই ইরাবতীর।

"তার মানে। আপনি লিভ টুগেদার থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন?"

ইরাবতীর চোখে জল। সে কোথাও থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে না, কোথাও ঢুকতে চাইছে না। সে শুধু এই অনিশ্চিত জীবনের অবসান চাইছে। মেয়েরা সব সময় নিশ্চিন্ত হতে চায়, নিশ্চিত হতে চায়, আশঙ্কামুক্ত হতে চায় ঘর বাঁধবার জন্যে, সংসার করবার পক্ষে এসবের যে বিশেষ প্রয়োজন।

সংসার বলতে ইরাবতী যে কি বুঝছে সে নিয়ে কখনও সোজাসুজি আলোচনা হয়নি সুখময়ের সঙ্গে। এই এক মুশকিল, মেয়েদের সঙ্গে সংসার মানে কেবল ভর্তা, মাত্র সামান্য কিছুদিনের জন্যে। সন্তানের আগমনে সংসারের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা চায় সব মেয়ে, ইরাবতী আবশ্যই কোনো এক্সেপশন নয়।

"ইরাবতী, এদেশে মেয়েদের আর এক নাম তো ধৈর্য। সাতটা বছরের ধৈর্য আমাদের কাছে প্রত্যাশা করছে এদেশের আইন-কানুন। যে-মানুষের কোনো খোঁজখবর নেই আইনের চোখে সে সাত বছর অবশ্যই বেঁচে থাকবে। পল্টু মিত্র মস্ত অ্যাড্‌ভোকেট হয়েও এই সময়কে ছোট করতে পারছেন না। পল্টু পরামর্শ দিয়েছেন, খবরের কাগজে রমিতের কোম্পানি যে ছবিসহ নিরুদ্দেশ

বিজ্ঞাপন দিয়েছিল তা সংগ্রহ করে রাখতে। তাতে তো পুরস্কারের লোভও দেখানো ছিল।"

সাত বছর যে নিতান্ত কম সময় নয়, তার প্রমাণ, এতো কিছু হওয়ার পরেও মাত্র দু'বছর সময় কেটেছে। অথচ এক একসময় ইরাবতী ও সুখময় উভয়েরই মনে হয় যেন অন্তবিহীন পথ অতিক্রম করে এবার একটু বিশ্রাম প্রয়োজন।

আজকাল বিশ্রামের সময় হয় না ইরাবতীর। কারণ প্রায়ই সে দুঃস্বপ্ন দেখে। সে দেখে তারই চোখের সামনে এই পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়ি থেকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে সুখময়কে ভারতীয় পেনাল কোডের কোনো ধারা অনুযায়ী রমিত সেনগুপ্তর সংসার ভেঙে তার স্ত্রীকে বার করে নিয়ে আসার জন্যে।

ইরাবতী ওদের কাছে কাতর আবেদন করছে, "সুখময় নিরপরাধ, ও কিছু ভাঙেনি, ও বরং নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছে। বরং ধরতে হলে অ্যারেস্ট করুন ওই মেয়েটাকে যে দূরে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে—সহসা রায়চৌধুরী। যে প্রতিমুহূর্তে হিংসে করেছে ইরাবতীকে, তার সুখের সংসার সহ্য হয়নি, রমিত সেনগুপ্তকে সে নিজের মুঠোর মধ্যে এনেছে।"

পুলিশ সেই কথা শুনে আইনের বই দেখছে, কিন্তু বিবাহিতের সংসার নষ্ট করার পিছনে মেয়েদের যে কোনো বেআইনী ভূমিকা থাকতে পারে তা আইনে খুঁজে পাচ্ছে না। সহসা নিশ্চয় জানে, না হলে সে স্বপ্নের মধ্যে অমন নিশ্চিন্ত হয়ে সবকিছু দেখছে কেন?

সহসার কথাটা আজ অনেকদিন পরে সুখময়ও বাড়িতে বসে ভাবতে বসেছে। অফিসে গিয়েও সহসার চিন্তা দূর হয়নি।

একটা পুরনো ডায়রির মধ্য থেকে সহসার নিজের হাতে লেখা একখানা

চিঠি হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো। সহসা তখনই লিখেছে, "তুমি রমিত সেনগুপ্তর বাড়িতে অবশ্যই যোগাযোগ রেখো, আমি কয়েকদিন অফিসে থাকছি না।"

সহসা। সহসার কাছে কৃতজ্ঞ থাকার যথেষ্ট কারণ ছিল সুখময়ের। সুখময় সেবার ওর কাছে ক্ষমা চেয়েছিল ঘন ঘন অফিসে এসে তাকে চাকরির জন্যে জ্বালাতন করার জন্যে।

সহসা তার ইলেকট্রনিক টাইপরাইটারটা অটোম্যাটিক প্রিন্টিং-এর জন্য চালু করে দিয়ে বলেছিল, "এমনভাবে ক'দিন আর তোমার দেখা পাওয়া যাবে, সুখময়? চাকরি একটা হলো বলে, তারপর বড়জোর একবার বিয়ের কার্ডটা ডেলিভারি দিতে আসবে!" সুখময় যে চাকরি একটা পাচ্ছেই সে-বিষয়ে সহসা কখনও সন্দেহ প্রকাশ করেনি। সে বলেছিল, "রমিত সেনগুপ্ত—হি ইজ এ ওয়ান্ডারম্যান! অসম্ভবকে সম্ভব করতে ঐ মানুষটির তুলনা নেই।"

তা হলে ইরাবতী ইজ লাকি! সুখময়ের কথা সহসা তখন কানেই নেয়নি। মত পাল্টে সে বলেছে, "যাদের জীবনে উন্নতি করতে হবে তাদের অনেক সাহায্য প্রয়োজন। ডলপুতুল বিয়ে করে কোনো সুবিধে হয় না।"

তখন ওসব কথার ভিতরে ঢোকেনি সুখময়। সহসা বলেছে, "আমাদের এই অফিসে অনেক ব্রাইট লোকের ডলপুতুল ওয়াইফ আছে, সুখময়। ডলপুতুল মেনটেন করতে গিয়েই বাকি জীবনের সব এনার্জি তাদের চলে যায়। ফর হোয়াট? একেবারে আননেসেশারি।"

সহসা ছেড়ে কথা বলেনি সেবার। "একজন ভাল ছেলে ও একটা ডলপুতুল নিয়ে গল্প তোমার সাহিত্যের বিষয় নয় সুখময়, এসব বিষয়ে মাস্টার হচ্ছেন কথাসাহিত্যিক ব্রতীন গাঙ্গুলী। তুমি দেখবে, ডলপুতুলের আকর্ষণ এবং মোহ বেশীদিন থাকে না। মানুষ তখন কমরেড চায়। সহধর্মিণী কথাটার যে অনেক তাৎপর্য তা বুঝতে গেলে ব্রতীন গাঙ্গুলীর লেখা মন দিয়ে পড়তে হবে।"

চুপ করে ছিল সুখময়। এসব ক্যারাকটার তার মতন একজন নবীন লেখক কোনো গল্পে আনতে সাহসই করবে না। সহসার কিন্তু হৃদয় ছিল। চাকরির খোঁজে যে মানুষটা দরজায় দরজায় ঘুরছে তাকে নিয়ে বেশী মজা করেনি।

সহসা বলেছে, "তুমি অনেক ভেবেচিন্তে রামকৃষ্ণ লাইন থেকে সরে

যাচ্ছো, বিশ্বাস করতে চাইছো ভবিতব্যে, যা হবার তা কেউ আটকে রাখতে পারবে না এই বিশ্বাসে থাকতে চাইছো।"

সুখময় ব্যাপারটা তখনও বুঝতে পারছিল না। সহসাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "এতে ডলপুতুল, সংসার নিয়ে এতো খেলা, তবু রামকৃষ্ণ তো সেকেলে হচ্ছেন না। গৃহী বলো, সন্ন্যাসী বলো, ভোগী বলো সবাই যে বেশী করে তাঁকে চাইছে, ওঁদের সব গল্প জানা, তবু আবার জানবার জন্যে মানুষের কী ব্যাকুলতা।"

সহসা কিছুতেই ঠাকুরের সমালোচনা করবে না। সে শুধু বললো, "মিস্টার সেনগুপ্ত এর ভাল উত্তর দিয়েছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মাইন্ডটা যে ব্রিলিয়ান্ট। সেনগুপ্ত বলেন, ঠাকুর হলেন, এক প্রিমিয়ামে সারাজীবনের ইনসিওরেন্স। একবার ওঁর সামনে মাথাটা মাটিতে ঠুকে দাও, চোখটা বুজে ওঁকে ডাকো, তারপর সমস্ত ব্যাপারটা ভীষণ সোজা হয়ে যাবে—তুমি বুঝবে তিনিই সারাক্ষণ তোমার হয়ে ভাববার সব দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তোমার নিজের কোনো ভয় নেই।"

সুখময় শেষ যখন পল্টু মিত্তিরের চেম্বারে গল্প করতে গিয়েছিল তখন একটু মজা হয়েছিল।

পল্টু বলেছিলেন, "গল্পের প্লট ছ'কার মধ্যে যে এক ধরণের নেশা আছে তা এবার বুঝছি সুখময়। চরিত্রগুলো প্রথমে ছায়ার মতন মনের মধ্যে ভেসে বেড়ায়, তারপর ক্রমশ এরা থ্রি-ডাইমেনশনাল হতে থাকে। তোমার নায়ক, নায়িকা এবং তাঁর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া স্বামী এদের কথা আমিও ভাবছি। তারপর হঠাৎ মনে হলো, ভাল গল্প তো তিন চাকায় চলে না, ফোর হুইলার এবং ফ্রন্ট ড্রাইভ হওয়া চাই! তোমার তো চতুর্থ চাকা রয়েছে—ওই মেয়েটি,

যার চোখের সামনে অনেক কিছু ঘটেছে, কিন্তু তাকে তুমি সামনে আনতে চাইছো না। কেন?"

সুখময় বেশ বিপদে পড়ে গিয়েছিল। বললো, "আসলে, নায়িকা তাকে একেবারে সহ্য করতে পারে না।"

"শুধু সহ্য নয়, সুখময়, তুমি এতোক্ষণ যে ভাবে এগিয়েছো তাতে মনে হয়, এর ওপর প্রবল বিরক্তি এবং অভিযোগ রয়েছে নায়িকার। স্বামী অফিসের টাকা তছরূপ করেছে একটা অভিযোগ, কিন্তু আরও বড় অভিযোগ এই সহকারিণী তার সঙ্গে হোটেলের এক ঘরে রাত্রিযাপন করেছে।"

"থ্রি হুইলার টেম্পোকে এবার ফোর হুইলারের রূপ দাও সুখময়," পরামর্শ দিয়েছিলেন পল্টু। "ওর মধ্যে বিশেষ কোনো শক্তি রয়েছে, যে জন্যে কোম্পানি ওকে জেলে পুরলো না, সহসা রেজিগনেশন দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলো। উকিলরা তোমার নায়িকাকে সাত বছর মুখ বুজে ন যজৌ ন তস্থৌ হতে বলেছে। তোমার নায়িকা হিসেব করছে ততক্ষণে তার বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। একটা জায়গায় এসে গাড়ির স্টার্ট যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।"

'কী এতো ভাবছো, সুখময়? মেয়েটিকে খুঁজে বার করো। রাইটার সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের হাতে গল্পটা পড়লে হয়তো আর একটা লাভ অ্যাফেয়ার আরম্ভ হয়ে যেতো। নায়িকার ওপর ফাইনাল প্রতিশোধ নেবার জন্যে সহনায়িকার শেষ প্রেম। তুমি ওসব নিশ্চয় অ্যালাউ করবে না, তুমি একটা পরিণতি চাও, এমন পরিণতি যা তৃষিত তপ্ত মানবজীবনে একটু শান্তি আনবে, স্বস্তি আনবে।"

অবশেষে সহসাকে খুঁজতে বেরিয়েছে সুখময়। এই সহসার হাতেই বোধহয় ইরাবতী ও তার জটিল জীবনের চাবিকাঠি রয়েছে।

সুখময় একবার ভেবেছিল, ইরাবতীকে নিয়েই সে বেরুবে সহসার খোঁজে। সহসা বড়জোর আড়ালে মিটমিট করে হাসবে, বলবে এই যদি মনে ছিল তা হলে কলেজ জীবনে একটু জোর দিয়ে চেষ্টা করোনি। ওই যে সেনগুপ্ত বলতেন, দ্বিধার মধ্যে থেকো না, নিজেকে জিজ্ঞেস করো। তারপর আকাঙ্ক্ষাটা স্পষ্ট হলে এগিয়ে যাও দুনিয়াকে ডোন্ট কেয়ার করে।

সহসা অন্যভাবেও রি-অ্যাক্ট করতে পারে। রমিত সেনগুপ্তকে গোপন খবর পাঠিয়ে ইরাবতী-সুখময়ের যৌথজীবন চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারে। এ এক ভয়ানক সম্ভাবনা। এই সেদিনও ইরাবতী কী সব স্বপ্ন দেখে ধড়মড় করে উঠে পড়ে ভয়ে সুখময়কে জড়িয়ে ধরেছিল। তারপর জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি পারবে? আমাকে ছেড়ে দিতে?"

একটা অন্যায়। কিন্তু সেটা হয়ে গেছে। এখন এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সুখময়। সুখী মানুষ এখন সুখময় এবং সুখীরা চিরকাল ধারাবাহিকতা চায়, পরিবর্তনে তাদের প্রবল আপত্তি।

অর্থাৎ সহসার সঙ্গে যদি একান্তে দেখা হয়ে যায়, যদি মুখ টিপে সে প্রশ্ন করে, "সাত বছরের নির্জলা প্রতীক্ষা কে কমাতে বেশী ব্যগ্র? ইরাবতী? না তুমি, সুখময়?"

সুখময় তখন বাধ্য হয়ে বলবে, 'ইরাবতী আর সুখময় এখন আলাদা নয় সহসা। এই ক'বছরে কত কি হয়ে গিয়েছে।"

সহসা তখনও যদি ব্যঙ্গ করতে চায় তা হলে সুখময় বলবে, "আমার জীবনের প্রায় সব কিছুর জন্যেই আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার চাকরি, আমার এই পাম অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে থাকা। এবং ইরাবতী...সে তো তোমারই দান। তুমি প্রবাসের অজ্ঞাতবাসে কোথায় কী করলে তার তরঙ্গ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো ইরাবতীর কাছে।"

সহসা তখনও যদি প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে থাকে তা হলে ইরাবতী আর সহসার মুখোমুখি সাক্ষাৎ করিয়ে দেবে সুখময়।

ইরাবতী কী বলবে তা আন্দাজ করতে সুখময়ের কোনো কষ্ট নেই। "দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট করার জন্যে আমার স্বামী জেলে পাঠাবে সুখময়কে,

অথচ আমার ঘর ভাঙবার জন্যে তোমাকে জেলে পাঠাতে পারবো না, সহসা? তুমি সত্যিই সুপার্ব, তোমার তুলনা নেই।"

কিন্তু রাগের সময় নয়তো এখন। সহসা নিজেই যেমন বলতো, "সমস্যাটা কোথায় রয়েছে তা খুঁজে বার করে নিন। সমস্যাটা এই সাত বছরের প্রতীক্ষা, নিরুদ্দেশ হওয়ার সাত বছরের মধ্যে 'সিভিল ডেথ' অর্থাৎ আইনের চোখে মৃত্যু স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও স্যাংশন করতে পারবেন না।"

সহসার সন্ধানে এখানে-ওখানে যেতে যেতে সুখময় ভেবেছে, সহসা হয়তো সমাধানের গোপন ইঙ্গিত দিতে পারে।

সহসার সঙ্গে রমিত সেনগুপ্তর এখন কী সম্পর্ক চলছে তার ওপরেই সব নির্ভর করতে পারে। সহসা এবং রমিত সেনগুপ্ত যদি পরস্পরকে সত্যিই নিবিড়ভাবে চান তা হলে বাধা কোথায়?

অবশ্য রমিত সেনগুপ্তের আত্মপ্রকাশ ঘটলে তিনি বাইরে থাকবেন না, চলে যাবেন হাজতে। হল অ্যান্ড লাডলোর মিস্টার সদাশিব কাঞ্জিলাল তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে সারাক্ষণ রেডি হয়ে আছেন।

যে সহসা একদিন নন্দনের চত্বরে সায়েব ও তাঁর স্ত্রীর টিকিট কিনে সুখময়ের সঙ্গে গল্প করতো তাকে এখন খুঁজে পাওয়া কত কঠিন!

কত জায়গায় বিফল খোঁজ করলো সুখময়। সবাই এড়িয়ে যেতে চায়, কেন খোঁজ করছেন জানতে চায়, উত্তর দিলে দেখা যায় সহসা রায়চৌধুরীর খবর রাখার মতন সময় তাদের নেই।

খানিকটা সাহায্যে লাগলো হল অ্যান্ড লাডলোর পুরনো বেয়ারা হারাধন যে সায়েবের দেওয়া তিন হাজার টাকা ইরাবতীকে ফেরত দিতে এসেছিল। তার স্ত্রী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ—একটি সুন্দর খোকা হয়েছে। সায়েব জানলে কত খুশি হতেন। তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। হারাধনের ধারণা সায়েব নিশ্চয় সন্ন্যাসী হয়ে কোনো পাহাড়ে বসে তপস্যা করছেন। চুরি করবার লোক তো তিনি ছিলেন না, অফিসের দুষ্ট লোকরা সব দল পাকিয়ে দোষটা নিরীহ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

"সহসা দিদিমণিও ভালমানুষ, সায়েবকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি অযথা বিপদে পড়ে গেলেন।"

লোকটা অনেক খবর রাখে। মুখে মুখে যা জানা গেল, সহসা দিদিমণি ছুটি নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়ে বসেছিলেন। বেয়ারার কাছে খবর পেয়ে তিনি চলে এলেন কলকাতায়, কী একটা চিঠি পড়লেন সায়েবের লেখা, তারপরই বুঝলেন, সায়েব সাধু হবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছেন। ওঁকে সব কিছু বোঝাবার জন্যে বিপদ মাথায় নিয়ে প্রবাসে ছুটলেন সহসা মেমসায়েব। সায়েবকে বোঝালেন, নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করলেও শান্তি নেই, অফিসে এখন নানা গোলমাল। সায়েব কিন্তু বুঝলেন না। শেষ পর্যন্ত সংসার ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন। বেয়ারা শুনেছে, সহসা দিদিমণি প্রবাস থেকে ফেরাব পথে গয়ায় গিয়েছিলেন সায়েবের পিণ্ডি দিতে, সায়েবের অর্ডার ছিল।

হল অ্যান্ড লাডলো থেকে রেজিগনেশন দেবার পরে কলকাতার বাইরে এবং কলকাতায় কয়েক জায়গায় সহসা কাজ করেছেন। তারপর আবার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। ভীষণ কাজের মানুষ, মা দুর্গার মতন দশ হাতে টাইপ করতেন, টেলিফোন করতেন, ফ্যাক্স পাঠাতেন, ফাইল করতেন। ওঁদের কখনও কাজের অভাব হয় না।

কোথায় সহসা চাকরি করছে সে খবরও শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ হলো। এবং অফিস থেকে একদিনের ছুটি নিয়ে ট্রেনে চেপে বসলো সুখময়। জামসেদপুরের ছোট একটা কোম্পানিতে সহসা স্বয়ং অজ্ঞাতবাস করছে। ওই শহরেই অবশেষে দু'জনের দেখা হয়ে গেলো।

কী হয়েছে সহসার! তার মধ্যবয়সী শরীরের লাবণ্য কোথায় চলে গিয়েছে, সহসাকে শুকনো ও বেশ শীর্ণা মনে হচ্ছে। আগেকার সহসা শ্যামবর্ণা ছিল, কিন্তু তার শরীরে দীপ্তি ছিল। নিষ্ঠুর সময় যেন অতি সামান্য প্রচেষ্টায় অনেক দৈহিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে সহসাকে।

"সহসা তোমার চশমার পাওয়ার কি বেড়েছে?" জিজ্ঞেস করে সুধাময়।

"খালি চোখে মানুষকে চিনতে ভীষণ ভুল হতো! মোটা চশমা তো

প্রয়োজন, সুখময়।" সহসার উত্তরে যেন একাধিক অর্থ লুকিয়ে রয়েছে। মানুষদের চিনতে ভুল হয়েছে, না মানুষরা ঠকিয়েছে সহসাকে, বোঝা দায়।

কিছু চেপে রাখ .। চেষ্টা করলো না সুখময়। "সহসা, আমি বেশ জড়িয়ে পড়েছি।"

"তোমরা লিভটুগেদার করছো?" সহসার কাছে কোনো খবর চাপা নেই।

"সহসা, আমার সমস্ত সুখ এবং সমস্ত দুঃখেই তোমার অদৃশ্য উপস্থিতি রয়েছে। তুমি রমিতবাবুর এতো কাছে না এলে ইরাবতী আমার এতো কাছে কিছুতেই আসতো না।"

সহসা গম্ভীর হয়ে বসে থাকলো না। সে বললো, "ইরাবতী আমাকে অকারণে হিংসে করে এসেছে, সুখময়। আমি রমিত সেনগুপ্তকে অফিসের মেন স্ট্রিমে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম। আই ওয়াজ ভেরি সিরিয়াস।"

"কত সব বাজে খবর রটে ; সেই সব খবর সঙ্গে সঙ্গে বিবাহিতা স্ত্রীদের কানে চলে যায়। তুমি তো জানো তারপর কী হয়!"

সুখময়ের দিকে সহসা এবার এক কাপ চা এগিয়ে দিলো। একটু ভেবে সহসা শান্তভাবে বললো, "তুমি পরে এই রমিত সেনগুপ্তকে নিয়ে একটা গল্প লেখার চেষ্টা কোরো, সুখময়। আমি গল্পটা একশবার পড়বো। রমিত সেনগুপ্ত যে সাধ্যের অতীত খরচাপাতি করছেন ওঁর লাইফস্টাইল দেখে সে-সন্দেহ এক-আধবার আমার হয়েছিল। কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক বিপদটা বুঝতে পারিনি। পারলে মোটা মোটা টাকার চেকগুলো এইভাবে নয়ছয় করতে মিস্টার সেনগুপ্তকে বাধা দিতাম। ভদ্রলোক নিজে যখন বুঝলেন, জানাজানি হয়ে যাবার সময় আর দূরে নয়, তখন হঠাৎ তিনি চাইলেন জীবনটা একটু উপভোগ করে·নিতে। খেয়ালী মানুষদের পিকুলিয়ার সাইকোলজি। ছোটবেলায় যেসব জায়গায় মিস্টার সেনগুপ্তর বাবা পোস্টেড ছিলেন সেইসব জায়গা নিজের চোখে আর একবার দেখার প্রবল ইচ্ছে ওঁকে চেপে ধরলো। আমাকে দিয়ে তিনি ট্যুর প্রোগ্রাম ড্রাফট করিয়েছেন, কিন্তু আমি তখনও কিছু বুঝিনি। তারপব কলকাতা থেকে চলে যাবার আগে আমাকে বললেন, হোল্ড দ। .ফার্ট, যার সরল অর্থ আমার অনুপস্থিতিতে শত্রুর আক্রমণ থেকে দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব

তোমার। কিছু কাগজপত্র একটা অ্যালুমিনিয়ামের সুটকেশে পুরে যখন আমাকে সাবধানে রাখতে নির্দেশ দিলেন, তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি।"

একটু হাসলো সহসা। "মিস্টার সেনগুপ্ত আমার হিরো, আমার ইনফ্যাচুয়েশন, যা ইচ্ছে বলতে পারো।"

"ইনফ্যাচুয়েশন ব্যাপারটা কি সহসা?" দিক্‌হারা সুখময় একটু বোকার মতন জিগ্যেস করলো।

"মোহ বলতে পারো, কাউকে দেখে বিচারবুদ্ধি হারিয়ে কেউ যদি মোহগ্রস্ত হয়ে যায়।" সহসা বললো, "রমিত সেনগুপ্ত কলকাতা থেকে নিঃশব্দে চলে যাবার ক'দিন পরেই আমি বুঝলাম, বড়রকমের কোনো বিপর্যয় হতে চলেছে। তারিখটাও আন্দাজ করলাম—সোমবার সকাল। শুক্রবারের সকালে আমি আর দ্বিধা করিনি। মিস্টার সেনগুপ্ত কোথায় কবে যাচ্ছেন সেই কাগজটা ফাইল থেকে খুলে নিলাম। যে কাগজপত্রগুলো আমার জিম্মায় দিয়েছিলেন সেগুলো সঙ্গে নিলাম। তারপর ট্রেনের টিকিট কেটে হাজির হলাম প্রবাসে ওঁর অজানা ঠিকানায়। রমিতবাবুর কোনো কথা আমি শুনিনি, ওঁকে নিয়ে সরে গেলাম অন্য এক শহরে—হোটেলের খাতায় ছদ্ম নাম লেখালাম। এই কোম্পানির এম ডি মিস্টার কাঞ্জিলালকে তো জানি, পুলিশের সঙ্গে ওঁর খুব দহরম মহরম!"

সহসা বললো, "আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম, রমিতকে বোঝাতে। কলকাতায় ফিরে চলুন, দলিলগুলো নষ্ট করুন। আপনার দিকে হাত বাড়াতে ওদের অনেক কাঠখড় পুড়োতে হবে।"

রমিত সেনগুপ্ত অদ্ভুত লোক। লড়াই করবার মনোবৃত্তি তিনি ইতিমধ্যেই ত্যাগ করেছেন, বাকি জীবনকে সেই ছোটবেলার মতন এনজয় করবার মধ্যেই যেন যত আনন্দ।

সহসা বললো, "সাহস নেই আমার। দুদিন অন্তর জায়গা এবং হোটেল পাল্টাচ্ছি আমরা। আমার স্থির বিশ্বাস অফিসের সার্চ পার্টি আমাদের পিছু ধাওয়া করেছে। কিন্তু রমিত সেনগুপ্তর মধ্যে কোনোরকম উত্তেজনা নেই। একবার শুধু তিনি বললেন, যারা দূরদ্রষ্টা তাঁরা এই পৃথিবীতে উপার্জনের চেয়ে

বেশি খরচ করেন! তারপর পুরনো স্মৃতিতে ভরা বাল্যের স্মৃতিচিহ্নগুলো খুঁজে খুঁজে বার করলেন, এইসব জায়গায় ওঁর বাবা সরকারী ডাক্তার ছিলেন। মাঝে মাঝে বদলি হতেন, তাই বেশ কিছু শহর ও অধাশহরে বসবাস হয়েছে।"

সহসা বললো, "একসময় রমিত জিগ্যেস করলেন, তুমি আমার জন্যে এতো ব্যস্ত হলে কেন সহসা? কারও জন্যে এত ঝুঁকি মেয়েদের নিতে নেই। আমি উত্তর দিলাম, আপনাকে আমি কিছুতেই বিপদে পড়তে দেবো না, মিস্টার সেনগুপ্ত।"

তারপর কী যে ঘটলো! রমিত সেনগুপ্ত যেন উন্মাদের মতন ঘিরে ধরলেন সহসাকে। সহসা যেন তাই চাইছিল। সহসা অস্বীকার করলো না, হোটেলে একটা ঘরেই তারা দু'জনে থাকতো। প্রায় প্রতিদিন নামের পরিবর্তন হতো—কৃষ্ণসখা মিত্র, পার্থশেখর সেন, সুদাম সাহা, রাধাবিনোদ রায়—ভেবে ভেবে কত রকম নাম তৈরি করতাম আমরা।"

"ইরাবতীর কথা তখন মনে হয়নি তোমার?" সুখময়ের প্রশ্ন।

সহসা একটুও ভাবলো না। 'ইরাবতীর জন্যে ভাববার সময় তখন নয়, সুখময়। তখন আমি কেবল আমার রমিতের কথা ভাবছি। ওঁকে বলছি, ফিরে চলুন। ওরা আপনার কোনো কাগজপত্র খুঁজে পাবে না, সব বিপদ থেকে আপনাকে বার করে আনবে কোনো ভাল উকিল।"

রমিত সেনগুপ্ত শুনে যান কথা। কিন্তু কোনো উত্তর দেন না, যদিও এই ক'দিনে তিনি সম্পূর্ণ সহসা-নির্ভর হয়ে পড়েছেন।

"দেখতে দেখতে ঘোরা, আর ঘুরতে ঘুরতে দেখা। আমার ভীষণ ভাল লাগছে, সহসা। আমি এইভাবেই ঘুরবো। আমাকে কেউ ধরতে পারবে না," রমিত সেনগুপ্ত তখন বলেছিলেন, "তুমি থাকায় আমায় একলা হতে হলো না।"

আরও কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়েছে। আইনের ব্যাপারগুলো সহসার মোটামুটি জানা। ইরাবতী নিশ্চয় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে! সাত বছরের প্রতীক্ষা তার কাছে সাতশ বছর প্রতীক্ষা মনে হচ্ছে, সহসার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে সে সুখের সাগরে ডুবে থাকতে চায়।

সুখময় কোনো উত্তর দেয়নি। সহসা এবার সুখময়ের মুখের দিকে তাকালো। "তুমি খুব বিপদে পড়ে গেছো সুখময়? তাই না? মন যাকে চায় কলেজে পড়তে পড়তে তাকে চাওনি কেন সুখময়?"

প্রশ্নের উত্তর নেই, সুখময় নিরুত্তর। কিন্তু হঠাৎ সহসার কি যেন মনে পড়ে গেলো। সে বললো, "আমিই তো দায়ী। সুখময়, আমিই তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম, রমিত সেনগুপ্তর বাড়িতে গেলে অবশ্যই ইরাবতীর সঙ্গে যোগাযোগ কোরো, তাহলে তোমার 'কেসটা জোরালো হবে!"

আবার মুখ খুললো সহসা। "রমিতবাবুকে আমি কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু উনি জানতেন, ইরাবতীর কাছে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।"

সুখময়ের বিদায়ের সময় সমাগত। সহসা হঠাৎ বললো, তুমি অনেক কিছু জানো, আবার অনেক কিছু তোমার জানা হয়নি এখন। সুখময়, যা তুমি জানো না, আমার শরীরে ক্যানসার রয়েছে। রোগটা ইদানীং ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু অপেক্ষা করুক না কেন ইরাবতী—ওনলি সেভেন ইয়ারস। আমার সঙ্গে দেখা হলে ওকে বলতাম, অতো ব্যস্ত হবার কী আছে? রমিত সেনগুপ্ত তো কোনো ব্যাপারেই কোনোদিন ব্যস্ত হননি!"

সুখময়ের মনে হলো তার দুই সহপাঠিনী ভাগ্যের বিচিত্র পরিহাসে নিজেদের কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছে না। সহসা চাইছে, লিভ টুগেদারের যন্ত্রণা তার সহপাঠিনী ইরাবতী সেনগুপ্ত সারাজীবন ধরে ভোগ করুক।

সেই ভাবনা নিয়েই সুখময় অবশেষে ফিরে এসেছে কলকাতায়। ইরাবতী অন্য প্রশ্ন তেমন করেনি। সে শুধু জিজ্ঞেস করেছে, "সহসা আমার স্বামীর সঙ্গে দিনের পর দিন রাতের পর রাত হাজবেন্ড অ্যান্ড ওয়াইফের মতো ছিল তো?"

সুখময় তখনও উত্তর দেয়নি। আরও একমাস পরে জামসেদপুর থেকে সহসার মৃত্যু সংবাদ এসেছিল।

মৃত্যুর আগে সহসা তাকে কিছু চাঞ্চল্যকর কাগজপত্র পাঠিয়েছিল।

সহসা লিখেছিল, "প্রিয় সুখময়, ইরাবতী জেনে নিশ্চিন্ত হবে, তার স্বামী তিন বছর ধরে নিরুদ্দেশ নন। তিন বছর আগেই জন্মস্থানে ফিরে গিয়ে ওখানকার হোটেলেই তাঁর হার্ট অ্যাটাক করেছিল। অজ্ঞাতবাসে সর্বত্র তাঁর নামটা অন্য লেখা ছিল। সেই মতোই ডেথ সার্টিফিকেট হয়েছিল, সেটাই পাঠালাম তোমাদের আসন্ন শুভ বিবাহে আমার প্রীতি উপহার হিসেবে।"

"এখন আর সাত বছরে বুক জ্বালানোর প্রতীক্ষার প্রশ্ন নেই। আর লিভ টুগেদার নয়—এবারে ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে নবজীবনে প্রবেশ করো।"

•

সহসার শেষ চিঠিটা সুখময় বারবার পড়েছে এবং ইরাবতীকে পড়িয়েছে। ওর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে সুখময় আবার পড়েছে এবং আবার ইরাবতীর হাতে দিয়েছে।

দু'জনেই চিঠিটা পড়ছে, কিন্তু কেউ কিছু বলছে না।

"ইরাবতী, রমিতবাবু যে নেই, এই কথাটা সহসা আগে বললো না কেন?" কারণটা নিজেই খুঁজে বেড়াচ্ছে সুখময়।

এবার সুখময় বুঝতে পারছে। "রমিতবাবু অদ্ভুত ধরনের মানুষ ছিলেন। নিশ্চয় তিনি ওইরকম চেয়েছিলেন—মরে গিয়েও ধরা দেবার মানুষ নন তিনি।"

সুখময় ভেবেছিল, ইরাবতীর সমস্ত রাগ এখনও সহসার ওপর জমে রয়েছে।

ইরাবতী আজ কিন্তু কোনো কথা বললো না। অনেকক্ষণ পরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ইরাবতী বললো, "সহসাকে আমরা একেবারেই বুঝতে পারিনি।"
